# …ারতের কথা

# মহাভারতের কথা

(শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ও
মেঘদূতের কবিতানুবাদক )
শ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামী এম্, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যালঙ্কার।

প্রকাশক—সম্পাদক ও সঙ্ঘপতি,
বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ, শান্তিপুর, নদীয়া।
সন ১৩৫৭ সাল।

মূল্য ২॥০

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৭ সাল।



— প্রাপ্তিস্থান —

১। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

২। সম্পাদক, বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ, শান্তিপুর নদীয়া।

৩। সুলভ প্রেস, ২৬ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম
৭২

# উৎসর্গ পত্র।

—:০:—

স্বর্গগত স্নেহময়
জনক-জননীর পবিত্র স্মৃতি
পূজার মানসে "মহাভারতের কথা"
দীন সন্তানের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যরূপে
সৎশিক্ষা প্রচারকামী
বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ
কর্তৃপক্ষের
হস্তে
অর্পিত হইল।

শান্তিপুর,
অক্ষয়তৃতীয়া, ১৩৫৭।

নিবেদক—
শ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামী।

# সূচী পত্র

—:০:—

# প্রকাশিকা।

—:০:—

নদীয়া শান্তিপুরস্থ বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ হইতে ৺হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী স্মৃতি শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ হইতে এই পুস্তিকা পরিষদ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত শ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামী এম্, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার শ্রদ্ধেয় জনক-জননীর পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে এই পুস্তকখানির সর্ব্বস্বত্ত্ব পরিষদে নিঃস্বার্থে, দান করিয়া সুরক্ষিত ভাবে পরিষদ কর্ত্তৃপক্ষকে ইহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া, পরিষদের ও সাধারণ পাঠক পাঠিকা, পরিষদের ও সাধারণ ছাত্র ছাত্রীর নিকট, বিরাট মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব, বেদব্যাসের মূল গ্রন্থের সঠিক, সংক্ষিপ্ত, সংস্করণ, সুলভে পাইবার সুযোগ করিয়া দিয়া, কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, পরিষদের স্থায়ী সভাপতি ডাঃ নলিনী মোহন সান্যাল এম্. এ, পি, এচ্, ডি, ভাষাতত্ত্বরত্ন পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এবং ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী ইহার পরিশিষ্ট সংযোজন করিয়া পুস্তকখানিকে আরও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সুলভ প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তকখানি প্রকাশে যত্ন ও উৎসাহ দান করিয়া, অর্থহীন পরিষদের এই দুষ্কর কার্য্যে অন্ধের যষ্টির ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। পরিষদের সহঃ-সম্পাদক, অক্লান্তকর্ম্মী, সঙ্ঘভাইপ্রধান শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পুস্তকখানির প্রকাশের জন্য আগা গোড়া যথেষ্ঠ পরিশ্রম, যত্ন ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। বহু সঙ্ঘভাই ভগ্নী, সঙ্ঘমিত্র ও পরিষদের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ী সহৃদয়, ব্যক্তিবর্গ এই পুস্তকখানির বর্ত্তমান ছাপাখানার অনেকগুণ বর্দ্ধিতহারে খরচ নির্ব্বাহের জন্য যথোচিত সাহায্য দানে তাঁহাদের হৃদয়ের মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ঋণগ্রস্ত হইয়াই পরিষদ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির বহুল

প্রচারের উপরই ইহার ঋণদায় মুক্ত হইবার সম্ভাবনা এবং পরিষদ হইতে এই ধরণের প্রথম এই পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা ফলবতী হইবার ভরসা পাওয়া যাইতে পারে। সুধী, সজ্জন ও সংবাদপত্রের মতামত ও সংশোধনী পরের সংস্করণে সংযোজিত হইবার সম্ভাবনা। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সামান্য লিপিকর প্রমাদ বা দুই চারিটী ছাপার ভুলত্রুটীর জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। পুস্তকখানির মূল্য যথাসাধ্য কম করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সরকারী শিক্ষা বিভাগের মনোনীত হইলে পুস্তকখানির গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে। গ্রন্থকারকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "বন্দে মাতরম্"—জয় হিন্দ্।

"কীর্ত্তিস্মৃতি-মন্দির"
অক্ষয়তৃতীয়া, ১৩৫৭ সাল

**শ্রীঅজিত কুমার স্মৃতিরত্ন,**
সঙ্ঘপতি ও সম্পাদক,
নদীয়া শান্তিপুরস্থ বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ।

# ভূমিকা।

—:০:—

ভারতবর্ষের দুইখানি অতি প্রাচীন মহাকাব্যে যেমন মানব মনের নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের অনিষ্টকারিতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির উপকারিতার আলেখ্যও প্রদত্ত হইয়াছে।

নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য। উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির নাম, সত্য, সরলতা, বাসনাহীনতা, নির্লোভ, অস্তেয়, দয়া, অহিংসা, সংযম, পবিত্রতা। নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের নাম দেওয়া হইয়াছে রিপু, অর্থাৎ শত্রু। রিপুগণ মধ্যে কাম (কামনা বা বাসনা) অগ্রগণ্য। বাসনার তুষ্টি না হইলে মনের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হয় এবং জীবন অসহণীয় হইয়া উঠে। অন্যান্য প্রায় সকল রিপুরই জননী বাসনা। বাসনা হইতে লোভ জন্মে, লোভ হইতে মোহ, মোহ হইতে ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হয়। বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইলে, যে বাধা দেয়, তাহার প্রতি ক্রোধ জন্মে।

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে কৈকেয়ী চরিত্র কামনা, লোভ ও ঈর্ষ্যার জ্বলন্ত ছবি। মন্থরা অতি দুষ্টা। ঈর্ষ্যা, ক্রোধ ও লোভ দ্বারা চালিত হইয়া বিভীষণ একটা বিপুল রাজবংশ ধ্বংসে সহায়তা করিয়াছেন । অথচ তাহার পত্নী সরমার চরিত্র কি মধুর।

রাবণ যখন আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেন তখন তিনি গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরূঢ় বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার বৈভব, প্রতাপ, তেজস্বিতা, বীরত্ব ও নির্ভীকতা অতুলনীয়। কিন্তু এই গুণগুলির সমবায় তাঁহাকে মোহের অধীন করিল এবং তিনি দর্পের আশ্রয় লইলেন। অতি দর্পই তাঁহার সর্বনাশের কারণ হইল।

মেঘনাদ বীর শ্রেষ্ঠ। তিনি ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন। অন্যায় সমরে প্রাণ হারাইয়াছিলেন । কুম্ভকর্ণ শারীরিক বলে বলবান হইলে কি হয়, একটী মাত্র শ্রেষ্ঠ গুণও তাহাতে লক্ষিত হয় না। সে পশুরও অধম।

আবার ঐ গ্রন্থে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গুণ বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হনুমানের বল, বীরত্ব, নির্ভীকতা ও অসীম রামভক্তি সর্বজন বিদিত।

লক্ষ্মণে সময়ে সময়ে অযথা ক্রোধ দৃষ্ট হইলেও, তাঁহার বীরত্ব, বিমল চরিত্র, অবিচলিত ভ্রাতৃবশ্যতা তাহাকে জগদ্বরেণ্য করিয়াছে। ভরতের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম অপূর্ব্ব। সীতার তো কথাই নাই। কোনো সাহিত্যেই তাঁহার ন্যায় আদর্শ নারী চরিত্র দেখা যায় না।

মহাভারত প্রণেতাও বহু উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গুণকে মূর্ত্তিদান করিয়াছেন। ভীষ্ম সকল শ্রেষ্ঠগুণের আধার। তাঁহার ত্যাগ, প্রতিজ্ঞার অটলতা, নিস্বার্থপরতা এবং বীরত্ব তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ করিয়া রাখিয়াছে। গান্ধারী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা। তাঁহার ত্যাগ, পতিভক্তি ও ক্ষমা অতুলনীয়।

কুন্তীতেও নারীজনোচিত সদ্‌গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

যুধিষ্ঠির ক্ষমার অবতার। তিনি স্নেহশীল ও ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার চরিত্রে পাপ স্পর্শ করে নাই বলিলেই হয়।

একলব্যের একনিষ্ঠতা ও গুরুভক্তি আমাদিগকে চমৎকৃত করে।

ভীম ও দ্রৌপদী মহাভারত প্রণেতার আশ্চর্য্য কল্পনা। ভীম বিপুল কায়, অসাধারণ বলবিক্রম সম্পন্ন, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন না হইলেও ন্যায়ের পক্ষপাতী, অকুতোভয় ও অসামান্য বীর। যাহা কেহ কখনো দেখে নাই, শুনে নাই, তাহাই দ্রৌপদীর জীবনে ঘটিয়াছিল। তাঁহার পঞ্চ স্বামী। মাতৃ আজ্ঞায় পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। দ্রৌপদী-চরিত্রে পদস্খলন কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

দ্রোণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণোচিত আচার ও মনোবৃত্তি ত্যাগ করেন নাই। তিনি অসাধারণ রণকৌশলের অধিকারী। তিনি দ্রুপদ রাজার প্রতি প্রবল শত্রুভাবাপন্ন।

ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের অনেকস্থলে মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডু

পুত্রগণের প্রতি তাহার যথেষ্ট ভালবাসা ছিল। ভীমের উপর তাঁহার ক্রোধ স্বাভাবিক, কিন্তু পরে তিনি ভীমকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পরে তিনি পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের রাজ্য ও সম্পত্তি ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভীম কিন্তু বরাবরই তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শেষ বয়সে পাণ্ডবেরা তাঁহার সেবা করিতেন কিন্তু ভীমের সেবায় আন্তরিকতা ছিল না। তাই অনুভব করিয়া তিনি বনে গমন পূর্বক ভগবদর্চনা করিবার সংকল্প করিলেন এবং কাহারও বাধা না মানিয়া গঙ্গাতীরে আশ্রম স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বিদুরের চরিত্র কি মহিমান্বিত! তিনি ত্যাগী, নিরভিমান, ন্যায়পরায়ণ ভগবদ্‌ভক্ত এবং পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

আরো দুইটী চরিত্র স্মরণযোগ্য। সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিকর্ণ নামক এক পুত্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং যুযুৎসু নামক আর এক পুত্র তাঁহার অধীনস্থ এক লক্ষ সৈন্য লইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

অন্য দিকে মহাভারত বহু দুরাত্মার সমাবেশে কলুষিত। তন্মধ্যে দুর্যোধন শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার ঈর্ষা, রাজ্যলোভ ও অনমনীয় স্বৈরিতাই কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড দাবানল প্রধূমিত ও প্রজ্জলিত করিয়াছিল। এই একগুঁয়েমো তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিল।

দুঃশাসন অতি হৃদয়হীন। শকুনি কিতব চুড়ামণি এবং দুর্যোধনের পাপগ্রহ। তাহার কুমন্ত্রণায় পড়িয়া দুর্যোধন বিপথে চালিত হইয়াছিলেন।

কর্ণের দাতৃত্ব, বীরত্ব ইত্যাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গুণ থাকিলেও বৈর নির্যাতনের উদ্দেশ্যে অন্যায় পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহার পতন হইয়াছিল। অর্জ্জুনের উপরই তাঁহার বিশেষ আক্রোশ। বীরত্বে তিনি অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দিবার সুবিধা পান নাই।

ভীষ্মের নিকট হইতে পাঁচটী মহাকাল বাণ ঠকাইয়া আনিয়াছিলেন, ইহা তাহার মিথ্যাচরণের একটী দৃষ্টান্ত।

শিশুপাল ঈর্ষ্যার প্রতিমূর্ত্তি। সে শ্রীকৃষ্ণের পরম বিদ্বেষী ছিল এবং তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

অশ্বত্থামা যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ কিন্তু অনেক বীরবিরুদ্ধ আচরণ তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিরও প্রশংসা করা যায় না। তিনি দ্রৌপদীর নিদ্রামগ্ন পঞ্চপুত্রকে পঞ্চ পাণ্ডব অনুমানে তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া নিতান্ত নৃসংসতার ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় মস্তক-সংলগ্ন মণি কাটিয়া দিলেন, তথাপি উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করিবার সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

জয়দ্রথ কৌরব-পক্ষীয় একজন বড় বীর। অভিমন্যুর বিপক্ষে যে চক্রব্যূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল তিনি তাহাতে পাণ্ডবপক্ষকে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

শল্যকে অষ্টাদশ দিনের সেনাপতি করা হইয়াছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন।

রামায়ণের তুলনায় মহাভারত ঘটনাবহুল। সুতরাং মহাভারতে পাত্র পাত্রীর সংখ্যাও প্রচুর। রামায়ণে ঘটনা ও পাত্র পাত্রীর সংখ্যা অধিক না থাকিলেও উহার মাধুর্য্য অপূর্ব।

তবে মহাভারত রচয়িতার নৈপুন্যের প্রমাণ এই যে এত পাত্র পাত্রীর সমাবেশ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার বর্ণনায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনের সহিত সংস্রব দুইবার মাত্র, কিন্তু মহাভারতে পাণ্ডবদের বহুবার। উভয় গ্রন্থেই প্রথম বন গমনের পরিসমাপ্তি বিবাহ উৎসবে।

ঈর্ষ্যা নামক মনোবৃত্তির পরিণাম কিরূপ বিষময় তাহা উভয় গ্রন্থে সবিস্তারে ও নিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। রামায়ণে দশরথের এবং মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্বলতাই সমস্ত সর্বনাশের মূল। দশরথের প্রশ্রয় পাইয়া কৈকেয়ী রামকে এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয় পাইয়া দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বনবাসের সময় সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিলেন এবং তুমুল সংগ্রামের পর রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া রাম সীতার উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সহোদর ভরতের নিস্বার্থতার ফলে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন।

সুশাসক রাজার রাজ্যেও এক সম্প্রদায় প্রজা রাজার বিরুদ্ধচারণে প্রবৃত্ত হয় দেখিতে পাওয়া যায়। রাম প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষ্যাকারীরা রামের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্য কোনো ছিদ্র না পাইয়া তাহারা সীতা চরিত্রে দোষারোপ করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, এত কাল রাবণ গৃহে বাস করিয়া সীতা যে নিজেকে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছিলেন, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। এই নিন্দা রামের কর্ণগোচর হওয়াতে যদিও তিনি সীতা চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং নিঃসন্ধিহান, তথাপি প্রজারঞ্জন রাজার সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই ধারণার অতিমাত্র বশবর্তী হইয়া বিনা বিচারে সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন।

মহাভারতে দেখা যায় যে, দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ, ইত্যাদি এক দল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পাণ্ডবদের প্রতি ঘোর শত্রুতা পোষণ করিত। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির শান্তিতে রাজ্যভোগ করিতেছেন। তাঁহার বিভব ও ঐশ্বর্য্য এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাঁহার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করাও সম্ভব হইল। ইহা দেখিয়া তাঁহার বিপক্ষদল ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিসে পাণ্ডবদের গৌরব নষ্ট হয়, এমন কি হৃতসর্ব্বস্ব হন ইহাই তাহাদের

নিশিবাসর চিন্তা। অবশেষে শকুনির মন্ত্রণায় দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশা ক্রীড়ায় আহ্বান করিল।

দ্বাপর যুগের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটী সাতিশয় কুপ্রথা ছিল। কেহ রণে বা পাশা ক্রীড়ায় আহ্বান করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা দারুণ লজ্জার কথা ছিল। মধ্যকালে ইয়ুরোপে নাইট এরাণ্ট নামক এক শ্রেণীর লোক ছিল যাহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং ঐরূপ কোনো পর্যটক নাইটকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে তাহাকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করিত। এই যুদ্ধে হয় তো তাহারা প্রাণ হারাইত।

যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় নিমন্ত্রিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনাপুরে আসিলেন। শকুনির মিথ্যাচরণে যুধিষ্ঠির পাশা ক্রীড়ায় পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ার পর দুর্যোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা করে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সৌজন্যে পাণ্ডবেরা রাজ্য ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন।

এত বড় শিকারটা হাত হইতে ফস্কিয়া গেল দেখিয়া দুর্যোধন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আবার আহ্বান করিলেন। এবারের খেলায় হারিয়া যাওয়াতে পণানুসারে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাসে যাইতে হইল। শেষ বৎসরে অজ্ঞাত বাসের সর্ত থাকিল। যদি অজ্ঞাত বাসকালে তাঁহারা ধরা পড়েন, তবে তাঁহাদিগকে পুনরায় বার বৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে এবং রাজ্য হারাইবেন। পাণ্ডবেরা বিরাট নগরে বাস করিয়া তাহাদের সময় পূর্ণ করিয়াছিলেন।

দুর্যোধনের নিকট রাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব পাঠান হইল এবং তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল। পাণ্ডবেরা পাঁচ খানি গ্রাম পাইলেও সন্তুষ্ট হইবেন বলা হইলেও দুর্যোধন সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও তিনি ছাড়িয়া দিবেন না।" সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িল।

যুদ্ধের স্থান নির্বাচিত হইল কুরুক্ষেত্র। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কৌরব পক্ষে এবং সাত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডব পক্ষে সমবেত হইয়াছিল। প্রায় সকলেই নিহত হইলেন। জীবিত থাকিলেন কেবল পঞ্চ পাণ্ডব, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা। দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া থাকিলেন। সেখানে ভীমের গদাঘাতে তাঁহার উরুভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, তিনি বহু যন্ত্রণাভোগের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার নিরানব্বইটী ভ্রাতা ভীম কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। সুতরাং ভীমই ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের হন্তা।

রামায়ণ ও মহাভারত ভগবানের দুইটী মুখ্য অবতারকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। দুইটী উদ্দেশ্য লইয়া ভগবান মানব দেহ ধারণ করেন— ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ও ধর্ম প্রচার। মানব আকার ধারণ করিয়া তাঁহার কাম, ক্রোধ বর্জ্জিত সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্বদোষরহিত, সর্বলোকোত্তম, সর্বজ্ঞ এবং সর্বকৃৎ হইতে হয়, অর্থাৎ তাঁহাকে আদর্শ জীবন যাপন করিতে হয়। তিনি মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য কোনো শক্তি দ্বারা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করেন না। তিনি মনুষ্য জীবনে দেবত্ব প্রদর্শন করেন না। ঐশী শক্তি দ্বারা কর্ম সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে অবতারের কোনো প্রয়োজন হয় না। তিনি জগৎকে শিক্ষা দেন অনুষ্ঠেয় কর্ম, সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে।

রামাবতারে রাম ঐশ্বরিক শক্তি অবলম্বনের কোনো পরিচয় দেন নাই। তাঁহার জীবন যাত্রায় তিনি যেসকল গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

হিন্দুমতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি সুখ-দুঃখের ও পাপ-পুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ

তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ। তিনি নিজ সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের অধীন হইয়াছে। অতএব সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য তাহারই মায়াজনিত। আমরা যে পাপ করি বা যে দুঃখ ভোগ করি, তাহা তাঁহার মায়া। দুঃখ জগদীশ্বর-প্রেরিত, তিনি ভিন্ন আর কোনো কারণ নাই। পাপ বুদ্ধিও জগদীশ্বর প্রেরিত, তিনিই ইহার বিচারের কর্তা। ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব ভ্রান্তি, তাঁহা হইতে বুদ্ধি, তাঁহা হইতে দুর্বুদ্ধি, আবার তাঁহা হইতে সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায়।

মহাভারতে দেখান হইয়াছে, জয়দ্রথবধে ভ্রান্তি, ঘটোৎকচবধে দুর্বুদ্ধি, দ্রোণবধে অসত্য, দুর্যোধনবধে অন্যায় তাঁহা হইতে প্রেরিত। বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও সেই কারণে। সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বটে, কিন্তু সকল স্থলে নহে। এমন কি আমরা আমাদের পান ভোজনে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ লক্ষ জীব হিংসা করিতেছি। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক আমার প্রাণ সংহারে উদ্যত, যে শত্রু আমার বধ সাধনে কৃতনিশ্চয়, যে দস্যু আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, যদি তাহার বিনাশ ভিন্ন আমার রক্ষার অন্য কোনো উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্মানুমত। ধর্ম প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিতে নাই।

দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি পুণ্য কর্মকে ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদের সকলগুলি সমান নহে, তারতম্য আছে। অহিংসা সর্বশ্রেষ্ঠ, সত্য তাহার নীচে। সময় বিশেষে মিথ্যা বলিয়া প্রাণ রক্ষা করা উচিত। যাহা ধর্মানুমোদিত তাহাই সত্য। যাহা ধর্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা লোকহিতকর তাহাই সত্য। যাহা লোকের অহিতকর তাহাই মিথ্যা।

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা। তিনি সত্যের সংগঠনকারী, আদর্শ বলবান,

রণ নিপুণ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নীতিজ্ঞ, সাহসী, কর্ম্মপটু, সর্বলোকহিতৈষী, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, অপরাজেয়, অপরাজিত, শান্ত, নিরহংকার। তিনি মানুষীশক্তি দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন করিলেও তাঁহার চরিত্র অমানুষী। এরূপ আদর্শ পুরুষকে ঈশ্বরাবতার ভাবা বিচিত্র নহে।

বাল্যকালে আমি মহাভারত পড়িয়াছিলাম। তাহার সকল ঘটনা আমার ভাল মনে ছিল না। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর গোস্বামী লিখিত এই পুস্তকখানি পড়িয়া মহাভারতের সমস্ত কথা পুনরায় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং আমি এই ভূমিকা লিখিতে সমর্থ হইলাম। পুস্তকখানি এখনকার সরল সুন্দর চলতি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা বালক বালিকাদের উপযোগী তো বটেই, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরাও ইহা পাঠ করিয়া লাভবান্ হইবেন ও আনন্দ পাইবেন।

**শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল.**
এম্, এ, পী, এচ্, ডি।
বিদ্যাভূষণ, ভাষাতত্ত্বরত্ন,

শান্তিপুর,
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৫২ সাল।

# মহাভারতের কথা

## আদি পর্ব্ব

—:০:—

হাজার হাজার বছর আগে আমাদের এই সোনার ভারতবর্ষে চন্দ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এই রাজাদের অনেকেরি রূপ-গুণের কথা এখনও ভারতবর্ষের লোকের মুখে মুখে ফেরে।

এই বংশের এক রাজার নাম ছিল যযাতি। তিনি দান-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ করে অনেক পুণ্য করেছিলেন। শুক্রাচার্য্যের মেয়ে দেবযানী আর বৃষপর্ব্বার মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির পাঁচটী ছেলে হয়, কিন্তু সবচেয়ে ছোট ছেলে পুরুর পিতৃভক্তির কথা শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

যযাতি এক সময়ে শুক্রাচার্য্যের একটা কথা না রাখায় শুক্র তাঁকে অভিশাপ দিলেন,—"তুমি অকালে বুড়ো হ'য়ে যাবে"। দেবতার কথা মিথ্যে হবার নয়। শাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজার চুলগুলো সব শাদা ধবধবে হ'য়ে গেল, শরীর আর চলে না, মুখের কথাগুলোও কেমনধারা হ'ল। এই সব দেখে রাজার হ'ল ভয়। তিনি শুক্রাচার্য্যকে অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। রাজার বিনয় দেখে শুক্রাচার্য্যের মনে দয়া হ'ল। তিনি তখন রাজাকে বললেন,—"যদি তোমার পাঁচ ছেলের মধ্যে কেউ তোমার জরা নেয়, তবেই তুমি যৌবন ফিরে পাবে—আর সেই ছেলে তোমার সিংহাসন পেয়ে অনেকদিন সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব ক'রবে। তারই বংশের ছেলেরা পর পর হবে রাজা"।

রাজার তখন সুখভোগ করার ইচ্ছে, তাই তিনি ছেলেদের একে একে ডেকে জরা নেওয়ার জন্যে বল্‌লেন। প্রথম চা'র ছেলে রাজি হ'লেন না ; শেষে ছোট ছেলে পুরু খুশি হ'য়ে পিতার জরা নিলেন।

পুরুকে জরা দিয়ে আর তাঁর যৌবন নিয়ে অনেকদিন রাজত্ব করার পর রাজা ভাবলেন,—কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। তিনি পুরুকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে, তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে তপস্যা কর্‌তে বনে চ'লে গেলেন। পুরুর বংশের নাম হ'ল পৌরব।

কৌরব বংশের ক'জন রাজার পর একজন রাজা হন, তাঁর নাম হস্তী। তিনিই একটা নগর তৈরি ক'রে তার নাম রাখেন হস্তিনা নগর। এই হস্তিনাই ছিল চন্দ্র বংশের রাজাদের রাজধানী।

এই হস্তীর নাতি নারায়ণ সূর্য্যের মেয়ে তপতীকে বিয়ে করেন। তপতীর গর্ভে তাঁর যে ছেলে হয়, তাঁর নাম রাখা হয় কুরু। কুরু নিজের শক্তিতে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করেন।

কুরুর পর দু'জন রাজা হন। তারপর রাজ্য পান প্রতীপ।

প্রতীপ ছিলেন খুব ধার্ম্মিক। তাঁর রাজ্যে প্রজারা বড় সুখে থাক্‌ত। দেবাপি ছিলেন প্রতীপের ছেলে। তিনি হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যান। ছেলের শোকে প্রতীপ হ'লেন দিশেহারা। রাজধানী ছেড়ে তিনি গঙ্গার ধারে ব'সে তপস্যা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন গঙ্গাদেবী জল থেকে উঠে এসে প্রতীপকে বিয়ে কর্‌তে চাইলেন। কিন্তু বিয়েতে প্রতীপের আর মন ছিল না। তিনি গঙ্গাদেবীকে ছেলের বউ কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌লেন। গঙ্গাদেবী তা'তেই রাজী হ'য়ে বল্‌লেন,—"মহারাজ, আমি আপনার ছেলেকে বিয়ে কর্‌তে পারি, যদি তিনি আমার কোন কাজে বাধা না দেন।

বাধা দিলে আমি কিন্তু তখুনি তাঁকে ছেড়ে চ'লে যাব।" প্রতীপ গঙ্গার কথায় মত দিলেন। গঙ্গাদেবী চ'লে গেলেন।

দেবাপি ছাড়া রাজার আর কোন ছেলে ছিল না। ফের ছেলে পাবার আশায় রাজা ভারি খুশি হ'লেন। বাড়ী এসে তিনি রাণীকে গঙ্গার কথা জানালেন। এই কথা শুনে রাণীরও হ'ল বড় আহ্লাদ।

কিছুদিন পরে রাজার ছেলে হ'ল। ছেলেটীর স্বভাব খুব শান্ত ছিল ব'লে ছেলেটীর নাম রাখা হ'ল শান্তনু।

শান্তনু দিন দিন সব বিষয়ে বেশ ভাল হ'য়ে উঠ্লেন। তিনি রীতিমত লেখাপড়া, অস্ত্রচালনা শিখ্তে লাগ্লেন। শান্তনুর বয়স যখন বেড়ে উঠ্ল, তখন একদিন প্রতীপ শান্তনুকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি শিখিয়ে দিয়ে বল্লেন,—"বাছা, একদিন এক সুন্দরী মেয়ে আমার কাছে এলে তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। যদি তিনি তোমার কাছে এসে তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চান, তবে তুমি তাঁকে বিয়ে ক'রো, আর কখনো তাঁর কোন কাজে বাধা দিও না"।

পিতার কথায় শান্তনু রাজি হ'লে ছেলেকে রাজ্যের ভার দিয়ে প্রতীপ বনে চ'লে গেলেন।

রাজা হওয়ার কিছুদিন পরে শান্তনু গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছেন, এমনি সময় গঙ্গাদেবী শান্তনুর সাম্‌নে এসে তাঁকে বিয়ে কর্‌তে চাইলেন।

শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিয়ে হ'য়ে গেল। দুজনে মনের সুখে কাল কাটাতে লাগ্লেন।

গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর একটী সুন্দর ছেলে হ'ল। ছেলেটী হওয়ামাত্রই রাণী ছেলেটীকে গঙ্গাজলে দিলেন ফেলে। রাজার মনে খুব কষ্ট হ'ল। কিছু বল্‌বার জো নেই। আগেই কথা দেওয়া আছে,—কোন কাজে বাধা দেওয়া চ'ল্‌বে না। এই রকম করে পর পর রাজার সাতটা ছেলে হারাতে

হ'ল। অষ্টম বারে যেমনি রাণী ছেলে কোলে নিয়ে গঙ্গায় ফেল্‌তে যাবেন, রাজা কেড়ে নিলেন সেই ছেলেকে। গঙ্গাদেবী রেগে গিয়ে বল্‌লেন,— "মহারাজ, আপনি আপনার কথা রাখ্‌তে পারলেন না, কাজেই আপনার কাছে থাকা আমার আর চল্‌বে না। তবে ছেলেটীকে দেন, বড় হ'লে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

রাজা তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে ছেলে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু—অত গুলো ছেলে গঙ্গাজলে ফেলে দেওয়ার কারণ জান্‌বার ইচ্ছে হ'ল রাজার। তা'তে রাণী উত্তর দিলেন,—"মহারাজ, আমি জাহ্নবী। নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের এক কামধেনু ছিল। একদিন আট জন বসু মিলে বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে ঐ কামধেনু চুরি করে। সেই দোষে তারা মানুষ হ'য়ে জন্মাবে ব'লে— বশিষ্ঠ তাদের অভিশাপ দেন। বসুরা আমার কাছে এসে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। তাঁদের ওপর হ'ল আমার দয়া। তাঁদের গর্ভে ধারণ ক'রে আমি তাদের শাপ মুক্তির ব্যবস্থা করি।"

গঙ্গাদেবী আর দাঁড়ালেন না, ছেলেটীকে নিয়ে চ'লে গেলেন।

রাণীকে হারিয়ে রাজার মনে এক তিল সুখ নেই, বিয়েও তিনি কর্‌লেন না। কেবল গঙ্গাদেবীর ভাবনা রইল তাঁর হৃদয় জুড়ে। প্রজাপালনে কিন্তু তাঁর অরুচি নেই। তাঁর শাসনে প্রজারা বড় সুখে আছে।

রথে চড়ে রাজা একদিন গেলেন মৃগয়ায়। গঙ্গার ধারে ধারে হরিণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় দেখ্‌তে পেলেন চমৎকার চেহারার এক যুবা বাণ ছুড়ে গঙ্গার জল আট্‌কে ব'সে আছেন। শান্তনুকে দেখে যুবা জলের মধ্যে লুকিয়ে প'ড়লেন। রাজা অবাক্ হ'য়ে সেখানে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। শান্তনুর মনের অবস্থা বুঝে সেই যুবাকে নিয়ে গঙ্গাদেবী শান্তনুর কাছে এসে বল্‌লেন, "মহারাজ, এই আপনার সেই ছেলে। এর নাম দেবব্রত। বশিষ্ঠের কাছে এই ছেলে নানান বিদ্যা শিখেছে।

দেবব্রত শাস্ত্রে বৃহস্পতি, আর অস্ত্রে পরশুরামের সমান। একে এখন আপনি যুবরাজ করুন।" এই কথা ব'লে গঙ্গা বিদায় নিলেন।

ছেলে পেয়ে রাজার আনন্দ দেখে কে! রাজা দেবব্রতকে সঙ্গে ক'রে রাজধানীতে এলেন। ছেলে দেখে প্রজাদের কতই না আহ্লাদ!

খুব ধুমধামে শান্তনু দেবব্রতকে যুবরাজ করে আর রাজ্যের ভার তাঁর ওপর দিয়ে কেবল মৃগয়া ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

যমুনার ধারে বেড়াতে বেড়াতে শান্তনু দেখ্‌লেন. একটী রূপসী মেয়ে যমুনা নদীতে নৌকায় বসে আছে। তার রূপে যমুনার দু ধার আলো ক'রেছে, আর তার গা থেকে বেরুচ্ছে কী সুন্দর গন্ধ! তাকে দেখে রাজা অস্থির; তাকে বিয়ে কর্‌বার আশায় নেচে উঠ্‌ল রাজার প্রাণ। তিনি কাছে গিয়ে পরিচয় পেয়ে জানলেন, ওটী দাসরাজের মেয়ে। মেয়েটির জন্ম হয় মাছের পেটে, দাসরাজ মাছের পেটে মেয়েটী পেয়ে নিজের মেয়ের মত মানুষ করেন। আগে তার গা থেকে বেরুত মাছের গন্ধ। পরাশর মুনির দয়ায় মাছের গন্ধ চ'লে গিয়ে তার গায়ে হয় পদ্মের গন্ধ।

রাজা তাড়াতাড়ি দাসরাজের বাড়ী গিয়ে ঐ মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চাইলেন। দাসরাজ রাজি হন কৈ? রাজার ছেলে রয়েছে যে! দাসরাজ দেখ্‌লেন, দেবব্রত থাকতে তাঁর মেয়ের ছেলে কখনই রাজা হ'তে পার্‌বে না।

তিনি এ বিয়ের মত দিতে পার্‌লেন না। রাজাও বুঝলেন, দেবব্রত ছাড়া আর কারুকে সিংহাসন দিতে পার্‌বেন না তিনি। অগত্যা রাজা মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে গেলেন।

রাজার মনে স্ফূর্ত্তি নেই। দেবব্রতের কেমন সন্দেহ হ'ল। তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা উত্তর পেলেন তা'তে খুশি হ'তে পার্‌লেন না। তিনি চ'লে গেলেন মন্ত্রীদের কাছে। মন্ত্রীরা ব্যাপারটা জান্‌তে পেরেছিলেন।

তাঁরা বল্‌লেন, "একটী মেয়েকে দেখে আপনার পিতা তাকে বিয়ে কর্‌তে চান। কিন্তু আপনি রাজ্য পাবেন ব'লে মেয়েটীর পিতা আপনার পিতার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে নারাজ"।

এইকথা শুনে একটুও দেরি না ক'রে দেবব্রত একেবারে গিয়ে হাজির দাসরাজের বাড়িতে। দাসরাজের সঙ্গে দেখা ক'রে পিতার বিয়ের কথা তুল্‌লেন। দাসরাজের কথায় দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হ'ল, তিনি কখনো রাজ্য চাইবেন না, আর—পাছে তাঁর ছেলেরা রাজ্য দাবি করে এই ভয়ে জীবনে বিয়েও কর্‌বেন না।

দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন ব'লে চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' রব পড়ে গেল. আকাশ থেকে হ'তে লাগ্‌ল পুষ্প বৃষ্টি ;—দৈববাণী হ'ল, "দেবব্রত, আজ থেকে তোমার নাম হ'ল ভীষ্ম।"

সেইদিন থেকে মেয়েটীরও নাম হ'ল সত্যবতী।

দাসরাজের আর আপত্তি কি! ভীষ্মের সঙ্গে সত্যবতীকে পাঠিয়ে দিলেন।

এই রকম ব্যাপার দেখে শান্তনু দেবব্রতকে কোলে নিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন, "তুমি ইচ্ছা মৃত্যু হও।"

রাজার সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে হ'য়ে গেল। সত্যবতীর সুন্দর দু'টী ছেলে হ'ল। একটীর নাম রাখা হ'ল চিত্রাঙ্গদ আর একটীর নাম বিচিত্রবীর্য্য।

শান্তনুর মরণের পর ভীষ্ম অতি যত্নে ভাই দুটীকে পালন কর্‌লেন। চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজ্যপালন কর্‌তে লাগ্‌লেন। দুজনেই শাস্ত্রে-শস্ত্রে পণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

গন্ধর্বদের রাজার সঙ্গে চিত্রাঙ্গদের তিন বছর যুদ্ধ হওয়ার পর চিত্রাঙ্গদ মারা গেলেন। তখন রাজা হ'লেন বিচিত্রবীর্য্য।

বিচিত্রবীর্য্যের বিয়ে দেওয়া দরকার। ভীষ্ম খবর পেলেন কাশীরাজের তিনটী মেয়ের স্বয়ম্বর হবে। মেয়ে তিনটীর নাম, অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকা।

ভীষ্ম যুদ্ধের সাজে সেজে ভাইয়ের জন্যে ক'নে আন্‌তে গেলেন। কাশীধামে স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে ভীষ্ম দেখ্‌লেন, অনেক দেশের রাজা সেখানে জড় হ'য়েছে। তিনি কোন কথা না ব'লে মেয়ে তিনটীকে রথে তুলে নিয়ে রাজাদের উদ্দেশ্য ক'রে বল্‌লেন, "যাঁর শক্তি আছে, তিনি আমার কাছ থেকে মেয়ে কেড়ে নিন।" রাজারা এমন কথা সইতে পার্‌লেন না। সবাই আক্রমণ কর্‌লেন ভীষ্মকে। কেউ ভীষ্মকে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। রাজারা রণে ভঙ্গ দিলেন।

পথে আস্‌বার সময়ে শাল্বের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধ হ'ল, কারণ শাল্বের সঙ্গে অম্বার বিয়ের কথা ছিল। শাল্বও ভীষ্মের কাছে হেরে গেলেন। মেয়েদের নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। শাল্বের দিকে অম্বার মন ছিল ব'লে ভীষ্ম অম্বাকে ছেড়ে দিলেন।

অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্য্যের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়েতে বড় জাঁক হ'ল। ভীষ্মের আনন্দ ধরে না। প্রজারাও ক'দিন খুব আমোদে কাটিয়ে দিল।

দুই রাণীরই ছেলে হ'ল। অম্বিকার ছেলের নাম হ'ল ধৃতরাষ্ট্র, আর অম্বালিকার ছেলের নাম পাণ্ডু। বিচিত্রবীর্য্য ছেলের মুখ দেখে যেতে পারেন নি, অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময় রাজবাড়ীর এক দাসীর এক ছেলে হয়। তাঁর নাম ছিল বিদুর। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আর পাণ্ডুর খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁর ধর্ম্মজ্ঞান ছিল অসাধারণ।

দুঃখের কথা ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন, তাই বড়ছেলে হ'য়েও তিনি রাজ্য পেলেন না, রাজ্য পেলেন পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্রের মনে বড় কষ্ট।

কিন্তু পাণ্ডু এত ভাল মানুষ ছিলেন যে, নিজে রাজা হ'য়েও কোনদিন নিজেকে রাজা ব'লে মনে কর্তেন না। ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা ছাড়া তিনি একপাও চ'ল্তেন না। রাজ্য জয় ক'রে যা পেতেন, সব এনে দিতেন দাদাকে।

ভীষ্ম গান্ধার রাজের মেয়ে গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের, কুন্তিভোজের মেয়ে কুন্তীর আর মদ্ররাজের মেয়ে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র মনে ক'রেছিলেন, তিনি রাজা হ'তে না পার্লেও আগে তাঁর ছেলে হ'লে সেই বস্তে পাবে সিংহাসনে। কিন্তু তা হ'ল না। আগেই ছেলে হ'ল পাণ্ডুর। কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর জ্বলে উঠ্ল।

পাণ্ডু মৃগয়া কর্তে বড় ভালবাস্তেন। কুন্তী আর মাদ্রীকে নিয়ে তিনি বনে বনে বেড়াতেন। একদিন পাণ্ডু এক হরিণকে বাণ দিয়ে মেরে ফেলেন। কি আশ্চর্য্য হরিণটী মর্বার সময় মানুষের মত ব'লে উঠ্ল, "তুমি বিনাদোষে আমাকে মেরে ফেলায় তোমার অকাল মরণ হবে।" রাজা বড় ব্যাথা পেলেন। তিনি আর রাজ্যসুখ চান না। স্বর্গে যেতে ব্যস্ত হলেন। স্বর্গের পথে ঋষিরা তাঁকে থামিয়ে ব'ল্লেন, "ছেলে না হ'লে স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই"। পাণ্ডু ছেলের জন্যে রাণীদের বল্লেন দেবতার উপাসনা কর্তে। তাঁদের আরাধনায় দেবতাদের দয়া হ'ল। ধর্ম্মের দয়ায় যুধিষ্ঠির,বায়ুর দয়ায় ভীম,আর ইন্দ্রের দয়ায় অর্জ্জুন—এই তিনটী ছেলে হ'ল কুন্তীর,—আর অশ্বিনীকুমারদের দয়ায় মাদ্রীর গর্ভে নকুল-সহদেব জন্মালেন।

গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশ' ছেলে আর দুঃশলা নামে একটী মেয়ের জন্ম হয়। জন্মের সময় দুর্য্যোধন এক বিকট শব্দ করেন, তাই সকলে ভাব্ল, এই ছেলে হ'তে হবে রাজ্যের অমঙ্গল।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্মের পর মৃত্যু হ'ল পাণ্ডুর। কুন্তীর হাতে নকুল আর সহদেবের ভার দিয়ে মাদ্রী স্বামীর চিতায় প্রাণ দিলেন।

ঋষিরা কুন্তী আর যুধিষ্ঠিরদের ভীষ্মের কাছে পাঠিয়ে দিলেন হস্তিনা নগরে। পাণ্ডুর মরণের খবর পেয়ে রাজ্যময় হাহাকার। ভীষ্ম প্রভৃতি কেঁদে আকুল। অন্তঃপুরের কান্না আর থামে না। প্রজারা পাণ্ডুর শোকে একেবারে ভেঙ্গে প'ল। কি আর হবে, বিধির বিধান, এতে মানুষের হাত কোথায়! ভীষ্ম পাণ্ডুর শেষ কাজ সমাধা করলেন।

কিছুদিন পরে বেদব্যাস সত্যবতীকে সংসার ছাড়বার পরামর্শ দিলেন। সত্যবতী অন্য নারীদের সঙ্গে বনে গিয়ে অনাহারে তপস্যা ক'রে প্রাণত্যাগ করলেন।

ভীষ্ম পরম আদরে একশ' পাঁচ ভাইয়ের ভার নিলেন। যুধিষ্ঠিররা সবাই বেদপাঠ করতে লাগলেন। পড়ার পর সকলে মিলে খেলা করতেন। ভীমের গায়ের জোরে কেউ পেরে ওঠেন না। ভীম একেবারে দশ-বিশ জনকে ধ'রে আছাড় মারেন। জলে যখন খেলা হয়, তখন ভীম অনেককে জলের মধ্যে ধরেন চেপে, তাঁরা জল খেয়ে হাঁপিয়ে পড়েন। ভীমের ভয়ে তাঁরা গাছে ওঠেন ত ভীম গাছের গোড়ায় এমন লাথি মারেন যে, তাঁরা গাছ থেকে প'ড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে ফেলেন।

এই সব দেখে দুর্য্যোধনের হ'ল বড় ভয়। দুর্য্যোধন ভাবলেন, ভীম যদি বেঁচে থাকেন, তবে তিনি যুধিষ্ঠিরদের সায়েস্তা করতেও পারবেন না, আর নিজে রাজা হ'তেও পারবেন না। তাই তিনি ভীমকে মেরে ফেলবার মতলব ঠিক করতে লাগলেন। শেষে দুর্য্যোধনের মাথায় এ'ল এক ফন্দি।

গঙ্গার ধারে প্রমাণকোটি ব'লে একটা জায়গা ছিল। জায়গাটা গহন বনের ভেতর। দুর্য্যোধন লোকজন দিয়ে সেখানে অনেক ঘর তৈরি ক'রে নানারকম খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

সব কাজ শেষ হ'য়ে গেল। সেখানে যাবার জন্য দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে ব'ললেন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে ভালবাসতেন। দুর্য্যোধনের কথায় তাঁর

কোন অবিশ্বাস নেই। তিনি যেতে রাজি হ'লেন। রথে চ'ড়ে সবাই গেলেন সেই প্রমাণকোটিতে। পথে বড় পরিশ্রম হ'য়েছিল। সেখানে পৌঁছেই সকলে আমোদ ক'রে মোণ্ডা মিঠাই খেতে শুরু ক'রে দিলেন। একে অপরকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। দুর্য্যোধন ভীমকে খাওয়াতে লাগ্‌লেন। ভীমের মুখে মোণ্ডার পর মোণ্ডা দিতে দিতে দুর্য্যোধন বিষ মাখানো মোণ্ডা দিতে লাগ্‌লেন। ভীমের খাওয়ায় আলিস্যি নেই। দুর্য্যোধন যত মোণ্ডা দেন, ভীম ততই খান।

খাওয়া হ'য়ে গেলে সকলে খেলার জন্যে গঙ্গা জলে নাম্‌লেন। খেলা সাঙ্গ হ'লে যে যার ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। গঙ্গার জল থেকে উঠে ভীমের মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল বন্ বন্ ক'রে। তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, জেগে আছেন কেবল দুর্য্যোধন।

এই সুযোগে দুর্য্যোধন ভীমের হাত পা বেঁধে তাঁকে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে। ভীম ভাস্‌তে ভাস্‌তে পাতালে নাগলোকে গিয়ে হাজির। ভীমকে দেখে চারদিক থেকে তেড়ে এসে হাজার হাজার সাপ তাঁকে কামড়াতে লাগ্‌ল। সাপের বিষে দুর্য্যোধনের দেওয়া বিষের দোষ কেটে গেল। ভীমের জ্ঞান এল ফিরে। ভীম দেখেন তাঁর চারদিকে ভয়ানক সব সাপ। তিনি তখন গোছা গোছা, ক'রে সাপগুলোকে ধ'রে আছড়ে মেরে ফেল্‌ছেন। গোটা কতক সাপ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তাঁদের রাজা বাসুকিকে জানাল, "মহারাজ, আপনার সাপ আর বাঁচে না। মস্ত বড় এক বীর সাপগুলো সব মেরে ফেল্‌ছে।"

এই কথা শুনে বাসুকি তাড়াতাড়ি এলেন ভীম যেখানে সাপ মার্‌ছেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌লেন, ভীম আর কেউ নন, তিনি সম্পর্কে তাঁর নাতির নাতি ভীম। তখন তিনি আদর ক'রে ভীমকে বাড়ী নিয়ে

গেলেন। ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে সোনার আসনে ভীমকে দিলেন বসিয়ে। ভীম অনেক দূর এয়েছেন, তাঁর খিদেও পেয়েছে খুব ব'লে বাসুকির মনে হ'ল। বাসুকির বাড়িতে জালা জালা অমৃত ছিল। সেই অমৃত খেলে গায়ে দশ হাজার হাতীর জোর হয়। তিনি প্রাণ ভরে তাই দিলেন ভীমকে খেতে। ভীম একে একে আট জালা অমৃত খেয়ে পালঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে প'লেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির ঘুম থেকে উঠে ভীমকে দেখ্‌তে না পেয়ে নানা জায়গায় তাঁকে খুঁজলেন; কিন্তু কোথাও ভীমের খোঁজ নেই। যুধিষ্ঠিরের বড় ভাবনা হ'ল, চা'র ভাই মিলে মায়ের কাছে চ'লে এলেন। মায়ের কাছে শুন্‌লেন, ভীম বাড়ি আসেন নি। কুন্তী ভীমের জন্যে কাঁদতে লাগ্‌লেন। কুন্তীর মন বড় অস্থির, তিনি ডেকে পাঠালেন বিদুরকে। বিদুর এসে কুন্তীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। কুন্তীর মন কিছুতেই মানে না। বিদুর কুন্তীকে বল্‌লেন, "বেদব্যাস ব'লেছেন, কেউ পঞ্চ-পাণ্ডবের কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না"।

যা হ'ক এই কথায় কিছু শান্ত হ'য়ে সবাই ভীমের আসার আশায় পথ চেয়ে রইলেন।

আটদিন পরে নাগলোকে ভীমের ঘুম ভাঙ্গল। বাসুকি অনেক ধন-রত্ন দিয়ে ভীমকে প্রমাণকোটিতে পাঠিয়ে দিলেন।

ভীম বাড়ি ফিরে মাকে আর যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম ক'রে দুর্য্যোধনের সব ব্যাপার তাঁদের জানিয়ে দিলেন। একথা তাঁরা কারো কাছে প্রকাশ কর্‌লেন না। সেদিন থেকে তাঁরা একা একা দুর্য্যোধনের কাছে যেতেন না।

বেদপাঠ শেষ। ভীষ্ম কৃপাচার্য্যের হাতে ছেলেদের অস্ত্র-শিক্ষার ভার দিলেন।

কৃপাচার্য্য ছিলেন শরদ্বান ঋষির ছেলে। কৃপের বোনের নাম ছিল কৃপী। শরদ্বান ব্রাহ্মণ হ'য়েও অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। তপস্যা করার চেয়ে বাণ চালনার দিকেই শরদ্বানের মন ছিল বেশী। নিজে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন ব'লে ছেলেকেও ঐ বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। জন্মের পর শরদ্বানের এই ছেলে মেয়ে বনের মধ্যে প'ড়ে ছিলেন। শান্তনু মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে তাঁদের কুড়িয়ে পান। রাজবাড়িতে এনে তিনি অনেক যত্নে তাঁদের লালনপালন করেন। তাঁরা বড় হ'লে তিনি তাঁদের ফিরিয়ে দেন শরদ্বান ঋষিকে। শান্তনুর কৃপায় তাঁরা মানুষ হ'ন ব'লে শরদ্বান তাঁদের নাম রাখেন কৃপ আর কৃপী।

যুধিষ্ঠিররা ছাড়া অনেক দেশের রাজার ছেলে কৃপাচার্য্যের কাছে অস্ত্র শিখ্‌তে এলেন।

অস্ত্রবিদ্যায় কিছুদূর এগিয়ে গেলে ভীষ্ম ছেলেদের শিক্ষার ভার দেন, দ্রোণাচার্য্যকে। কেমন ক'রে ব্রাহ্মণ হ'য়েও দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবিদ্যা শেখেন, আর কেমন ক'রেই বা তিনি রাজার ছেলেদের অস্ত্রগুরু হন, তা একটা শুন্‌বার মত কথা।

দ্রোণ ছিলেন ভরদ্বাজ ঋষির ছেলে। দ্রোণীর মধ্যে জন্ম হয় ব'লে তাঁর নাম রাখা হয় দ্রোণ। দ্রোণ যখন ছেলে মানুষ, তখন পাঞ্চালের রাজা পৃষতের ছেলে দ্রুপদ প্রায়ই ভরদ্বাজের আশ্রমে আস্‌তেন। দ্রোণের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব। একসঙ্গে তাঁদের দুজনের ছিল খাওয়া-বসা। দ্রুপদ দ্রোণকে বল্‌তেন, যখন তিনি রাজা হবেন, তখন তিনি দ্রোণকে দেবেন তাঁর অর্দ্ধেক রাজ্য। দ্রোণের পিতা বড় গরীব ব'লে দ্রুপদের এমনতর ইচ্ছে হ'ত।

দ্রোণ যখন বেশ বড় হ'লেন, তখন পিতার কথায় কৃপের বোন্ কৃপীকে বিয়ে কর্‌লেন।

যথাকালে দ্রোণের একটী ছেলে হ'ল। ছেলেটী জন্মের সময়ে অশ্বের মত চীৎকার করেন, এই জন্যে তাঁর নাম রাখা হ'ল অশ্বত্থামা।

ছেলেকে পালন করবার সঙ্গতি নেই দ্রোণের। তিনি শুন্‌লেন পরশুরাম অনেক টাকা পয়সা বিলুচ্ছেন। তিনি পরশুরামের কাছে গিয়ে ধন চাইলেন। পরশুরাম বল্‌লেন, "আমিত সব দান করে ফেলেছি। এখন আছে মাত্র আমার প্রাণ আর এই ধনুর্ব্বাণ। তোমার যেটা ইচ্ছে নিতে পার ব্রাহ্মণ!" দ্রোণ ধনুর্ব্বাণ নিলেন পরশুরামের কাছে। পরশুরাম দ্রোণকে সব অস্ত্র দিয়ে তার মন্ত্রগুলোও সব শিখিয়ে দিলেন তাঁকে।

দ্রোণ বড় গরীব, তাঁর দিন আর চলে না। পাড়ার ছেলেরা দুধ খায়; অশ্বত্থামা দুধ খেতে পান না। একদিন অশ্বত্থামার বন্ধুরা চালের গুঁড়ো জলে গুলে দুধ ব'লে তাই খেতে দিল অশ্বত্থামাকে। তাই খেয়ে অশ্বত্থামার কী আনন্দ! বন্ধুরা সব মজা করে হাততালি দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। এই ব্যাপারে দ্রোণের বড় দুঃখ হ'ল। অনেকের কাছে গোরু ভিক্ষা চাইলেন, কেউ একটা গোরু দিল না।

হঠাৎ তাঁর মনে প'ল দ্রুপদের কথা। দ্রুপদ মহা জাঁকজমকে সিংহাসনে ব'সে আছেন। চারিদিকে মন্ত্রীরা সব রাজকার্য্যের বন্দোবস্তে ব্যস্ত। সভার শোভাই বা কত! রুক্ষকেশ আর মলিন বেশে দ্রোণ এসে দ্রুপদকে বন্ধু ব'লে দাঁড়ালেন। দ্রুপদ দ্রোণকে চিন্‌তেই পার্‌লেন না। এমন একজন গরীব লোক তাঁর মত রাজাকে বন্ধু ব'লে ডাকল! রাজাত চটেই আগুন! তিনি কত রকম গালগালাজ দিয়ে দ্রোণকে দিলেন রাজসভা থেকে তাড়িয়ে। দ্রোণ দ্রুপদকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে চ'লে এলেন সভা থেকে।

দ্রোণ স্ত্রীকে আর অশ্বত্থামাকে নিয়ে হস্তিনায় কৃপের বাড়ি চ'লে এলেন। দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবিদ্যায় পরম পণ্ডিত। তাঁর সুখ্যাতির কথা

ভীষ্ম আগেই শুনেছিলেন। দ্রোণের হস্তিনায় আসার কথা আগে কেউ জান্‌তে পারেনি।

একদিন যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি একটা লোহার ভাঁটা নিয়ে খেল্‌তে খেল্‌তে ঐ ভাঁটাটা গেল কুয়োর মধ্যে প'ড়ে। রাজার ছেলেরা অনেক চেষ্টা ক'রেও ঐ ভাঁটাটা তুল্‌তে পার্‌লেন না। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন দ্রোণাচার্য্য মশাই। তিনি ছেলেদের কাছে ভাঁটার কথা শুনে বল্‌লেন, "যদি আমি ভাঁটাটা তুলে দি, তবে আমাকে তোমরা কি দেবে ?"

রাজকুমারেরা উত্তর দিলেন, "আপনি যা খেতে চান, আমরা তাই দেব"।

দ্রোণ অবশ্য সে কথায় কান না দিয়ে নিজের হাতের আংটীটাও দিলেন ফেলে ঐ কুয়োর ভেতর। একটা বাণ মেরে ঐ ভাঁটাটা ফেল্‌লেন বিঁধে। তারপর বাণের পিঠে বাণ লাগিয়ে ভাঁটাটা ওপরে তুলে দিলেন। আর এক বাণ মেরে আংটীটাও তুলে আন্‌লেন।

এই দেখে সকলে ত একেবারে অবাক্! তাঁরা সবাই চাইলেন তাঁর পরিচয়।

দ্রোণাচার্য্য ব'ল্‌লেন, "ভীষ্মদেবকে আমার চেহারার কথা বল্‌লেই তিনি আমাকে চিন্‌তে পার্‌বেন"।

রাজপুত্রেরা ভীষ্মকে ব্যাপারটা জানালেন। ভীষ্ম বুঝ্‌তে পেরে ছুটে এসে দ্রোণকে প্রণাম কর্‌লেন, আর অনেক বিনয় ক'রে রাজপুত্রদের ভার নিতে অনুরোধ কর্‌লেন তাঁকে। সেইদিন থেকে দ্রোণ হলেন রাজকুমারদের অস্ত্রগুরু।

প্রথমেই দ্রোণ সব শিষ্যকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বল, তোমাদের মধ্যে কে আমার সব আদেশ পালন কর্‌তে চাও, তা যত শক্তই হ'ক ?"

সকলেই রইলেন চুপ ক'রে। অর্জ্জুন কেবল বলে উঠ্লেন, "আমি আপনার সব আজ্ঞা মান্তে রাজি আছি"।

দ্রোণের খুব আনন্দ হ'ল। অর্জ্জুনকেই তিনি ভালবাসতে লাগ্লেন সবচেয়ে বেশি, আর ভাল ভাল বাণ ছোড়া শেখাতে লাগ্লেন অর্জ্জুনকে।

সবাইকে অস্ত্রচালনা শেখান কিন্তু দ্রোণ নিজের ছেলে অশ্বত্থামাকে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেবার সময় পান না একটুও। দ্রোণ রাজকুমারদের গঙ্গা থেকে জল আন্তে পাঠালেন। তাঁর মতলব এই সময়ের মধ্যে তিনি অস্ত্রশিক্ষা দেবেন অশ্বত্থামাকে। রাজপুত্রেরা কমণ্ডলু নিয়ে জল আন্তে চ'লে গেলেন। অর্জ্জুন একটা বাণ ছুড়ে তাড়াতাড়ি কমণ্ডলু ভ'রে নিয়ে চ'লে এলেন দ্রোণের কাছে। এই ফাঁকে দ্রোণ অশ্বত্থামা আর অর্জ্জুনকে ভাল ভাল অস্ত্র শিখিয়ে দিলেন।

একদিন হিরণ্যধনু ব্যাধের ছেলে একলব্য দ্রোণকে অস্ত্রগুরু করতে চাইল। দ্রোণ যখন জান্লেন, সে এক ব্যাধের ছেলে, তখন তিনি তাকে শিষ্য কর্তে রাজি হলেন না। সে মনের দুঃখে চ'লে গেল।

কিছুদিন পরে রাজকুমারেরা কেউ বা হাতীতে চড়ে, কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে গেলেন শিকারে। তাঁদের এক চাকর একটা কুকুর নিয়ে বনের ভেতর বেড়াতে গেল। সেই কুকুরটা রাজকুমারদের কাছে ফিরে এলে দেখা গেল, তাঁর মুখে বেঁধা রয়েছে কটা বাণ। কুকুরটার শব্দ কর্বার শক্তি নেই, অথচ তাহার মুখেও নেই কোন আঘাতের লক্ষণ। তাই দেখে অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন,—কী অদ্ভুত শিক্ষা! তাঁর মনে হ'ল দ্রোণ এমন একজন শিষ্য ক'রেছেন, যিনি এমন বাণ-চালনা শিখেছেন।

অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন দ্রোণের কাছে। অর্জ্জুনের চোখ ছল ছল কর্ছে। তিনি দ্রোণকে ব'ল্লেন, "গুরুদেব, আমি জান্তাম, আপনি আমাকেই ভালবাসেন সবার চেয়ে বেশি—আর আমাকে যত ভাল

অস্ত্র শেখাবেন, আর কাকুকে তা শেখাবেন না। এখন দেখ্‌ছি সেটা আমার ভুল। আপনি আমার চেয়ে একজন ভাল শিষ্য ক'রেছেন।"

দ্রোণ কিছু বুঝ্‌তে পারলেন না। তিনি অর্জ্জুনের সঙ্গে বনের মধ্যে গিয়ে দেখ্‌লেন, সেই ব্যাধের ছেলে একলব্য মাটী দিয়ে তাঁর মূর্ত্তি গ'ড়ে, ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে মূর্ত্তির সাম্‌নে ব'সে একমনে বাণ ছোড়া শিখ্‌ছে।

দ্রোণকে দেখেই একলব্য উঠে এসে ভক্তিভরে দ্রোণকে প্রণাম করল। দ্রোণ একলব্যের কাছে শুন্‌লেন, যেদিন তিনি তাঁকে শিষ্য করতে রাজি হ'লেন না, সেইদিন থেকে ঐ একলব্য দ্রোণকে মনে প্রাণে গুরু ব'লে মেনে নিয়ে এমনি ক'রে বাণ ছোড়া শিখ্‌ছে।

দ্রোণ তার কাছে চাইলেন গুরু-দক্ষিণা। একলব্য বল্‌ল, "আপনাকে দিতে পারিনে, আমার এমন কিছুই নেই। বলুন, আপনি কি দক্ষিণা চান।"

দ্রোণ একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা চাইলেন দক্ষিণা। একলব্য একটুও না ভেবে কচ্‌ ক'রে নিজের বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে দক্ষিণা দিলেন দ্রোণকে।

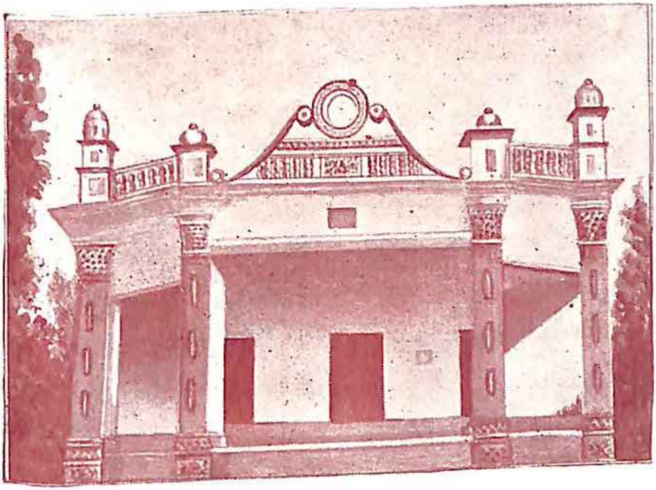
রাজপুত্রেরা অস্ত্র-শিক্ষা করছেন। কে কেমন শিখ্‌লেন দেখবার জন্যে দ্রোণাচার্য্য গাছের ওপর একটা পাখী রেখে যুধিষ্ঠিরকে ডাক্‌লেন। যুধিষ্ঠির ধনুর্ব্বাণ নিয়ে গুরুদেবের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন, "বলত, তুমি কি দেখ্‌ছ?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "গুরুদেব, আমি গাছ, পাখী, ভাইদের আর আপনাকে দেখ্‌ছি"।

দ্রোণের ভাল লাগ্‌ল না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সরিয়ে দিয়ে ডাকলেন দুর্য্যোধনকে। দুর্য্যোধনও উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠিরের মত। তখন তিনি ডাকলেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুন ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে তার ধনুক নিয়ে দাঁড়ালেন।

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ

(শান্তিপুর, নদীয়া)



কীর্ত্তি-স্মৃতি মন্দির।

"শিক্ষাব্রতী, বাঙ্গলার এ'ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান।
বিলাতে জ্ঞানের আলো, মানবের কল্যাণ।"

দ্রোণ বল্‌লেন, "অর্জ্জুন, কি দেখছ ?"

অর্জ্জুন বললেন, "আমি দেখ্‌ছি শুধু পাখীটাকে।"

দ্রোণ ফের জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি দেখছ ?"

অর্জ্জুন উত্তর দিলেন, "পাখীর মাথা আর তার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছি।"

তখন দ্রোণ অর্জ্জুনকে পাখীর মাথাটা কেটে ফেল্‌তে বল্‌লেন। আদেশ পেয়েই অর্জ্জুন পাখীর মাথাটা কেটে ফেলে দিলেন মাটীতে। দ্রোণের আনন্দের অন্ত নেই। তিনি অর্জ্জুনকে কোলে নিয়ে তাঁর মাথায় দিলেন শতেক চুমু।

আর একদিনের ঘটনা। দ্রোণ শিষ্যদের নিয়ে গেলেন গঙ্গাস্নানে। দ্রোণ জলে নামতেই এক প্রকাণ্ড কুমীর এসে তাঁকে গিলে ফেলতে চাইল। দ্রোণ একাই কুমীরটাকে মেরে ফেলতে পারতেন, কিন্তু তা না ক'রে তিনি চাইলেন শিষ্যদের সাহায্য। সবাই যখন নিজের নিজের অস্ত্র ঠিক করছেন, সেই সময়ে অর্জ্জুন পাঁচটা বাণ ছুড়ে কুমীরটার কুমীর-জন্ম শেষ ক'রে দিলেন। কুমীরটা জলের ওপর ভেসে উঠ্‌ল। জল থেকে উঠে এসে দ্রোণ অর্জ্জুনকে খুব আদর করলেন। অর্জ্জুনকে আদর করতে দেখে দুর্য্যোধন হিংসেয় পুড়ে যেতে লাগ্‌লেন।

দ্রোণাচার্য্য বুঝ্‌লেন কুমারদের অস্ত্রশিক্ষা সাঙ্গ হ'য়েছে, তাই তিনি তাঁদের শেষ পরীক্ষার জন্যে জানালেন ভীষ্মদেবকে। ভীষ্ম তখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসে ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজকুমারদের শেষ পরীক্ষা হওয়া দরকার মনে ক'রে সব ব্যবস্থা ঠিক করার জন্যে বিদুরকে বললেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কথামত পরীক্ষার জায়গা ঠিক করতে লাগলেন। চারিদিকে বড় বড় ঘর তৈরি করা হ'ল। আর সেই ঘরগুলো মুড়ে দেওয়া হ'ল মণি-মুক্তা দিয়ে। রাজবাড়ীর মেয়েদের জন্যে আলাদা জায়গার বন্দোবস্ত হ'ল।

যখন সব ঠিক হ'য়ে গেল, তখন পরীক্ষার দিন ঠিক করা হ'ল। সেদিন পরীক্ষার জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। নানান দেশের রাজা এসে জম্‌লেন। ঢাক ঢোলের আওয়াজে কানে তালা লাগ্‌তে লাগ্‌ল। কী ধূম! ধৃতরাষ্ট্র এসে বস্‌লেন হীরা বসানো সোনার সিংহাসনে। তাঁর পাশেই ভীষ্ম। গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি রাণীরা নিজের নিজের আসনে বস্‌লেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, কিছুই দেখতে পাননা তিনি, তাই সব ব'লে দেবার জন্যে তাঁর কাছে রইলেন বিদুর।

দ্রোণ শাদা পোষাক আর পাগড়ী প'রে, কপালে চন্দন মেখে এসে দাঁড়ালেন রঙ্গভূমির মাঝখানে। কি অপরূপ তাঁর চেহারা!

পরীক্ষা দেবার জন্যে দ্রোণ প্রথমেই ডাকলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির অস্ত্রের নানা খেলা দেখিয়ে ব'সে প'লেন।

তারপর এলেন ভীম আর দুর্য্যোধন। দু'জনের হাতেই এক একটা প্রকাণ্ড গদা। গদা যুদ্ধ সুরু হ'ল। কেউ ত কম যান না। সভার লোকেরা কেউ বা ভীমের, কেউ বা দুর্য্যোধনের সুখ্যাতি ক'রলেন। ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধে এমন মেতে উঠ্‌লেন যে, থামান দায়। অশ্বত্থামা তখন দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দিলেন থামিয়ে।

এবার পালা এল অর্জ্জুনের। অর্জ্জুন এগিয়ে আস্‌তেই চারিদিকে 'ধন্য' 'ধন্য' রব পড়ে গেল। তাঁর রূপ দেখে যেন চোখ ফেরান যায় না। নতুন মেঘের মত রঙ্, চাঁদপানা মুখ আর পদ্মের মত তাঁর চোখ। কলকল শব্দ শুনে ধৃতরাষ্ট্র এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

বিদুর বল্‌লেন, "তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন পরীক্ষা দিতে এলেন।"

"অর্জ্জুনের মত ছেলে পাওয়া কুন্তী আর কুরু বংশের ভাগ্যের কথা"—বারে বারে বল্‌তে লাগলেন ধৃতরাষ্ট্র।

অর্জ্জুন এসেই নুয়ে প'ড়ে গুরু দ্রোণকে প্রণাম করে বাণের খেলা জুড়ে

দিলেন। তিনি প্রথমেই ছুড়লেন অগ্নিবাণ। চারিদিকে যেন আগুন ধরে গেল। আগুনের শিখা লক্‌লক্ ক'রে ঠেক্‌ল আকাশে। তারপর বরুণ বাণে সেই আগুন নিবিয়ে চারিদিক জলে ভ'রিয়ে দিলেন। অজ্জুন বায়ু বাণে জল সরিয়ে আকাশ বাণে আবার বায়ু বাণ নষ্ট ক'রে দিলেন। পৰ্ব্বত বাণ ছুড়তেই দেখা গেল সাম্‌নে এক প্রকাণ্ড পাহাড়। লোকে ত অবাক্। বজ্রবাণ মেরে পাহাড়টা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেল্‌লেন। তারপর অজ্জুন দেখালেন একটা বড় মজার খেলা। তিনি যেমন অন্তর্ধান বাণ ছুড়েছেন, আর তাঁকে কেউ খুঁজে পায় না। এতগুলো লোকের চোখের সামনেই অজ্জুন কোথায় উধাও হ'য়ে গেলেন। কিছু পরে ফিরে এসে তিনি যুদ্ধের কত রকম কৌশল দেখালেন। তাঁর গলার আওয়াজে পৃথিবী থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল।

যখন সবাই অজ্জুনের খেলায় মস্‌গুল, তখন সকলের দৃষ্টি পড়ল একজনের ওপর। ইনি আর কেউ নন, ইনি কুন্তীরই এক ছেলে, নাম কর্ণ। কুন্তী একবার সূর্য্যের উপাসনা করেন। সূর্য্যের বরে তাঁর এক ছেলে হয়। এ কথা বড় কেউ জান্‌ত না। কুন্তী কিন্তু একটা তামার পাত্র ক'রে ছেলেটাকে ভাসিয়ে দেন জলে। সেই অবস্থায় এই ছেলে পান, সূত অধিরথ। অধিরথ ছেলেটাকে দেন তাঁর স্ত্রী রাধাকে। রাধার কোন ছেলে ছিল না। ছেলেটাকে পেয়ে রাধা আপন ছেলের মত মানুষ করেন। লোকে জান্‌ল কর্ণ রাধারই ছেলে।

কর্ণ যখন রঙ্গভূমিতে ঢুক্‌লেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে সবাই হ'ল মুগ্ধ। লম্বা চেহারা, গলান সোনার মত তাঁর রঙ, বড় বড় সুন্দর তাঁর চোখ, দেখলেই মনে হয় তাঁর গায়েও খুব জোর। তাঁর দু'কানে ঝলমল কর্‌ছে দুটো কুণ্ডল, আর গায়ে র'য়েছে কবচ। এই কবচকুণ্ডল নিয়েই কর্ণ জন্মেছিলেন। তাঁর কথাগুলোই বা কি মিষ্টি? লোকে ভাবল, তিনি কোন দেবতার ছেলে, ছলনা ক'রে এই রঙ্গ দেখ্‌তে এলেন।

কর্ণের দৃষ্টি অর্জ্জুনের ওপর। তিনি অর্জ্জুনকে বললেন, কি অস্ত্রের খেলাই শিখেছ অর্জ্জুন! তুমি যত কৌশল জান, তা ত আমি সব জানি-ই, আর এমন সব নতুন কৌশল জানি যা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে।

এই কথা শুনে অর্জ্জুন ত একেবারে চুপ। মুখে তাঁর রাটীও রইল না। কেবল মাঝে মাঝে মিটমিট ক'রে চাইছেন গুরু দ্রোণের মুখের পানে।

দ্রোণের হ'ল ভারী রাগ। তিনি কর্ণকে রুক্ষস্বরে বল্‌লেন, "দেখাও তোমার অস্ত্রের খেলা, শুধু মুখের কথায় আমাদের ভোলালে চল্‌বে না।

কর্ণ এমন বাণের খেলা দেখালেন, যা কেউ কখনো দেখেনি।

দুর্যোধনের আনন্দ দেখে কে! তিনি ভাবলেন, "যাক্, এতদিনে অর্জ্জুনের চেয়ে বড় একজন বীরের খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি তখুনি আসন থেকে উঠে এসে কর্ণকে বুকে চেপে ধ'রে বল্‌লেন, বড় আনন্দ দিলে ভাই। আমার যা কিছু আছে, সব তোমার। আমি কেবল চাই তোমার বন্ধুত্ব।"

কর্ণ বললেন, "আপনার আচরণে বড় সুখ পেলাম। আমি আজ থেকে আপনার দাস। অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পেলে আরো সুখী হব।"

কর্ণের কথায় অর্জ্জুনের গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল রাগে। অর্জ্জুন বল্‌লেন, "ওরে মূর্খ, তোকেত কেউ এখানে ডাকেনি। বিনা আহ্বানে এখানে এসে আমার অপমান করা তোর সাজে না। এতটুকু ভদ্রতাও কি তোর নেই?"

কর্ণ উত্তরে ব'ললেন, "মিছামিছি কেন এমন করুছ? অস্ত্র ধ'রে এগিয়ে এস, তবে বুঝি তুমি কেমন বীর। যার শক্তি আছে, সেই পায় সকলের আদর, সেই হয় সবার বড়। ধার্ম্মিক লোকে করে বলবানের পূজা। একবার এগিয়ে এসে দেখ, তোমার গুরুর সাম্‌নেই কেমন ক'রে করি তোমার মুণ্ডপাত।"

দ্রোণাচার্য্য রাগে জ্বলে উঠ্‌লেন, কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তখুনি আজ্ঞা দিলেন অর্জ্জুনকে।

অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্যে এলেন এগিয়ে, তাঁর পেছনে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেব।

কর্ণই বা পেছুবেন কেন? তিনি ত যুদ্ধই চান। তিনি তাঁর তীর ধনুক নিয়ে অর্জ্জুনের সুমুখে হাজির, তাঁর পক্ষে রইলেন দুর্যোধন প্রভৃতি একশ' ভাই। আর যত রাজা সেখানে ছিলেন, তাঁদের কেউ বা অর্জ্জুনের, কেউ বা কর্ণের পক্ষ নিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখ্‌বার জন্যে আকাশে উপস্থিত। তাঁর আজ্ঞায় মেঘের দল অর্জ্জুনের মাথায় ছায়া ক'রে দাঁড়াল, আর সূর্য্যদেব কর্ণের ওপর তাঁর সোনালি কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে পুত্র কর্ণের কাজে সায় দিলেন।

এই ব্যাপার দেখে কুন্তীর মন অশান্তিতে ভ'রে গেল। কবচ কুণ্ডল দেখে কর্ণকে ছেলে ব'লে চিন্‌তে পেরেছিলেন কুন্তী। ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ! কুন্তী ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বারে বারে অজ্ঞান হ'য়ে যাচ্ছেন।

কৃপাচার্য্য এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলেন। তিনি কর্ণকে ব'লে উঠ্‌লেন, "অর্জ্জুন রাজার ছেলে। তোমার বংশের পরিচয় আমাদের জানা নেই। তুমি বংশের পরিচয় দিতে না পারলে তোমার সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ চল্‌তে পারে না। যুদ্ধ হবে সমানে সমানে।"

কর্ণ বংশের কি পরিচয় দেবেন! লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলেন।

দুর্যোধন তখুনি কর্ণের মাথায় পরিয়ে দিলেন রত্নের মুকুট। তাঁকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে তিনি ব'ল্‌লেন, "আজ থেকে ভাই, তুমি অঙ্গদেশের রাজা।"

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

কর্ণ আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে আলিঙ্গন করলেন দুর্যোধনকে।

লোকের মুখে কর্ণের রাজা হওয়ার কথা শুনে অধিরথ ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলেন এখানে। বুড়ো লোক ব'লে সবাই তাকে পথ ছেড়ে দিল। অধিরথকে দেখেই কর্ণ সিংহাসন থেকে নেমে তার পায়ে প্রণাম করলেন। তখন কর্ণের বংশ পরিচয় পেতে আর কারো দেরি হ'ল না। সকলে জানল, কর্ণ সূতবংশের অধিরথের ছেলে।

ভীম সিংহের মত গর্জ্জন ক'রে কর্ণকে বল্‌লেন, "এতক্ষণে জান্‌লাম, তুই সারথির ছেলে। যুদ্ধ তোর সাজে না; চাবুক হাতে ক'রে রথ চালাগে। কুকুর হ'য়ে যজ্ঞের ঘিয়ের ভাগ চাইলে চলে কি?"

কর্ণের তখন ম'রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। মনের কষ্টে তিনি সূর্য্যের দিকে তাকালেন।

বন্ধু কর্ণের এত অপমান! দুর্যোধন অস্থির হ'য়ে প'লেন। ভীমের ওপর হ'ল তাঁর ভীষণ রাগ। তিনি ব'ল্‌লেন, "ভীম, তোর এত স্পর্দ্ধা, তুই আমার বন্ধুর অপমান করিস্? মানুষ জন্মের জন্যে দায়ী নয়, দায়ী তার কর্ম্মের জন্যে। অনেকে নীচু বংশে জন্মে বড় কাজ করে পেয়েছে সুখ্যাতি। তোর ঘটে একতিল বুদ্ধি থাকলে, এঁকে নীচ বংশের ব'লে মনে করতিস্‌নে। যাঁর এমন কবচ কুণ্ডল, তিনি কি কখনো নীচবংশের ছেলে হ'তে পারেন? আজ আমার এই বন্ধু হ'লেন অঙ্গের রাজা। নিজের জোরে ইনি পাবেন অনেক রাজার সম্মান। আমিও করব এঁর সেবা।"

সকলে ভাবল, ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ করে আজ বুঝি কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়।

যাক্, এই রকম বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যেই সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে সবাই চলে গেলেন নিজের নিজের বাড়িতে। দুর্যোধন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। অর্জ্জুনকে দেখে তাঁর অন্তর কাঁপত। বহুভাগ্যে আজ কর্ণের মত বীরকে পেলেন তাঁর দোসর।

রাজকুমারদের অস্ত্র-শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন গুরুদক্ষিণা দেওয়ার দরকার। দক্ষিণা না দিলে কোন কাজই সফল হয় না।

দ্রোণ সকলকে কাছে ডেকে বল্লেন—"তোমাদের শিক্ষা ত সাঙ্গ, এখন আমার দক্ষিণা চাই। আমি ধনদৌলত কিছুই চাইনে তোমাদের কাছে। শুধু আমার ইচ্ছে, তোমরা পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদকে বেঁধে এনে দাও।"

গুরুর কথায় কুমারেরা সৈন্য সাজাতে সুরু করে দিলেন। অর্জ্জুনের আর সবুর সয়না। সৈন্য সাজান হলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আপনাদের গিয়ে কাজ কি? আমি একাই দ্রুপদকে নিয়ে আস্‌ছি।"

এই কথা বলেই অর্জ্জুন রথে চড়ে সৈন্য নিয়ে চল্‌লেন দ্রুপদকে জয় কর্‌তে।

অর্জ্জুন পাঞ্চালে উপস্থিত। দ্রুপদ প্রথমে যুদ্ধ কর্‌তে চাইলেন না। একজন মন্ত্রীকে দিয়ে অর্জ্জুনকে বলে পাঠালেন,—অর্জ্জুন যা চান, তিনি তাই তাঁকে দিতে রাজি।

অর্জ্জুন যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু চান না। তিনি দ্রুপদকে যুদ্ধের জন্যে ডাক্‌লেন। দ্রুপদ—রাজা। তিনি যুদ্ধে পিছোন কি করে! তিনি সৈন্য নিয়ে এলেন অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে। দ্রুপদের সৈন্যরা অর্জ্জুনকে ঘিরে ফেলে হাজার হাজার বাণ ছুড়তে লাগল অর্জ্জুনের দিকে। অর্জ্জুন ভাল ভাল সব বাণে দ্রুপদের সৈন্য শেষ করে দিলেন। দ্রুপদের আর সৈন্য নেই। দুর্ব্বল দ্রুপদ যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে চাইলেন। অর্জ্জুন অনেক কড়া কথা ব'লে দ্রুপদকে ফিরিয়ে আনালেন।

দ্রুপদ প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেও অর্জ্জুনের কাছে হেরে গেলেন। অর্জ্জুন দ্রুপদের হাত দুটো ধ'রে তাঁকে রথে তুলে নিয়ে চল্‌লেন দ্রোণাচার্য্যের কাছে।

ফেরার পথে অর্জ্জুনের দেখা হ'ল দুর্যোধনের সঙ্গে। দ্রুপদকে সম্মান

করতে দেখে দুর্যোধন অর্জ্জুনকে বল্লেন, "গুরুদেবের কি আজ্ঞা ছিল অর্জ্জুন? এমন ক'রে নিয়ে যাওয়ার কথা ত ছিল না। তাঁর আদেশ ছিল দ্রুপদকে বেঁধে নিয়ে যেতে।"

এই কথা ব'লেই দুর্যোধন একলাফে উঠ্‌লেন অর্জ্জুনের রথে। তারপর দ্রুপদের হাত দুটো শক্ত ক'রে বেঁধে সৈন্যদের ব'ললেন, "দ্রুপদকে সারা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাও।"

রাজধানীতে এসেই দুর্যোধন দ্রুপদকে দ্রোণের পায়ের কাছে দিলেন ফেলে। দ্রোণ তখন দ্রুপদকে ব'ল্লেন, "কিহে দ্রুপদ, এখন আমায় বন্ধু ব'লে চিন্‌তে পার কি? এখনত আমি সমস্ত পাঞ্চালের রাজা। রাজার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব বোধ হয় চ'ল্‌তে পারে এখন? আমি সব পাঞ্চাল রাজ্যটা চাইনে। তোমার ছেলেবেলাকার কথা মনে ক'রে পাঞ্চালের অর্দ্ধেকটা নিলাম আর অর্দ্ধেকটা দিলাম তোমায় ফিরিয়ে। তুমি আর আমার শত্রু নও। এখন সমানে সমানে হ'ল আমাদের মিতালি। কেমন রাজিত? আমি ব্রাহ্মণ—আমার রাগ বেশিক্ষণ থাকৃতে পারে না। এই তোমার বাঁধন খুলে দিলাম, তুমি নিজের রাজ্যে ফিরে যাও।"

দ্রুপদ ঘোর অপমানে আর নিজের রাজ্যে ফিরতে পারলেন না। এত শিষ্য যাঁর সহায়, তাঁকে যুদ্ধে কখনো এঁটে উঠ্‌তে পারবেন না, মনে করে তিনি দ্রোণ আর দুর্যোধনকে মারবার জন্যে গঙ্গার ধারে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

যুধিষ্ঠিরের বয়স বেশ বেড়ে উঠেছে। তাঁকে যুবরাজ করতে ইচ্ছে হ'ল ধৃতরাষ্ট্রের। তিনি ভীষ্ম প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করে দিলেন। এই উপলক্ষে রাজধানীতে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ভীম অর্জ্জুন নানা দেশ জয় করে বেড়াতে লাগলেন। যারা আগে শত্রু ছিল, তাদের অনেকেই হ'ল বন্ধু। চারিদিকে যুধিষ্ঠিরের যশ

ছড়িয়ে প'ল। সকলের মুখেই যুধিষ্ঠিরের গুণগান। যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে সবাই খুব খুশি। কেউ দুর্যোধনের যশ গায়না। এই ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র মনে বড় ব্যথা পেলেন, মুখে কিছুই প্রকাশ করলেন না।

হাটে-মাঠে, পথে-ঘাটে প্রজারা খালি বলাবলি করছে, "ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন, রাজ্য নেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, কাজেই তিনি রাজা হ'তে পারেন না। যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর ছেলে, আর তিনিই বংশের ছেলেদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। এস, আমরা যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করে দি।"

দুর্যোধন যেখানেই যান, ঐ এক কথা। তাঁর মনের অবস্থা যা হল, তা আর কি ব'লব? তিনি পিতার কাছে এসে সব কথা জানালেন আর ছলনা করে পাণ্ডবদের রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলতেও ভুললেন না। ধৃতরাষ্ট্রের মন আগে থেকে বিষিয়ে থাকলেও প্রথমে দুর্যোধনের কথায় সায় দিতে পারলেন না।

এই কথাবার্তা চলছে, এমন সময় কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি আর আর দুর্যোধনের বন্ধুরা এলেন সেখানে। তাঁরাও ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন ঐ একই কথা।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "এত বড় অন্যায় কেউ সইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি কখনো আমার মতে মত দেবেন না।"

তখন দুর্যোধন উত্তর দিলেন, "গুরুপুত্র অশ্বত্থামা আমার বন্ধু, কাজেই দ্রোণ আর কৃপ আমার বিরুদ্ধে যাবেন না। ভীষ্মের সঙ্গে আমারো যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদেরও তাই। একমাত্র ভয় বিদুরকে। বিদুর একা পাণ্ডবদের সহায় থেকে আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবেন না। পাণ্ডবেরা রাজধানী ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকলে সেই ফাঁকে টাকাকড়ি দিয়ে রাজ্যের বড় বড় সবাইকে বশ করে ফেলব। তখন আর পাণ্ডবদের সিংহাসন দাবি করার শক্তি থাকবে না। আপনি যদি আমার কথা না রাখেন, তবে আমার আর এ রাজ্যে থেকে লাভ কি?"

ধৃতরাষ্ট্র কি আর করেন, অগত্যা দুর্যোধনের কথায় সায় দিলেন। দুর্যোধন অনেক টাকাকড়ি দিয়ে মন্ত্রীদের সব বশে এনে শিখিয়ে দিলেন,—তাঁরা যেন যুধিষ্ঠিরের সামনে বারণাবতের শোভার কথা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেন।

কথা ঠিক হ'য়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুধিষ্ঠিররা ব'সে আছেন। নানা কথার মাঝে মন্ত্রীরা বারণাবতের শোভার কথা তুল্লেন। বারণাবতের মত সুন্দর জায়গা নাকি পৃথিবীতে নেই, আর দেবতারা নাকি বারণাবতে আসেন তার শোভা দেখ্তে।

এই কথায় বারণাবত দেখ্তে ইচ্ছে হ'ল যুধিষ্ঠিরের। তিনি সেখানে যাবার কথা পাড়তেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "বেশ ত, তোমরা পাঁচভাই কুন্তীদেবীর সঙ্গে সেখানে কিছুদিন থাক, পরে আবার হস্তিনানগরে ফিরে এস।"

যেতে চাইলেন একা, অথচ ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মাকে আর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে যেতে! যুধিষ্ঠিরের মনে সন্দেহ জাগল। যাব যখন ব'লেছেন, তখন আর তিনি অন্য মত কর্লেন না।

দুর্যোধন পুরোচন নামে এক দুষ্ট মন্ত্রীকে অনেক টাকা দিয়ে বল্লেন, "আপনি এখুনি বারণাবতে চলে যান। সেখানে এমন একটা বাড়ি তৈরি করুন, যা আগুন দেওয়ামাত্রই পুড়ে যায়। গালা, ধূনো, ঘি, তেল, শন দিয়ে খুব ভাল ক'রে বাড়িটা তৈরি করুন। থামগুলো সব ঘি দিয়ে ভরিয়ে দেবেন। বাড়ির চারিদিকে কাটাবেন বড় বড় খাল, যেন পাণ্ডবেরা লাফিয়ে পালাতে না পারে। সেখানে থাক্তে থাক্তে যখন তাদের মনে আস্বে বিশ্বাস, তখন একদিন রাত্তিরে সেই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাদের সব পুড়িয়ে মারবেন। সাবধান, তারা যেন এর কিছু জান্তে না পারে।"

দুর্যোধনের কথামত বারণাবতে বাড়ি তৈরি করল পুরোচন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুজনদের প্রণাম ক'রে মা আর ভাইদের নিয়ে বারণাবতে যাত্রা করলেন। রাজ্যের প্রজারা যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে থাকতে চায়না, সবাই চলে তাঁর সঙ্গে। যুধিষ্ঠির অনেক ক'রে তাদের নিরস্ত করলেন। বিদুর কিছুদূর গেলেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে। বিদায় দেবার সময় বিদুরের চোখ্ ছলছল ক'রে উঠ্‌ল। তিনি ম্লেচ্ছভাষায় আগুনের সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বিদায় দিলেন।

বারণাবতের প্রজারা আগিয়ে নিলেন যুধিষ্ঠিরদের। পথে দাঁড়িয়ে প্রজাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ করতে লাগলেন যুধিষ্ঠির।

পুরোচন মিষ্টি কথায় তাঁদের তুষ্ট ক'রে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন।

পুরোচন একটু দূরে গেলে যুধিষ্ঠির ভীমকে বাড়িটা পরখ ক'রে দেখ্‌তে বললেন। ভীম দাদার কথায় বাড়ির দেওয়াল শুঁকে গালা, ঘি, তেল আরো কত কি জিনিষের গন্ধ পেলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "দাদা, কাজ নেই এখানে থেকে। চলুন, আমরা হস্তিনানগরে ফিরে যাই।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "না ভাই, অত তাড়াতাড়িতে কাজ নেই। যদি দুর্যোধন টের পায়, আমরা তার মতলব ধ'রে ফেলেছি, তবে সে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রে আমাদের হারিয়ে দেবে। সুযোগ পেলে সব ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে।"

বেশি সময় যুধিষ্ঠিরেরা বাড়িতে থাকেন না। পথ-ঘাট চিনে নেওয়ার জন্যে খালি মৃগয়া ক'রে বেড়ান।

এদিকে বিদুরের মনে শান্তি নেই। তিনি কেবল ভাবেন পাণ্ডবদের জন্যে,—কিজানি কখন পুরোচন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারে! অনেক ভেবে চিন্তে বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন একটা লোককে! সে খুব ভাল সুড়ঙ্গ কাটতে পারত।

মৃগয়ার পথে যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে দেখা হ'ল ঐ লোকটার। সে বিদুরের সব কথা জানাল যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পেয়ে সে পাণ্ডবদের শোবার ঘর থেকে সুড়ঙ্গ কাট্‌তে সুরু কর্‌ল। সুড়ঙ্গটা পৌঁছুল একেবারে নগরের বাইরে। কাজ শেষ ক'রে লোকটা যুধিষ্ঠিরকে বল্‌ল, "বিদুর মশাই ব'লেছেন,—আস্‌ছে চতুর্দ্দশীতে পুরোচন এই বাড়ীতে দেবে আগুন। আপনারা এই সুড়ঙ্গ দিয়ে একেবারে নগরের বাইরে চ'লে যাবেন।"

সে দিন চতুর্দ্দশী। ব্রাহ্মণ আর গরীবদের খাওয়াবার ইচ্ছে হ'ল কুন্তীদেবীর। সেই রকম ব্যবস্থা হ'ল। গরীবদের দলে ছিল এক ব্যাধের বউ আর তার সঙ্গে ছিল তার পাঁচটা ছেলে। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তে সন্ধ্যে উতরে গেল। ব্যাধের বউ ছেলেদের নিয়ে ঐ বাড়িতেই ঘুমিয়ে প'ল। একে একে বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে, পুরোচনও বাদ গেলনা।

রাত্তির যখন বেশ একটু ছমছমে হ'য়ে এল, তখন ভীম ঐ বাড়িতে আগুন দেবার আদেশ পেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যেমন কথা, তেমনি কাজ। আগুন হু হু ক'রে জ্ব'লে উঠে গোটা বাড়িটা গিল্‌তে লাগ্‌ল। মাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে প'লেন। সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে তারা এসে হাজির এক বনে। কুন্তী প্রভৃতির পা আর চল্‌ছে না। কত সুখেই ছিলেন তাঁরা! এমন কষ্ট ত কখনো তাঁদের সইতে হয়নি! ভীম তখন মা কুন্তী, নকুল, সহদেবকে কাঁধে আর—যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে কোলে নিয়ে ভীষণ বেগে চ'লেছেন। তাঁর পায়ের দাপে বসুমতী কাঁপতে লাগ্‌ল। গাছ-পাথর যা সাম্‌নে পড়ে, সব ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে গেল। ক্রমে তাঁরা এসে পৌঁছুলেন গঙ্গার ধারে।

কি ক'রে গঙ্গা পেরুবেন, এই হ'ল তাঁদের ভাবনা। গঙ্গায় অথৈ জল। পথ হেঁটে তাঁরা সবাই বেশ কাবু হ'য়ে প'ড়েছেন। সকাল হ'য়ে আস্‌ছে। ধরা পড়বার ভয়ও তাঁদের কম নেই। লক্ষ্য ক'রে তাঁরা দেখ্‌লেন,—

দূরে বকের পাখার মত শাদা পাল তুলে একখান নৌকা যেন তাঁদের দিকে আস্‌ছে। সত্যিই-ত নৌকাখানা এসে তাঁদের কাছে ভিড়ল! নৌকা থেকে একজন লোক নেমে এসে বিদুরের ইঙ্গিত তাঁদের জানাল। অবিশ্বাসের কি আছে! সকলে ঐ নৌকায় চড়ে গঙ্গা পার হ'লেন। লোকটা তাঁদের নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

জতুগৃহ জ্বলছে। বারণাবতের প্রজারা ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এল। চারিদিকে ধোঁয়া, কিছুই দেখা যায় না। তেল, ঘি, গালার গন্ধে সবাই বুঝ্‌ল,—এটা পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার একটা কৌশল। সকালের আশায় সবাই সেখানে জড়ো হ'য়ে রইল।

সকালে সূর্য্যের আলোয় তাঁরা দেখ্‌ল,—জায়গাটা শ্মশানের মত। তারা ছাই সরিয়ে সরিয়ে মড়া বা'র করতে লাগ্‌ল। ব্যাধের বউ আর তার ছেলেদের পোড়া শরীর দেখে তা'রা ভাব্‌ল,—পাণ্ডবেরা মা'র সঙ্গে নিশ্চয়ই পুড়ে মরেছেন। সকলের চোখেই জল দেখা দিল। এই ঘটনায় তারা দোষ দিল ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনের।

যথাকালে এই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছুল হস্তিনায়। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি কেঁদে আকুল, গান্ধারীরই বা কী কান্না! হস্তিনার প্রজারা সব 'হায় হায়' করছে। হাসি দেখা গেল একজনের,—তিনি দুর্যোধন। তাঁর মনের সাধ পূরেছে। বিদুরের কোন ভাবনা নেই, তাঁর লোক এসে পাণ্ডবদের বেঁচে যাওয়ার খবর জানিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

গঙ্গা পার হ'য়ে—কুন্তী আর পাণ্ডবেরা বনের পর বন পার হ'চ্ছেন। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে তাঁদের। কুন্তীদেবী বল্‌লেন,—জল না পেলে তিনি আর এক পাও এগুতে পারবেন না।

সবাইকে একটা বড় গাছের তলায় রেখে ভীম গেলেন জলের খোঁজে। অনেক দূরে পাওয়া গেল জল। ভীম সেই জলে স্নান ক'রে, নিজে কিছু

জল খেলেন। এখন মায়ের জন্যে তাঁর জল নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পাত্র কৈ, জল নেন কিসে? তখন তিনি তাঁর কাপড় ভিজিয়ে জল নিয়ে চল্‌লেন।

গাছতলায় এসে ভীম দেখ্‌লেন,—মা আর ভায়েরা সব মাটীতে প'ড়ে ঘুমুচ্ছেন। বড় দুঃখ হ'ল ভীমের। যে মা আর ভায়েরা—নরম বিছানা না হলে ঘুমুতে পারতেন না, তাঁদের কিনা আজ এমন দশা! ভীমের গাল ব'য়ে চোখের জল পড়তে লাগ্‌ল। কি ক'রে এর শোধ নেওয়া যায়? তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, দাদা যুধিষ্ঠির যদি একবার হুকুম কর্‌তেন, তবে তিনি দুর্যোধনকে এমন সাজা দিতেন যে, সে আর কখনো তাঁদের কষ্ট দিতে সাহস কর্‌ত না। এই রকম কত ভাবনা তাঁর মনে আসে আর চ'লে যায়।

সেটা ছিল হিড়িম্ব রাক্ষসের বন। হিড়িম্ব তার বোন্ হিড়িম্বাকে নিয়ে থাক্‌ত সেই বনে। কিম্ভুত কিমাকার তার চেহারা, কুলোর মত কান, বিকট বেয়াড়া বড় বড় তার দাঁত, এমন মুখের হাঁ, যেন হাতীও ঢুকে যায় তার মুখের মধ্যে। গায়ের রঙ্ মিশমিশে কাল, তার গলার আওয়াজ শুন্‌লে জীবজন্তু আর সে বনে থাকেনা।

এমন চলচলে ছ-ছটা মানুষ দেখে তার জিভ লক্‌লক্ করে উঠল, টপ্‌টপ্ ক'রে নাল প'ড়ে তার বুক ভেসে যেতে লাগ্‌ল।

সে হিড়িম্বাকে বলল, "যা ত হিড়িম্বে, মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে। এমন মাংস খাইনি অনেক দিন। একটুও দেরী করিস্‌নে। যাবি আর আস্‌বি। মানুষ খাওয়ার লোভ আমি আর সইতে পারছি নে।"

হিড়িম্বা চ'ল্‌ল পাণ্ডবদের ধ'রে আন্‌তে। মানুষ খাওয়ার লোভ তারো কম নয়।

কিন্তু একি হ'ল! মানুষ খাবার লোভ যার এত, সে পথের মাঝে

এমন ক'রে থমকে দাঁড়ায় কেন! ভীম ত জেগে ব'সে আছেন। তাঁর চেহারা দেখে হিড়িম্বার মাথা গেল ঘুরে। সে তখুনি একটা রূপসী মেয়ের রূপ ধ'রে—ভীমের কাছে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। ভীমেরো ভাল লাগ্‌ল মেয়েটীকে। তিনি তাঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগ্‌লেন।

হিড়িম্বা ফেরে না। তাঁর দেরি দেখে হিড়িম্ব পাণ্ডবদের কাছে এসে যা দেখ্‌ল, তাতেই তার চক্ষু স্থির! হিড়িম্ব দেখে,—হিড়িম্বা রূপসীর রূপ ধরে মনের আনন্দে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তার যত রাগ হ'ল হিড়িম্বার ওপর। গালগালাজ করতে করতে সে মারতে এল হিড়িম্বাকে। ভীম দিলেন হিড়িম্বকে বাধা। চোখের সাম্‌নে স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার তিনি দেখ্‌তে পারলেন না।

হিড়িম্ব মস্ত বড় হা ক'রে গিল্‌তে এল ভীমকে। ভীম কিল, চড়, ঘুসি, লাথি মেরে দিলেন হিড়িম্বকে মাটীতে ফেলে। হিড়িম্বও খুব জোরে চেপে ধর্‌ল ভীমকে। দুজনের গায়ের চাপে সেখানকার মাটী ব'সে গেল অনেকখানি। ভীমের হুঙ্কারে কুন্তীদেবী আর পাণ্ডবেরা জেগে উঠ্‌লেন। ভীম কিছুতেই হিড়িম্বকে মেরে ফেলতে পারেন না।

অর্জ্জুন বল্‌লেন, "দাদা, আপনি স'রে আসুন, আমি রাক্ষসটাকে দিই শেষ ক'রে।"

অর্জ্জুনের কথায় ভীমের রাগ বেড়ে গেল। তিনি দুহাত দিয়ে হিড়িম্বকে মাথার ওপর তুলে পাখীর মত ঘুরিয়ে এমন আছাড় মারলেন, তাতেই রাক্ষসটা কাহিল। তখন ভীম তার দেহটা হাঁটুর নীচে ধ'রে দুখান ক'রে ফেল্‌লেন।

আর সেখানে থাকা নয়। রাক্ষসের দেহটা দেখে যদি কেউ পাণ্ডবদের জান্‌তে পারে—এই ভয়ে তাঁরা তখুনি সেই বন ছেড়ে চল্‌লেন। হিড়িম্বাও চ'লেছে তাঁদের সঙ্গে। ভীম হিড়িম্বাকে সঙ্গে নিতে রাজি নন। তার

ভাই হিড়িম্ব তাদের মারতে চেয়েছিল। হিড়িম্বা যখন তার বোন, তখন সে স্থবিধা পেলে পাণ্ডবদের সহজে ছাড়বে না। হিড়িম্বা গিয়ে কুন্তীদেবীর পা জড়িয়ে ধ'রে ভীমকে বিয়ে করার ইচ্ছে জানাল তাঁকে। কুন্তী হিড়িম্বাকে বিয়ে করতে হুকুম দিলেন ভীমকে। যুধিষ্ঠির মায়ের কথায় সায় দিলেন। ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে না ক'রে পারলেন না।

তাঁরা একটা বনে কিছুদিন বাস করার পর হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের একটা ছেলে হ'ল। তার মাথায় একটাও চুল ছিলনা ব'লে তার নাম রাখা হ'ল ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচকে নিয়ে হিড়িম্বা তাঁদের কাছে বিদায় চাইল। ঘটোৎকচ ভীমকে বলল, "বাবা, আপনাদের যখন দরকার হবে, তখন আমায় মনে করলে আমি এসে আপনাদের কাজ ক'রে দেব।

এই কথা ব'লে ঘটোৎকচ মায়ের সঙ্গে উত্তর দিকে চ'লে গেল।

পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশ ধরলেন। মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ, পরণে গাছের ছাল। হঠাৎ দেখলে তাঁদের ঋষি ব'লে বোধ হয়। এই বেশে তাঁরা দেশে দেশে বেড়ালেন। একদিনের বেশি কোথাও থাকেন না, লোকজনের সামনেও বড় বেরোন না। ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল প্রভৃতি জায়গায় বেড়াবার পথে তাঁরা দেখা পেলেন বেদব্যাসের। কুন্তীদেবী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাঁদের দুঃখের কথা জানালেন বেদব্যাসকে! বেদব্যাস ধ্যানে সব কথাই জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বললেন, "মা কুন্তি, তোমাদের সব কথাই আমি জানি। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধন আপন পাপে মজবে। কিছু দুঃখ ক'রোনা। দিন কারো সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ আসে। তোমার ছেলেরা ধর্মের জোরে বড় হ'য়ে উঠবে। তোমরা কিছুদিন সাবধানে অপেক্ষা ক'রে থাক।"

বেদব্যাস পাণ্ডবদের একচক্রায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রেখে আশ্রমে চ'লে গেলেন।

যে ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁরা ছিলেন, তাঁরা বড় ভাল লোক। সেই ব্রাহ্মণ আর তাঁর স্ত্রী, কুন্তী প্রভৃতিকে খুব আদর যত্ন করলেন।

পাঁচ ভাই ভিক্ষায় যান, যা পান এনে মাকে দেন। মা তাই রান্না ক'রে ভীমকে অর্দ্ধেক দিয়ে বাকি অর্দ্ধেক পাঁচজনে ভাগ ক'রে খান।

একদিন ভীম ছাড়া চার ভাই গেলেন ভিক্ষায়। ভীম রইলেন মার কাছে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের বাড়িতে উঠ্‌ল কান্নার রোল। কুন্তীদেবী ঐ কান্না শুনে বড় কাতর হ'লেন। ব্যাপার কি, জান্‌বার জন্যে গেলেন ব্রাহ্মণের কাছে। তিনি শুন্‌লেন, ঐ গ্রামে বক নামে আছে এক রাক্ষস। রাক্ষস বড় দুরন্ত। আগে সে গ্রামে খুব উৎপাত করত। তাই গ্রামের লোকেরা মিলে ব্যবস্থা করল, এক এক গৃহস্থ ঐ রাক্ষসের খাবার জোগাবে এক এক দিন। রাক্ষসটার খাবার বড় সোজা নয়,—একগাড়ী ভাত, ডাল, তরকারী, পায়স, পিঠে, মোণ্ডা, মেঠাই, একটা মানুষ আর দুটো মোষ। সে দিন প'ড়েছে ঐ ব্রাহ্মণের পালা। কে যাবে রাক্ষসের কাছে, তাই নিয়ে বেধেছে গোল। কুন্তীদেবীর প্রাণ গেল গ'লে। তিনি ব'ললেন ব্রাহ্মণকে, "আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়ে উপকার ক'রেছেন। আপনার উপকার করাও আমাদের উচিত। আমার পাঁচ ছেলে আছে, তাদের একজনকে দিতে চাই আপনার উপকারে।"

ব্রাহ্মণ ত আশ্চর্য্য হ'লেন। অতিথির প্রাণের বদলে বাঁচাবেন তাঁর বা তাঁর আত্মীয়ের প্রাণ! তাত হ'তে পারে না। অতিথির অপকারে ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হ'য়ে যাবে যে! তিনি কুন্তীর কথায় রাজি হ'তে পার্‌লেন না।

কুন্তী দেবী ফের বল্‌লেন, "আমার ছেলেদের গায়ে খুব জোর।

যে ছেলেকে পাঠাব, সে রাক্ষস মেরে ফিরে আস্‌বে। আপনি মত দেন। আপনার কোন ভাবনা নেই।"

ব্রাহ্মণ আর তাঁর কথা ঠেল্‌তে পার্‌লেন না।

মায়ের কাছে এই কথা শুনে ভীম ত, একেবারে আহ্লাদে আট খানা! ভীমের যুদ্ধই লাগ্‌ত ভাল, তাই বকের সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার ইচ্ছে হ'ল তাঁর। আলাপটা কেমন, তা একটু পরেই জানা যাবে।

ভিক্ষা সেরে সন্ধ্যেবেলা যুধিষ্ঠির ফিরে এলেন ভাইদের নিয়ে। মার কাছে—বক রাক্ষসের কাছে ভীমের যাবার কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের মন একেবারে দ'মে গেল। তিনি মাকে বল্‌লেন, "মা, তুমি কেমন ক'রে এমন ছেলে রাক্ষসের মুখে তুলে দিতে যাচ্ছ? ভীমের জোরেই আমার জোর। ভীম প্রাণে না বাঁচলে কি কখনো হস্তিনার সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌ব আমি? যাই বল, একাজ তোমার মোটেই ভাল হয় নি মা।"

কুন্তী উত্তর দিলেন, "আশ্রয় যিনি দিয়েছেন আমাদের, তাঁর উপকার না ক'রে কেমন ক'রে থাকি বাবা। ব্রাহ্মণ বিপদে প'ড়েছেন, তাঁকে বাঁচান কি আমাদের উচিত নয়? তুমি ভীমের জন্য একটুও ভেবোনা বাবা। আমি মা, আমি কি বুঝিনে আমার ভীমের গায়ে কত জোর? ভীম যখন জন্মাল, তখন ভারী ব'লে আমি ভীমকে কোলে নিতে পার্‌লাম না, সে আমার হাত থেকে প'ড়ে গেল পাহাড়ের ওপর। তার গায়ের ঘায়ে—পাহাড় কেঁপে উঠ্‌ল। তার গায়ে এখন দশ হাজার হাতীর জোর। তোমরা ত জান, ভীম অনায়াসে তোমাদের পাঁচ জনকে আর আমাকে ব'য়ে নিয়ে এল কত পথ। ভীম না থাক্‌লে কি পুরোচনের হাতে আমরা বাঁচতাম, না হিড়িম্বের হাতে আমাদের জীবন রক্ষা পেত? আমার আশীর্ব্বাদে ভীম বককে মেরে বাড়ী ফিরে আস্‌বে।"

এমন মা না হ'লে কি এমন বীর সন্তানের জন্ম হয়? যুধিষ্ঠির আর অমত করতে পারলেন না।

রাত্রি এল। ভীম একগাড়ী খাবার নিয়ে চ'ল্লেন বকের উদ্দেশ্যে। রাক্ষসের আস্তানায় পৌছে ভীম 'কোথায় বক, কোথায় বক' বলে চীৎকার ক'রে বককে ডেকেই সেই খাবারগুলো প্রাণ ভ'রে খেতে স্বরু করলেম। বকও ভীমের ডাক শুনে খাবার লোভে দড়বড় ক'রে ছুটে আসতে লাগ্ল সেখানে। বক দেখে, তার খাবার গুলো খাচ্ছে আর একজনে। সে মস্ত এক গাছ উপ্ড়ে এনে বসিয়ে দিল ভীমের পিঠে। ভীমের গায়ে আঁচড়টি ও লাগ্ল না। তিনি বাঁ হাত দিয়ে রাক্ষসের হাত থেকে গাছটা কেড়ে নিয়ে যেমন খাচ্ছিলেন, তেমনি খেয়ে যেতে লাগ্লেন। বক গাছের পর গাছ এনে ভীমকে মারছে। ভীমের খাওয়া হ'ল শেষ এর মধ্যে। ভীমও প্রকাণ্ড একটা গাছ তুলে নিয়ে বককে বেদম মারতে লাগ্লেন। গাছে গাছে কী লড়াই! গাছ আর সেখানে রইল না একটাও। তখন স্বরু হ'ল পাথরের যুদ্ধ। মড় মড় ক'রে ভীমও পাহাড় ভাঙ্গেন, বকও পাহাড় ভাঙ্গে। পাথরেও যখন কুলোল না, তখন আরম্ভ হ'ল হাতে হাতে, মাথায় মাথায়, বুকে বুকে যুদ্ধ। বক ভীমের মার খেয়ে আর দাঁড়াতে পারল না, পড়ে গেল ভীমের পায়ের নীচে। ভীম তখন একহাত দিয়ে তার মাথা, আর একহাত দিয়ে তার পা দু'খানা ধরে হাঁটুর চাপে মট্ ক'রে ভেঙ্গে ফেল্লেন বকের দেহটা। বক সেখানে প'ড়ে রইল যেন একটা বিরাট পাহাড়।

ভীম বাড়ি ফিরে মার আর দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে ব্যাপারটা জানালেন। সেই ব্রাহ্মণ আর তাঁর পরিজনদের কী আনন্দ!

পরের দিন ভোরবেলা গ্রামের লোকেরা বকের দেহটা দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল। এতদিনে তাদের আপদ দূর হ'ল।

এমনি করে কিছুদিন যায়। একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের মেয়ের রূপগুণের কথা ব'লে তাঁর স্বয়ম্বরের কথা জানালেন পাণ্ডবদের। দ্রুপদের মেয়ের ব্যাপার ভাল করে জান্‌তে চাইলেন তাঁরা, তাই ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন, "একবার দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের কাছে হেরে আর তাঁর রাজ্য হারিয়ে দ্রোণ আর দুর্যোধনকে মেরে ফেলবার আশায় গঙ্গার ধারে যজ্ঞ স্বরু করেন। ভাল ব্রাহ্মণ না পেলে যজ্ঞ হয় না। তিনি ভাগ্যে দেখা পেলেন উপযাজ নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের। দ্রুপদ মনের কথা জানালেন তাঁকে। তিনি দ্রুপদকে দিলেন তাঁর দাদা যাজের খবর। দ্রুপদের বিনয়ে যাজের মন ভিজে গেল। যাজ বেদমন্ত্র পাঠ ক'রে যজ্ঞ স্বরু করলেন। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে জন্ম হ'ল একটি ছেলের। আগুনের মত তাঁর রঙ্, মাথায় ঝকমকে টোপর, হাতে তীর ধনুক আর ধারাল খাঁড়া। যজ্ঞের বেদী থেকে জন্মালেন একটী মেয়ে। নীলপদ্মের মত কী স্বন্দর তাঁর রঙ্, ভোম্‌রার মত কাল চুল, তাঁর রূপে—আলো কর্‌ল চারদিক, গায়ের স্বগন্ধ ছুটল বহুদূর। তখুনি দৈববাণী হ'ল, "এই ছেলে হ'তে হবে দ্রোণের নিধন, আর ঐ মেয়ে হ'তে—কুরুকুলের বিনাশ।" রাজার মনের আশাও ত ছিল এই! ছেলেটীর নাম হ'ল ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর মেয়েটীর রঙ্ শ্যামল ব'লে নাম রাখা হ'ল কৃষ্ণা, যজ্ঞ থেকে জন্ম ব'লে নাম হ'ল যাজ্ঞসেনী—আর দ্রুপদের মেয়ে ব'লে আরও একটা নাম থাকল দ্রৌপদী।"

ব্রাহ্মণ এই কথা ব'লে চ'লে গেলেন।

বেদব্যাস এলেন পাণ্ডবদের দেখতে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যাবার জন্যে তিনি পাণ্ডবদের উপদেশ দিলেন। পাণ্ডবদেরো স্বয়ম্বর দেখবার খুব ইচ্ছে। তাই তাঁরা মাকে নিয়ে—পাঞ্চাল রাজ্যে যাবার জন্যে ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে বেরিয়ে প'লেন।

পাঞ্চাল যাবার পথে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল গন্ধর্বদের রাজা অঙ্গারপর্ণের সঙ্গে। অঙ্গারপর্ণ হেরে গিয়ে অর্জ্জুনকে দিলেন চাক্ষুষীবিদ্যা আর একশ' ঘোড়া। ঘোড়াগুলো তখনকার মত থাকল অঙ্গারপর্ণের কাছে। অঙ্গারপর্ণের উপদেশে অর্জ্জুন উৎকোচক তীর্থে গিয়ে ধৌম্যকে করলেন পুরোহিত। পুরোহিত সঙ্গে থাকলে মানুষের কোন বিপদ হয় না। ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবেরা এক কুমোরের বাড়ি রইলেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। পাঞ্চালরাজ্যে খুব ধুম পড়ে গিয়েছে। নিমন্ত্রণ পেয়ে জলপথে, স্থলপথে, পাহাড়ের পথে নানা দেশের রাজা এসে জমলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিও এসে জুটলেন পাঞ্চালে। রাজাদের থাকবার জন্যে ভাল ভাল বাড়ি তৈরি হ'য়েছে। লতা, পাতা, ফুল দিয়ে রাজধানী সাজান হয়েছে। চন্দনের জলে রাস্তা সব ভিজে। রাজধানীর শোভা বেড়ে গিয়েছে একশ' গুণ।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হবে লক্ষ্যভেদের সাহায্যে। দ্রৌপদীর রূপ দেখে দ্রুপদ ভাবলেন, দ্রৌপদীর যোগ্য বর অর্জ্জুন। অর্জ্জুন ছাড়া আর কেউ দ্রৌপদীকে বিয়ে করলে মানাবে না। পাণ্ডবদের কোন খোঁজ নেই। লোকে জানে জতুগৃহে তাঁদের মরণ হ'য়েছে। তবু দ্রুপদের মনে হ'ল পাণ্ডবেরা আছেন বেঁচে। নানা দিকে দ্রুপদের লোক গেল অর্জ্জুনের খোঁজে, খোঁজ মিলল না। পাছে, হঠাৎ দ্রৌপদী অযোগ্য বরের হাতে পড়েন, এই ভয়ে দ্রুপদ করলেন অদ্ভুত এক লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা। তিনি খুব উঁচুতে একটা সোনার মাছ রেখে তার নীচে রাখলেন রাধাচক্র। মাটীতে থাকল একটা জলের চৌবাচ্চা। ঐ জলে ছায়া দেখে তবে ঐ মাছটা বিঁধতে হবে বাণে। বড় সহজ ব্যাপার নয়। জলের পাশেই আছে মস্ত বড় ধনুক আর পাঁচটা বাণ।

ঠিক দিনে স্বয়ম্বর সভা আরম্ভ হ'ল। রাজারা সব বসলেন সভার

মধ্যে এক একটা জমকাল সিংহাসনে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসলেন পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের সাজে। প্রজারা এসে ভিড় জমিয়ে দিল। দেবতারাও সভা দেখবার জন্যে আকাশে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে গরুড়ে এসে পাঞ্চজন্য শাঁখ বাজিয়ে দিলেন। ঢাক, ঢোলের আওয়াজ যেন শ্রীকৃষ্ণের শাঁখের আওয়াজে মিইয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের শাঁখের শব্দ শুনে ভীষ্ম, দ্রোণ জানালেন তাঁকে প্রণাম – আর জরাসন্ধ, শিশুপাল উঠল বিদ্রূপ ক'রে। তারা যে শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু !

দ্রৌপদী ধৃষ্টদ্যুম্নের হাত ধ'রে সভায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে পাবার লোভে রাজারা অস্থির হ'য়ে পলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন এগিয়ে এসে রাজাদের বললেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন, তিনি পাবেন আমার বোন্—দ্রৌপদীকে।"

রাজাদের হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী। তাঁর দাবি আগে, তাই তিনি প্রথমেই ধনুক তুলে নিয়ে তাতে ছিলে পরাতে গেলেন, কিন্তু ছিট্‌কে পড়ে হ'লেন অজ্ঞান। দুর্যোধনেরো হ'ল ঐ দশা। বিরাটরাজ ধনুক নিয়ে ছিলে পরাতে গিয়ে ছিলে পরাতে পারলেন না। সুশর্ম্মা, কীচক, শিশুপালেরো সমান অবস্থা। সকলেই অবাক্। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রাজারা দ্রুপদকে ডেকে বল্‌লেন, "মতলব কি আপনার? মহারাজ ভগদত্তের মেয়ের স্বয়ম্বরেও লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা ছিল। তখন কর্ণ লক্ষ্যভেদ ক'রে ভগদত্তের মেয়ে ভানুমতীকে লাভ করে বন্ধু দুর্যোধনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ ধনুকে ছিলে পরানও গেলনা যে! এ আপনার একটা ছল।"

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ফের রাজাদের বললেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন, তাঁর কুল, শীল, বয়েস বিচার না ক'রেই তাঁকে দেওয়া হবে দ্রৌপদীকে"।

এই কথায় ভীষ্ম উঠে এসে সহজেই ধনুকটা তুলে নিয়ে তাতে দিলেন ছিলে পরিয়ে। ভীষ্ম পরশুরামের শিষ্য, তিনি নিশ্চয়ই—লক্ষ্যভেদ কর্‌তে পারবেন মনে ক'রে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে লক্ষ্যটাকে ঢেকে রাখলেন। ভীষ্মের ছোড়া বাণ ঐ সুদর্শনে লেগে ঠিক্‌রে প'ল মাটিতে। দ্রোণ, অশ্বত্থামাও লক্ষ্যভেদ কর্‌তে পারলে না ঐ একই কারণে। কর্ণ ধনুকের ছিলেটা খুলে ফেলে আবার তাতে ছিলে পরিয়ে যেমন বাণ ছুড়লেন, অমনি বাণটা সুদর্শনে ঠেকে প'ড়ে গেল মাটীর ওপর।

আর সভায় থেকে লাভ কি! বলরাম চ'লে যেতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আর একটু অপেক্ষা কর্‌তে বলে বল্‌লেন, "অর্জ্জুন ছাড়া এ লক্ষ্যভেদ কেউ কর্‌তে পার্‌বে না।" বলরামের ধারণা, অর্জ্জুন বেঁচে নেই, তাই অর্জ্জুনের নাম শুনে তাঁর আশ্চর্য্য ঠেক্‌ল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের মাঝে পাণ্ডবদের দেখিয়ে দিলেন। সত্যই ত অর্জ্জুন বেঁচে আছেন! পরে কি হয় দেখ্‌বার জন্য বলরাম অপেক্ষা করে থাক্‌লেন।

রাজারা বা রাজার বন্ধুরা কেউ লক্ষ্য ভেদ কর্‌তে পার্‌লেন না দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যিনি এই লক্ষ্য ভেদ কর্‌বেন, তিনিই পাবেন এই দ্রোপদীকে।"

ধৃষ্টদ্যুম্নের কথায় অর্জ্জুন হ'লেন চঞ্চল, মত পাবার আশায় তিনি তাকালেন যুধিষ্টিরের দিকে। যুধিষ্ঠীরো ইঙ্গিতে মত দিলেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদে উঠ্‌তে দেখে ব্রাহ্মণদের কেউ বা দিলেন তাঁকে বাধা, আবার কেউ বা দিলেন তাঁকে উৎসাহ। অর্জ্জুন থম্‌কে গেলেন। এমন সময় বেজে উঠ্‌ল শ্রীকৃষ্ণের শাঁখ, অর্জ্জুন বুকে পেলেন বল। তিনি সভার মাঝে এসে প্রথমেই করলেন শিবকে প্রণাম। তারপর তিনি এমনভাবে ধনুকখানা নিলেন যেন মনে হ'ল এই ধনুক তুলতে তাঁর একটুও জোর লাগেনি। আগেকার ছিলে খুলে নতুন ক'রে ছিলে পরিয়ে দিলেন ধনুকটায়।

ভীষ্ম আর দ্রোণকে সাম্‌নে দেখে তিনি মন্ত্র প'ড়ে ছুড়লেন একটা বাণ। সেই বাণ থেকে জল বেরিয়ে এসে ভীষ্ম-দ্রোণের পা-দু'খানা ধুইয়ে দিল। অর্জ্জুন তার পরের বাণে কর্‌লেন তাঁদের প্রণাম। দ্রোণ ভীষ্মকে বল্‌লেন,—"অর্জ্জুন ছাড়া এ বাণ আর ত কেউ জানে না। তবে কি অর্জ্জুন বেঁচে আছে?" আর কোন সোরগোল না করে তাঁরা অর্জ্জুনকে চিন্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন। ময়লা বেশে থাক্‌লেও অর্জ্জুনকে চেনা গেল। তখন তারা দুজনে মনে মনে অর্জ্জুনের মঙ্গল চাইলেন ভগবানের চরণে।

অর্জ্জুন জলের মধ্যে মাছের ছায়া দেখে রাধাচক্রের ভেতর দিয়ে বাণ চালিয়ে লক্ষ্যটা কেটে মাটীতে ফেলে দিলেন।

সভায় হ'ল নানারকম শব্দ। ব্রাহ্মণদের খুব আহ্লাদ, কিন্তু রাজারা গেলেন ভয়ানক চ'টে। তাঁরা থাক্‌তে কিনা লক্ষ্য ভেদ কর্‌ল এক ব্রাহ্মণ! দ্রৌপদী মালা নিয়ে এলেন অর্জ্জুনের কাছে। অর্জ্জুন কি জানি কি ভেবে দ্রৌপদীকে বারণ কর্‌লেন।

রাজারা আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না, "মার মার" শব্দে অর্জ্জুনকে ফেল্‌লেন ঘিরে। কর্ণ কিন্তু ব্রাহ্মণের তেজের ভয়ে এগুলেন না। রাজার বাণে ছেয়ে দিলেন অর্জ্জুনকে। ব্রাহ্মণদের অনেকে দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে এলেন অর্জ্জুনের সাহায্যে। একটা প্রকাণ্ড গাছ নিয়ে দাঁড়ালেন ভীম। তুমুল যুদ্ধ। ভীম আর অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজারা পেরে উঠ্‌ছেন না। সৈন্য সামন্তের মৃতদেহে রাজসভা ভরে গেল। যুদ্ধের গতিক দেখে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা সভা ছেড়ে চোঁচা দৌড় দিলেন। মারের চোটে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের—আর ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের বেশ ধর্‌লেন। প্রাণের ভয় ত আছে! যারা কিছু পাবার আশা ক'রে এসেছিল দ্রুপদের সভায়, তারা দোষ দিল অর্জ্জুনের, কারণ অর্জ্জুনের জন্যেই এই যুদ্ধ, তাই পেলনা তারা দান।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক চেষ্টায় যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। যুদ্ধ থেমে গেলে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে মায়ের কাছে চল্‌লেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে তাঁদের পিছু নিলেন। যুধিষ্ঠির দুয়োরের কাছে গিয়ে বল্‌লেন, "মা, দেখ আজ কি সুন্দর ভিক্ষা মিলেছে।"

মা কুন্তী না দেখেই উত্তর দিলেন, "যা পেয়েছ, পাঁচ জনে ভাগ করে নাও।"

কী মুস্কিল! এ ত ভাগের জিনিষ নয়! মা কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখে বড়ই বিব্রত হ'লেন।

একটু পরেই এলেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম। অনেক দিনের পর দেখা, সবাই আনন্দ পেলেন। নানা কথার পর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম চ'লে গেলেন দ্বারকায়।

সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, ভিক্ষাও করা হয়নি। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ভিক্ষা ক'রে কিছু নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী তাই রান্না ক'রে সবাইকে খাইয়ে নিজে খেলেন। পরে সকলে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে প'লেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সব দেখে বুঝলেন, তাঁর আদরের বোন্ দ্রৌপদী অপাত্রে পড়েনি।

দ্রুপদের মনে শান্তি নেই। স্নেহের দুলালী দ্রৌপদীর ভাবনায় তিনি মুসড়ে প'ড়েছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ফিরে এসে পিতাকে আশ্বাস দিলেন। কোন রকমে রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে সকাল হ'তে হ'তেই দ্রুপদ লোকজন আর নানা জিনিষ দিয়ে পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন কুমোরের বাড়ী, সকলকে আনতে। কুন্তীদেবী আর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে রথে চড়ে এলেন দ্রুপদের বাড়ি।

দ্রুপদ তাঁদের আদর কর্‌লেন খুব। পরিচয়ে যখন জান্‌লেন, পাঁচ ভাই পঞ্চ পাণ্ডব, তখন দ্রুপদ হ'লেন আনন্দে অধীর; কিন্তু পাঁচ ভায়েই দ্রৌপদীকে বিয়ে কর্‌বেন জেনে তাঁর হ'ল বিষাদ।

তিনি যুধিষ্ঠিরকে বল্‌লেন, "পাঁচজনে কর্‌বে একজনকে বিয়ে, এ কেমন কথা! জগতে যা কখনো ঘটেনি, তা হবে কেমন করে?"

যুধিষ্ঠির বল্‌লেন," "মার আদেশ বেদের কথা।"

দ্রুপদ ব্যাপারটা মিটোবার জন্যে বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিদের ডাকিয়ে আনলেন। বেদব্যাস এসে ব'ল্‌লেন, এ বিয়েতে কোন দোষ নেই। দ্রৌপদী আগেকার জন্মে তপস্যায় শিবকে তুষ্ট ক'রে পতি পাবার জন্যে পাঁচবার বর চান। শিব যখন পাঁচটী পতি হ'ক ব'লে বর দেন, তখন মেয়েটী পেল বড় দুঃখ। তা'তে শিব ব'লেছিলেন, এ ব্যাপারে কখনো তাঁর নিন্দে হবে না।

বেদব্যাসের বিধি; আর কোন বাধা থাকতে পারে না। দ্রৌপদীর বিয়ের জোগাড় হ'ল। জাঁকজমকে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিয়ে হ'য়ে গেল। আত্মীয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণেরা খালি যোগ দিলেন এই বিয়েতে। অসহায় পাণ্ডবেরা দ্রুপদের মত সহায় পেয়ে পাঞ্চাল রাজ্যে বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই বিয়ের খবর জানাবার জন্যে গেলেন হস্তিনায়। তিনি অতিথি হ'লেন বিদুরের। যখনি তিনি হস্তিনায় আস্‌তেন তখনি তিনি থাকৃতেন বিদুরের আশ্রমে। তিনি ছিলেন বিদুরের ভক্তিতে বাঁধা।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বিয়ের খবর বিদুরকে জানালেন। আনন্দে বিদুরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণ আর দেরি না ক'রে ফিরে গেলেন নিজের বাড়ীতে।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন, দ্রৌপদী কুরুবংশের বৌ হয়েছেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হ'য়েছে ভেবে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে এগিয়ে আন্‌বার জোগাড় কর্‌তে বল্‌লেন—কিন্তু যখন তিনি জান্‌লেন দ্রৌপদীর বিয়ে হ'য়েছে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে, তখন তিনি একেবারে গেলেন দমে।

দুর্যোধন হস্তিনা নগরে ফিরে এলেন। তাঁর সেনার বেশির ভাগ যুদ্ধে খোয়া গিয়েছে। যারা ফিরেছে তাদের সকলেরি হাত-পা ভাঙ্গা। রথ সব ভেঙ্গে চুরমার।

চারিদিকে র'টে গেল দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিয়ের কথা। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি আদর ক'রে পাণ্ডবদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ ক'রলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কর্ণ দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণ করার নতুন ফন্দী অাঁটতে লাগ্‌লেন কিন্তু দ্রোণের বকুনি খেয়ে তিনি থেমে গেলেন।

অনেক ভেবে চিন্তে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠিয়ে দিলেন পাণ্ডবদের আন্‌তে, আর ব'লে পাঠালেন তাঁদের দেওয়া হবে অর্দ্ধেক রাজ্য।

পাণ্ডবেরা এলেন হস্তিনায়। দ্রৌপদীর রূপ দেখে অন্তঃপুরের মেয়েরা খুব সুখ্যাতি কর্‌লেন।

যুধিষ্ঠির অর্দ্ধেক রাজ্য পেয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী ক'রে মা কুন্তী আর রাণী দ্রৌপদীর সঙ্গে ভাইদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে লাগ্‌লেন।

একদিন নারদ বীণা বাজিয়ে শ্রীহরির গুণ-গান কর্‌তে কর্‌তে এলেন পাণ্ডবদের দেখ্‌তে। পাছে দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবদের ভেতর ঝগড়া বাধে, এই ভয়ে তিনি নিয়ম ক'রে দিলেন, যখন এক ভাই দ্রৌপদীর কাছে থাক্‌বেন, তখন আর কোন ভাই সেখানে যেতে পারবেন না। যদি কেউ যান, তবে তাঁকে বার বছরের জন্যে রাজ্য ছেড়ে দূরে থাক্‌তে হবে।

এই নিয়মে কিছুদিন চল্‌ল। এক ব্রাহ্মণের একটা গোরু চুরি করে নিয়ে পালাল এক চোর। গোরু হারিয়ে ব্রাহ্মণের বড় দুঃখ হ'ল; তিনি এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে ঐ গোরু উদ্ধার ক'রে দেবার জন্যে বলতে। তাঁর দেখা হ'ল অর্জ্জুনের সঙ্গে। গোরু উদ্ধার করবার ইচ্ছে তাঁর হ'লেও উপায় নেই। অস্ত্র নেবেন কি ক'রে! তখন যুধিষ্ঠির অস্ত্রশালায় ব'সে দ্রৌপদীর সঙ্গে কথা কইছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ অস্থির হ'য়ে প'ল্লেন। অর্জ্জুন আর

ঠিক থাকতে পারলেন না। যা থাক্ ভাগ্যে ব'লে তিনি অস্ত্র শালায় ঢুকে পড়ে অস্ত্র নিয়ে গোরু উদ্ধার করতে গেলেন।

গোরু উদ্ধার হ'য়ে গেলে তিনি ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "দাদা, আমি নিয়ম রাখ্‌তে পারিনি, কাজেই আমায় রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে হবে বার বছরের জন্যে।"

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু সত্য রাখতেই হবে অর্জ্জুনের। তাই তিনি কোন মানা না মেনে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গ নিলেন। বার বছর তীর্থ করবেন ব'লে অর্জ্জুন হরিদ্বারে এসে পড়লেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিনি পুণ্য কাজ ক'রতে লাগলেন। একদিন অর্জ্জুন স্নানের জন্যে নাম্‌লেন গঙ্গায়। স্নানের পর যখন তিনি তর্পণ করছেন, পাতাল থেকে এক নাগকন্যা এসে পাতালে টেনে নিয়ে গেলেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুনের মনে কোন ভয় নেই। অর্জ্জুন দেখ্‌লেন, পাতালে জ্বলছে যজ্ঞের আগুন। তিনি সেই আগুনের সাম্‌নে তাঁর রোজকার কাজ সেরে নিলেন। তারপর ঐ নাগকন্যা চাইলেন অর্জ্জুনকে বিয়ে করতে। মেয়েটী নাগদের রাজা কৌরব্যের মেয়ে, নাম উলুপী। অর্জ্জুন তাঁকে বিয়ে ক'রে পরের দিন এলেন পাতাল থেকে উঠে।

অনেক তীর্থ ঘুরে অর্জ্জুন গেলেন মণিপুরে। এখানকার রাজা চিত্রভানুর মেয়ে চিত্রাঙ্গদাকে দেখে তাঁকে বিয়ে করবার ইচ্ছে হ'ল অর্জ্জুনের। চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করবার সময় অর্জ্জুনের পণ করতে হ'ল,—চিত্রঙ্গদার যে ছেলে হবে, তাকে মণিপুরে রাজা হ'তে দিতে হবে! চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে ক'রে দিন কয়েক সেখানে থেকে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদের নিয়ে চ'ললেন দক্ষিণ সাগরের দিকে।

দক্ষিণ সাগরের কাছে ছিল পাঁচটা তীর্থ। কুমীরের ভয়ে সেখানে

কেউ নামে না। অর্জ্জুনের আবার ভয় কি! তিনি সৌভদ্র তীর্থে নেমে প'লেন। জলে যেমন নামা অমনি তাঁকে ধ'রল একটা প্রকাণ্ড কুমীরে। অর্জ্জুন কুমীরটাকে টেনে তুলে ফেল্‌লেন ডাঙ্গায়। কি আশ্চর্য্য, কুমীরটা যে একটা রূপসী মেয়ের রূপ ধ'রল!

অর্জ্জুন মেয়েটীর কাছে শুন্‌লেন, সে এক অপ্সরা, নাম বর্গা। সে আর তার চার সখী মুনির শাপে কুমীর হ'য়ে পাঁচ তীর্থে আছে। যদি কেউ তাদের জল থেকে তুলতে পারেন, তবেই তারা পাবে মুক্তি। অর্জ্জুন বর্গার চারজন সখীকে ও শাপ মুক্ত করলেন।

অর্জ্জুন ফের মণিপুরে ফিরে এলে তাঁর এক ছেলে হ'ল চিত্রাঙ্গদার গর্ভে। তাঁর নাম রাখা হ'ল বভ্রুবাহন।

অর্জ্জুন মণিপুর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রভাসে। সেখানে তিনি দেখা পেলেন শ্রীকৃষ্ণের। অর্জ্জুন এসেছেন ব'লে শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক পর্ব্বতে এক উৎসবের জোগাড় করলেন। যদুবংশের মেয়ে পুরুষ সবাই এলেন্ অর্জ্জুনকে দেখতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বোন্ সুন্দরী সুভদ্রা। অর্জ্জুন তাঁর রূপ দেখে তাঁকে বিয়ে কর্‌তে চান। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা শুনে বড় সুখী হ'লেন। বসুদেব প্রভৃতি অর্জ্জুনের হাতে দিতে চাইলেন সুভদ্রাকে, কিন্তু বলরামের ইচ্ছে, সুভদ্রার বিয়ে হয় দুর্যোধনের সঙ্গে। বলরামের মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ, তিনি থাকৃলেন চুপি চুপি কাজ সারবার মতলবে।

সুভদ্রাকে বিয়ে করবার জন্যে দুর্যোধনের কাছে দূত পাঠান হ'ল, তাই দুর্যোধন লোক লস্কর নিয়ে চললেন দ্বারকায়।

সুভদ্রার অধিবাস। সুভদ্রা গেলেন স্নান করতে, সঙ্গে আছে শুধু তাঁর সখীর দল। শ্রীকৃষ্ণ নিজের রথখানা অর্জ্জুনকে দিয়ে ব'ললেন "বন্ধু, এই ফাঁকে তুমি সুভদ্রাকে রথে তুলে পালিয়ে যাও।"

শ্রীকৃষ্ণের কথামত কাজ হ'য়ে গেল। দ্বারকায় পৌছল যখন এই খবর, তখন প'ড়ে গেল সাজ সাজ রব। রাগে বলরামের চোখ লাল। সেনারা ছুটল অর্জ্জুনকে ধরতে। দারুক ছিলেন অর্জ্জুনের রথের সারথি। সারথিকে সরিয়ে দিয়ে সারথি হ'লেন নিজে সুভদ্রা, আর যাদব সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন একা অর্জ্জুন। সেনারা সব অর্জ্জুনের হাতে মার খেয়ে হার মানল, শ্রীকৃষ্ণ অনেক বুঝিয়ে বলরামকে করলেন শান্ত।

অর্জ্জুনের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল সুভদ্রার, তাতে আর এক দফা লজ্জা পেলেন দুর্যোধন।

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন ব'সে আমোদ ক'রছেন, এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির তাঁদের সামনে। ব্রাহ্মণের চুল, দাড়ি সব রাঙা, তাঁর গায়ের রঙ সোণার মত, আর পরনে লাল টুকটুকে কাপড়। তিনি তাঁদের কাছে তাঁর খিদের কথা জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিতে চাইলেন খাবার। তিনি ব'ললেন "আমি চাইনে লুচি, পুরি, মোণ্ডা, মেঠাই, আমি চাই খাণ্ডব বনটা খেতে। আমার বড় অসুখ, ঐ বনটা না খেলে আমার অসুখ সারবে না। তাঁরা তাঁর পরিচয়ে জানলেন তিনি অগ্নিদেব।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন অগ্নির মুখে শুনলেন, অনেক কাল আগে শ্বেতকি নামে ছিলেন এক রাজা। তিনি সব সময়ে যজ্ঞ ক'রতে ভাল বাসতেন। যজ্ঞ ক'রে ক'রে আগুনের ধোঁয়ায় পুরোহিতদের চোখ গেল ঝাপ্‌সা হ'য়ে, আর গায়ের লোমগুলো গেল পুড়ে আগুনের ঝাঁজে। তাঁরা জবাব দিয়ে স'রে প'লেন।

শ্বেতকি সুরু করলেন শিবের তপস্যা। শিব তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। শ্বেতকি শিবকে হ'তে বললেন যজ্ঞের পুরোহিত। শিব নিজে যজ্ঞের ভার না নিয়ে, যজ্ঞের ভার দিলেন দুর্ব্বাসাকে।

বার০ বছর ধরে যজ্ঞ চ'লল। ঐ যজ্ঞে ঘি খেয়ে খেয়ে হ'ল

অগ্নিদেবের বিষম অসুখ, তাঁর হজম শক্তি গেল একেবারে কমে। তিনি ছুট্লেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা তাঁকে খাণ্ডব বনের পশুদের মাংস খেয়ে অসুখ সারাতে ব'ললেন। ঐ বনে থাকত ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক। অগ্নি যেমন পোড়াতে গেলেন খাণ্ডব বন, বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে ইন্দ্র জল ঢেলে সব আগুন নিবিয়ে দিলেন। অগ্নি বনও পোড়াতে পারেন না, অসুখও তাঁর সারে না। ফের অগ্নি গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা ব'ললেন, "তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন পৃথিবীতে এলে তুমি তাঁদের সাহায্য নিও।" তাই অগ্নি এলেন তাঁদের সাহায্য চাইতে।

অর্জ্জুন অগ্নিকে জানালেন, তাঁদের ভাল অস্ত্র বা রথ নেই, কেমন ক'রে তাঁরা যুঝবেন ইন্দ্রের সঙ্গে।

অগ্নিদেব তখুনি ডাকলেন বরুণকে। বরুণ এসে অর্জ্জুনকে দিলেন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ আর কপিধ্বজ রথ, শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন কৌমদকী গদা।

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন খাণ্ডব বনের দুদিকে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে অগ্নিকে খাণ্ডব বন খেতে বললেন। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল। বনের যত পশু সব এসে পড়্তে লাগল আগুনে। আগুনের ধোঁয়া পাহাড়ের মত হ'য়ে ঠেকলো আকাশে। এই ব্যাপার জেনে ইন্দ্র হুকুম দিলেন মেঘের দলকে জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে দিতে। অর্জ্জুনের বাণে মেঘ গেল উড়ে। তখন বাধল তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্রের লড়াই। ইন্দ্র ছুড়ে দিলেন তাঁর বজ্র। বজ্র অর্জ্জুনের কাছে ঘেঁসতে না পেরে ফিরে গেল ইন্দ্রের হাতে। তুমুল যুদ্ধে দেবতারা হেরে গেলেন। তখন দৈববাণী হ'ল "দেবরাজ আপনার বন্ধু তক্ষকের জন্যে ভাবনা নেই, সে এখন কুরুক্ষেত্রে। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কিছুই ফল হবেনা, কারণ তাঁদের কেউ পারবে না হারাতে।" এই কথায় ইন্দ্র যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন।

ময় নামে এক দৈত্য তক্ষকের বাড়ী থেকে পালাচ্ছিল। অর্জ্জুন তাঁকে ধ'রে ফেললেন ; কিন্তু সে অর্জ্জুনের দয়া চেয়ে প্রাণে বেঁচে গেল। খাণ্ডব বনের পশুদের চর্ব্বি খেয়ে সুস্থ হ'য়ে অগ্নি অর্জ্জুনের ওপর তুষ্ট হ'লেন। খাণ্ডব বন থেকে বাঁচল অশ্বসেন, ময় আর মাত্র চারটী বকের ছানা।

বার বছর কেটে গেলে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ফিরলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

শ্রীকৃষ্ণও অনেক উপহার নিয়ে বলরামের সঙ্গে এলেন পাণ্ডবদের কাছে।

# সভাপর্ব্ব

—:০:—

ময় দানব শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র থেকে বেঁচে যাওয়ায় পাণ্ডবদের কিছু ভাল কাজ ক'রে দিতে চাইলেন। অর্জ্জুন নিজে কিছু না ব'লে ময়কে জিজ্ঞাসা করতে ব'ললেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর একটা সভা তৈরি ক'রে দিতে ব'ললেন ময়কে।

ময় চ'লে গেল কৈলাসের উত্তর দিকে বিন্দু সরোবরে। সেখান থেকে সে নিয়ে এল রাশ রাশ মণি, রত্ন, একটা প্রকাণ্ড গদা আর দেবদত্ত শাঁখ। ময় গদাটা দিলেন ভীমকে আর শাঁখটা দিল অর্জ্জুনকে। ময় সেই সব মণি রত্ন দিয়ে এমন এক অপরূপ সভা তৈরি করল, যা দেখে পাণ্ডবেরা হ'লেন অবাক্।

কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে কাটিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চ'লে গেলেন দ্বারকায়।

পরে একদিন নারদ এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। পাঁচ ভাই মিলে সুবাসিত জলে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে তাঁকে দিলেন সোনার আসন। নারদ যুধিষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিয়ে ব'ললেন, "মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে হ'য়েছিল আমার দেখা। তিনি তোমায় রাজসূয় যজ্ঞ করতে ব'লেছেন।"

নারদ বিদায় নিলে এক দূত গিয়ে নিয়ে এল শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পরামর্শ আরম্ভ হ'ল রাজসূয় সম্বন্ধে। শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন "রাজসূয় যজ্ঞ ক'রতে হ'লে চাই একলাখ রাজার মিলন। মগধের রাজা জরাসন্ধের শক্তি মেনে নিয়ে অনেক রাজা হ'য়ে আছে তাঁর অধীন, আর যারা তাঁকে মান্‌তে পারেনি, তিনি তাঁদের রেখেছেন বন্দিশালায় বন্দি ক'রে বলি দেবার জন্যে। জরাসন্ধকে না মারতে পারলে রাজসূয় শেষ করা হবে কঠিন!"

জরাসন্ধের জন্মের কথা বড় অদ্ভুত। মগধের রাজা বৃহদ্রথ যাগ যজ্ঞ ক'রে কাল কাটাতেন। এত ভাল কাজ ক'রেও তাঁর কোন ছেলে হ'ল না, তাই তিনি তাঁর দুই রাণীকে নিয়ে বনে চ'লে যান। সেখানে তিনি দেখা পান গৌতমের ছেলে চণ্ডকৌশিক ঋষির। রাজার মনের কথা জেনে চণ্ডকৌশিক ধ্যানে ব'স্‌লেন। তাঁর সাম্‌নে প'ল গাছ থেকে একটা পাকা টুসটুসে আম। ঋষি সেই আমটা রাণীদের খেতে দিলেন।

রাণীরা দুজনে আমটা ভাগ ক'রে খেয়ে ফেললেন। কালে তাঁদের হ'ল ছেলে। একি, প্রত্যেক রাণীর গর্ভে হ'ল যে আধখান ক'রে ছেলে! আর কি হবে। রাণীরা লোক দিয়ে দেহ দুখানা ফেলিয়ে দিলেন শ্মশানে।

ঐ শ্মশানে থাকৃত জরা নামে এক রাক্ষসী। সে মাংসের লোভে শ্মশানে এসে দুখানা দেহ দেখে সে দুখানা দেহ জোড়া দিলে কেমন দেখায়, দেখ্‌বার জন্যে যেমন জোড়া দিয়েছে, অমনি ছেলেটা কেঁদে উঠ্‌ল উঞা উঞা করে। এতটুকু মাংসে ত তার জালার মত পেট ত ভরবেনা, তাই সে নারীর রূপ ধরে ছেলেটাকে দিয়ে এল রাজাকে। ছেলে পেয়ে রাজা ভারি খুশি হ'য়ে তার পরিচয় চাইলেন।

জরা বল্‌লে, "আমাকে যে আদর করে সে হয় ধনে পুত্রে লক্ষীশ্বর। আপনার বাড়িতে আমার আদর আছে ব'লে আমি আপনার ছেলে ফিরিয়ে দিলাম।"

জরা ছেলের দেহ জোড়া দিয়েছিল ব'লে রাজা ছেলের নাম রাখলেন জরাসন্ধ।

জরাসন্ধ দিন দিন খুব বেড়ে উঠলেন। ক্রমে তাঁর জোর এত বেশী হ'ল যে, তাঁর ভয়ে অনেক রাজা তাঁর বশে এসে তাঁকে নানা খারাপ কাজে উৎসাহ দিতে লাগল।

জরাসন্ধের দুই মেয়ে ছিল অস্তি আর প্রাপ্তি। কংস বিয়ে ক'রেছিলেন

অস্তি আর প্রাপ্তিকে। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা। কংস বড় দুষ্ট রাজা ছিলেন ব'লে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে মেরে ফেলেন।

জামাই কংসের মরণের খবর পেয়ে জরাসন্ধ এলেন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়্তে। একবার নয়, দুবার নয়, জরাসন্ধ মথুরায় হানা দিলেন আঠার বার। শ্রীকৃষ্ণ দায়ে প'ড়ে মথুরা ছেড়ে রাজধানী করলেন দ্বারকায়।

ভয়ানক জায়গায় ছিল জরাসন্ধের রাজধানী। পাঁচটা পাহাড়ের মাঝখানে গিরিব্রজ পুরীতে থাকতেন জরাসন্ধ। কোন শত্রু সহজে সেখানে ঢুকতে পারত না। পাহাড়ে ছিল একটা মজার দুয়োর। কোন শত্রু রাজ্যে এলেই ঐ দুয়োর বন্ধ হ'য়ে যেত আর একটা ঢাক বেজে উঠত আপনা থেকেই। সেই ঢাকের শব্দে সৈন্যরা যুদ্ধের সাজে সাজত যুদ্ধের জন্যে! দুটো সাপ আর পাহাড় গর্জ্জে উঠত রাগে। কাজে কাজেই এহেন জরাসন্ধকে জয় করা সহজ ব্যাপার নয়।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনে ভীম আর অর্জ্জুন চাইলেন জরাসন্ধকে জয় করতে।

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম আর অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের সাজে জরাসন্ধের রাজধানীতে হাজির হ'লেন। অর্জ্জুন শব্দভেদী বাণে ঢাকের শব্দ দিলেন বন্ধ ক'রে, আর ভীম চৈত্য নামে পাহাড়ের মাথায় চ'ড়ে সেই পাহাড়ের মাথাটা উপড়ে ফেলে পাহাড়ের গর্জ্জন দিলেন থামিয়ে। তারপর তাঁরা গিয়ে ঢুকলেন জরাসন্ধের বাড়ীর ভেতর। ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্তঃপুরে ঢোকার কোন বাধা নেই।

জরাসন্ধ যজ্ঞ ক'রছিলেন যেখানে, সেখানে তাঁরা গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ব্রাহ্মণ দেখে জরাসন্ধ আদর ক'রে তাঁদের আসন দিলেন। কিন্তু তাঁদের গায়ে অস্ত্রের দাগ দেখে তাঁর মনে জাগল সন্দেহ।

তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন,—তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ভীম, আর অর্জ্জুন। তাঁরা চান যুদ্ধ জরাসন্ধের সঙ্গে।

জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নারাজ, অর্জ্জুন ছেলেমানুষ ব'লে তাঁকেও তাঁর পছন্দ হ'লনা যোদ্ধা হিসাবে, কিন্তু ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে তাঁর আপত্তি হ'লনা একটুও।

জরাসন্ধ দুটো মস্ত গদা এনে একটা দিলেন ভীমকে আর একটা নিলেন তিনি নিজে।

তাঁদের দুজনে তুমুল লড়াই। গদায় গদায় ঠোকা ঠুকি লেগে বেরুতে লাগলো আগুন। গদাযুদ্ধ থামিয়ে তাঁরা হাতাহাতি লড়াই স্বরু ক'রে দিলেন। যুদ্ধ চ'লল চোদ্দদিন ধ'রে। এতদিন ধরে না থাকল তাঁদের খাওয়া, না খেলেন তারা একটু জল। জরাসন্ধ আর দাঁড়াতে পারেন না। ভীমের গায়ে তখনও আছে, অনেক জোর। ভীম জরাসন্ধকে মাটীতে ফেলে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর উঠে ব'সে ঘুঁসির পর ঘুঁসি মারতে লাগলেন। জরাসন্ধ মরেন না; ভীম পড়লেন ভীষণ ফাঁপরে। শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধকে চিরে দুখান ক'রে ফেলতে ইসারায় জানিয়ে দিলেন ভীমকে। ভীম এক পায়ে জরাসন্ধের একটা পা চেপে আর একটা পা দুহাত দিয়ে ধ'রে টাণ দিয়ে দুখান ক'রে ফেললেন।

জরাসন্ধের ছেলে সহদেব তাঁদের বড় ব'লে মেনে নিলেন। তাঁরা বন্দিশালা খুলে রাজাদের দিলেন মুক্ত ক'রে আর তাঁরা হ'লেন তখন তাঁদের বন্ধু।

শ্রীকৃষ্ণ এই রাজাদের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিতে ব'লে ফিরে গেলেন দ্বারকায়।

এবার প'ল পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়ের পালা! যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব এক একটা দিক্ জয় ক'রতে বেরিয়ে প'লেন।

অর্জ্জুন কুলিন্দ, কালকূট, আনর্ত প্রভৃতি দেশ জয় করে এলেন ভগদত্তের রাজ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষে। ভগদত্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে অর্জ্জুনের যুদ্ধে হেরে তাঁর সঙ্গে করলেন মিতালি। অর্জ্জুন আরো অনেক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে মণি, মাণিক্য, সোনা দানা নিয়ে বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে ফিরে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

ভীম পুলিন্দ প্রভৃতি রাজ্য জয় ক'রে উপস্থিত হলেন শিশুপালের রাজ্যে। শিশুপাল আদর ক'রে ভীমকে বন্ধু ব'লে মেনে নিলেন আর দিলেন তাঁকে অনেক ধন রত্ন। ভীম আরো অনেক রাজাকে বন্ধু ক'রে রাজধানীতে ফিরলেন।

নকুল বহুদেশ জয় ক'রে এসে নানা অর্থে ই প্রস্থের ভাণ্ডার ভরিয়ে দিলেন।

সহদেব ও শূরসেন, মৎস্য প্রভৃতি জয় ক'রে এলেন কিষ্কিন্ধ্যায়। এখানে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হ'ল বানরদের রাজা মেন্দ আর দ্বিবিদের সঙ্গে। তাঁরা সহদেবের কাছে হার মেনে যজ্ঞের সাহায্যে দিলেন অনেক টাকা কড়ি। সহদেব ফিরে এলেন নিজেদের রাজধানীতে।

শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে চ'ড়ে পাঞ্চজন্য শাঁখ বাজিয়ে এলেন পাণ্ডবদের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ এয়েছেন, আর ভাবনা কি! খুব তোড়জোড় ক'রে যজ্ঞের আয়োজন চ'লল। ধৌম্য আর শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে খুব উৎসাহ দিলেন।

এই যজ্ঞে দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের নিমন্ত্রণের ভার দিলেন অর্জ্জুনকে, আর ব'লে দিলেন, তিনি যেন লঙ্কায় গিয়ে বিভীষণের নিমন্ত্রণটা ও সেরে আসেন। অন্য দূতেরা গেল রাজাদের আহ্বান করতে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিকে ডাকতে গেলেন নকুল।

রাজারা থাকবেন ব'লে বড় বড় বাড়ী তৈরি হ'ল পথ, ঘাট সব ভাল

ক'রে পরিস্কার করান হ'ল। পথের দুধারে পোঁতা হ'ল ভাল ভাল ফুলের গাছ। লাল, নীল, সবুজ, হলুদে, বেগুনে রঙের নিশানে রাজধানী ছেয়ে গেল। এতে যেন রাজধানী পেল নতুন প্রাণ।

রাজারা হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, রথ, ধন, রত্ন নিয়ে আসতে লাগলেন। যজ্ঞের খবর পেয়ে ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ এলেন মা হিড়িম্বাকে নিয়ে। তিন লক্ষ রাক্ষস এল তার সঙ্গে।

দুর্যোধন প্রভৃতি এসে পৌছুলে, তাঁরা এক একটা কাজের ভার পেলেন।

যজ্ঞ হবে ময় দানবের তৈরি অপরূপ সভায়। যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যের আজ্ঞায় যজ্ঞ স্বরু ক'রে দিলেন। পেল হ'লেন যজ্ঞের হোতা। নানা লোকে নগর ভ'রে গেল। দেবতারা এসে আকাশে অপেক্ষা ক'রে রইলেন।

অর্জ্জুনের নিমন্ত্রণ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার আশায় ভক্ত বিভীষণ না এসে থাকতে পারলেন না। বিভীষণ লোক জন, জাঁকজমক দেখে ত একেবারে অবাক্। বিভীষণ দেখ্‌লেন হাতী, ঘোড়া নিয়ে বড় বড় রাজা দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন সভায় ঢোকার জন্যে। নদীতে এত নৌকা র'য়েছে যে, নদীর জলও যাচ্ছে না দেখা। মানুষ, পিশাচ, রাক্ষস সব এক জায়গায় মেশামিশি হ'য়ে গিয়েছে। বিভীষণ মানুষ প্রভৃতির চাপে আর এগুতে পারেন না। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এক জায়গায়।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিভীষণকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে এলেন। বিভীষণ প্রাণ ভ'রে শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন ক'রে নিলেন। তাঁর আশা ত মিটেছে, আর সেখানে থাকবার দরকার কি তাঁর! শ্রীকৃষ্ণ ছাড়েন না বিভীষণকে। বিভীষণ ব'ললেন, "ঠাকুর তুমিই ত জগতের প্রভু! তোমার চরণ ছাড়া আর কোথাও ত মাথা নীচু ক'রব না আমি।" তবুও তাঁর যেতে হ'ল শ্রীকৃষ্ণের পিছু পিছু।

শ্রীকৃষ্ণ বিভীষণকে নিয়ে উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম দুয়োরে ঘুরলেন কিন্তু কোন দুয়োরেই ঢুকতে পারলেন না তিনি। দুয়োরের ভার ছিল যাদের ওপর, তারা ব'লল শ্রীকৃষ্ণকে, "দেখছেন না, কত বড় বড় রাজা কত দিন ধ'রে র'য়েছেন এখানে। রাজার হুকুম না পেলে কারুকে ঢুকতে দিতে পারি নে আমরা। আপনারা অপেক্ষা করুন। রাজার হুকুম হলেই ঢুকতে পাবেন।" একি, শ্রীকৃষ্ণেরা সভায় ঢুকতে রাজার হুকুম চাই! বিভীষণ ত চুপ।

হেঁটে হেঁটে বল হারিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আর বিভীষণ ব'সলেন একটা গাছের নীচে।

নকুল এসে শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন, "আপনি সভায় না গেলে দেবতারা রাজদর্শন করতে পারছেন না।"

শ্রীকৃষ্ণ উঠ্‌লেন, বিভীষণের হাত ধ'রে গেলেন সভার ভেতর। খুব উঁচু বেদীর ওপর সিংহাসনে ব'সে আছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির। ঐ বেদীতে উঠ্‌তে হ'লে পার হ'তে হয় একশটা শিঁড়ি। সবাইত দেখাবে যুধিষ্ঠিরকে সম্মান কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া 'আর কারুকে ত প্রণাম করবেন না বিভীষণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চাশটা শিঁড়ি পার হ'য়ে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে পিঠ দিয়ে। তারপর তিনি ধ'রলেন বিশ্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের ঐ মূর্ত্তি দেখে দেবতারা আর বিভীষণ ক'রলেন মাথা নীচু। তখন শ্রীকৃষ্ণ আসল রূপ ধ'রে যুধিষ্ঠিরকে ব'ললেন, "ঐ দেখুন আপনার কাছে অবনত।"

যুধিষ্ঠীর আর কথা ব'লতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ না থাকলে তাঁর মান এত বাড়ত কি ক'রে। যুধিষ্ঠিরের চোখ দিয়ে গড়িয়ে প'ল আনন্দের অশ্রু। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, "ভাই কৃষ্ণ, আমায় এমন বর দাও, যাতে চিরকাল তোমার চরণ সেবা করতে পারি।"

অন্য রাজাদের ভেতরে আসবার জন্যে আদেশ দিতে অনুরোধ ক'রলেন যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ।

দরজা সব খুলে দেওয়া হ'ল। রাজারা পিল পিল ক'রে এসে ঢুকলেন, যজ্ঞ সভায়। তারা হাঁ ক'রে দেখতে লাগলেন ঐ সভার শোভা।

যথা সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হ'য়ে গেল। যজ্ঞের কাজের যা কিছু বাকি ছিল, সব সারা ক'রে ফেলা হ'ল। রাজারা যুধিষ্ঠিরের সকল ব্যাপারেই আনন্দ পেলেন খুব।

যজ্ঞ শেষ হ'য়ে গেলে কাকে অর্ঘ দেওয়া যায়, তাই নিয়ে আলোচনা সুরু হ'ল। যিনি সবার বড়, তাঁকে দিতে হবে অর্ঘ। রাজারা মুখ চাওয়া চায়ি করছেন, ভীষ্মদেব ব'ললেন, "আমার মতে শ্রীকৃষ্ণই সব বিষয়ে বড়, তাঁকেই অর্ঘ দেওয়া উচিত আমাদের।"

ভীষ্মদেবের কথায় সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ দিলেন। এই না দেখে শিশুপাল ত রেগে আগুন। বসুদেব, শল্য, ভীষ্ম, দুর্যোধন, কর্ণ আর তাঁকে বাদ দিয়ে অর্ঘ দেওয়া হ'ল কিনা শ্রীকৃষ্ণকে! তিনি আর সইতে পারলেন না, তাই তিনি জানতে চাইলেন, কোন গুণে শ্রীকৃষ্ণ সকলের বড়। শিশুপালের মনে হ'ল, শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ দেওয়ার মানে সকল রাজার অপমান। শিশুপাল চ'লে যেতে চান রাজসূয় যজ্ঞ থেকে। যুধিষ্ঠির অনেক বিনয় ক'রে শিশুপালকে থামিয়ে ব'ললেন, "শ্রীকৃষ্ণ মহাশক্তিমান্, তাই তাঁকে দেওয়া হ'ল অর্ঘ। সমস্ত রাজা যা মেনে নিলেন, আপনি একলা শুধু আপত্তি ক'রছেন কেন?"

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই হ'য়েও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের চিরকালের শত্রু। তার কারণ কি?

শিশুপাল ছিলেন চেদিরাজ দমঘোষের ছেলে। জন্মের সময় শিশুপালের ছিল চারটী হাত আর তিনটী চোখ। শিশুপালের চেহারা দেখে, আর তিনি জন্মাবার সময় গাধার মত চেঁচিয়ে ওঠেন ব'লে

তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হ'লেন! দৈববাণী হ'ল "যাঁর কোলে উঠ্‌লে এই শিশুর দুটী হাত আর একটা চোখ খ'সে যাবে তাঁর হাতে হবে এঁর মরণ।"

দমঘোষ নানা দেশের রাজাদের ডেকে এনে এক এক জনের কোলে দিতে লাগ্‌লেন শিশুকে। শ্রীকৃষ্ণের কোলে শিশুকে দিতেই তাঁর দু' হাত আর একটা চোখ খ'সে প'ল মাটীতে। সকলে বুঝলেন শ্রীকৃষ্ণের হাতেই হবে শিশুপালের মৃত্যু।

শিশুপালের মা অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন তিনি যেন শিশুর কোন ক্ষতি না করেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি একশ'র বেশী অপরাধ ক্ষমা করব না।"

শ্রীকৃষ্ণের হাতে কোন ক্ষতির ভয় নেই, কাজেই মনের সাধে শিশুপাল জীবনভোর অপকার ক'রেছেন শ্রীকৃষ্ণের। আজও সেই সাহসে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগ্‌লেন। রাজাদের অনেকে শিশুপালের পক্ষ নিলেন, শিশুপাল আরো উৎসাহে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কর্‌লেন।

এই রকমে পূর্ণ হ'ল শিশুপালের একশ' অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণ আর ক্ষমা ক'রতে পারেন না। তিনি মনে মনে ডাক্‌লেন সুদর্শন চক্রকে। আগুনের হল্‌কা ছুটিয়ে সুদর্শন এসে পৌছুল শ্রীকৃষ্ণের হাতে। শ্রীকৃষ্ণ সেই চক্র শিশুপালের দিকে ছেড়ে দিলেন। চক্র শিশুপালের মাথাটা কেটে ফিরে এল শ্রীকৃষ্ণের কাছে, আর শ্রীকৃষ্ণের পায়ে মিশে গেল শিশুপালের গায়ের তেজ।

শিশুপাল বধের সঙ্গে সঙ্গেই রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হ'য়ে গেল। রাজারা নিজের নিজের দেশে ফিরলেন। সকলের মুখেই শোনা গেল রাজসূয় যজ্ঞের জাঁকের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ দেশে যাবার জন্যে বিদায় চান। যুধিষ্ঠিরের মন চায়না শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিতে। শেষে যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিদায় নিলেন।

দুর্যোধন মামা শকুনির সঙ্গে আরো কিছুদিন রইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

মামার সঙ্গে দুর্যোধন সভার শোভা দেখে বেড়াচ্ছেন। যেখানেই যান, সেখানেই দেখেন অপরূপ শ্রী। এক একখানা ঘর যেন হস্তিনাপুরের সমস্ত রাজ বাড়ীটার মত। ঘরের মেঝে, থাম, দেওয়াল সব স্ফটিক দিয়ে তৈরি। ময় দানব স্ফটিকের এমন বেদী গেঁথেছেন যা দেখ্‌লে ঠিক জল বলে মনে হয়। দুর্যোধন সেখানে যাবার সময় জল ভেবে হাঁটুর ওপর কাপড় তুললেন। এমন পুকুর তৈরি হয়েছে, যা পুকুর ব'লে মনেই হয় না। দুর্যোধন ওখান দিয়ে যাবার সময় একেবারে জলের মধ্যে প'ড়ে নাকালের এক শেষ। এই দেখে পাণ্ডবেরা হো হো ক'রে উঠ্‌লেন হেসে। দুর্যোধনের মহা রাগ। রাগের চোটে দরজা ভেবে সেখান দিয়ে যেমন বেরিয়ে যাবেন, অমনি স্ফটিকের দেওয়ালে দুর্যোধনের মাথাটা গেল ঠুকে। আবার উঠ্‌ল হাসির রোল। দুর্যোধন দরজা খুঁজে পান না, নকুল এসে আসল দরজাটা দেখিয়ে দিলেন তাঁকে।

হস্তিনাপুরে আসবার পথে দুর্যোধনের মুখে নেই কথা, লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে আছেন। ভাগ্নের অবস্থা দেখে শকুনি ব্যাপার কি জানতে চাইলেন দুর্যোধনের কাছে।

দুর্যোধন ব'ললেন, "মামা, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নেই একটুও। কি ঐশ্বর্য্যই ভোগ ক'রছে যুধিষ্ঠির, আর আমরা যেন তার কাছে কত গরীব, কত ছোট।"

শকুনি মনের ভাব চেপে রেখে। দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে ব'ললেন, "বাপু যুধিষ্ঠির বড় ভাল লোক। সে নিজের গুণে পেয়েছে ধন, জন, ঐশ্বর্য্য। চেষ্টা কর' তুমিও অমন হ'তে পারবে।"

এত সহজে ভুলবার পাত্র নন্ দুর্যোধন। তিনি ব'ললেন "যত দিন না তিনি পাণ্ডবদের ছোট ক'রে দিতে পারেন, ততদিন তাঁর প্রাণে শান্তি কোথায় ?"

শকুনি তখন নিজের মনের কথা খুলে ব'ললেন, "বাবা! যুদ্ধ করে, তাদের হারাণ বড় কঠিন। অনেক চেষ্টা ত করলে, কিন্তু কি করতে পারলে তুমি তাদের? আমি এমন বিদ্যা জানি, যাতে তাদের নিশ্চয় জয় করতে পারবে।"

দুর্যোধন আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। তিনি জানতে চাইলেন তাঁর বিদ্যার কথা। শকুনি বললেন, "আমি খুব ভাল পাশাখেলা জানি। যুধিষ্ঠির মোটেই জানে না পাশা খেলতে। যদি তুমি কোন রকম ক'রে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় রাজি করাতে পার; তবে তার সব কিছু জিতে নিতে পারি। আমার শুধু ভয় তোমার পিতাকে, তিনি হয়ত এতে মত দিবেন না।"

এই পাশা খেলার কথা দুর্যোধনের মন দিল তোলপাড় ক'রে। তিনি হস্তিনায় এসেই চ'লল্বেন তাঁর পিতার কাছে।

ধৃতরাষ্ট্র ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে মঙ্গল জানাতে চাইলেন দুর্যোধনের।

দুর্যোধন ব'ললেন, "আর মঙ্গল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ধূম যা দেখে এলাম, তা আর আপনাকে কি বলব! পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্যই বা কত! তারা আমায় এত অপমান করেছে, যে আমার বাঁচবার সাধ নেই।"

ধৃতরাষ্ট্র ব'ললেন, "বাছা, হিংসা করা পাপ। তারা তাদের কপালে করছে ঐশ্বর্য্য ভোগ। বলত, আমিও রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করি, তা হ'লে তুমিও পাবে অনেক ধন, দৌলত। যুধিষ্ঠিরত আমাদের পর নয়, আর সে ছেলেও খুব ভাল। তুমি তার ওপর হিংসা কর না কখনো।"

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। পিতার কথায় দুর্যোধনের মনে শান্তি এল না। তিনি ব'ললেন, "বাবা, সত্যই যদি আপনি আমার মঙ্গল চান, তবে অনুমতি দিন, পাশাখেলায় আমি পাণ্ডবদের সব জিতে নি। পাণ্ডবদের ওপর আপনার বেশী ভালবাসা থাকে ত আপনি তাদের নিয়েই থাকুন, আমি চ'লে যাই যে দিকে দুচোখ যায়—"

ছেলের অভিমান দেখে ধৃতরাষ্ট্র বাধ্য হ'য়ে দিলেন পাশা খেলায় অনুমতি। বিদুর এই খবর জানতে পেরে পাশাখেলা বন্ধ করতে অনেক চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু তা পারলেন না। তখন তিনি বুঝলেন, কৌরব বংশ ধ্বংস হতে আর দেরি নেই।

পাশাখেলার জন্যে তৈরি হ'ল ভাল এক সভা। ধৃতরাষ্ট্র পাশা খেলায় যোগ দেবার জন্যে যুধিষ্ঠিরকে ডাকৃতে বিদুরকে পাঠালেন ইন্দ্রপ্রস্থে। বিদুরের যাবার ইচ্ছা নেই, তবু রাজার হুকুম তিনি মাথা পেতে নিলেন।

বিদুরের কাছে সব জেনে যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় আসবেন কিনা, ভাবতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ডাক, অমান্য করা যায় না, তাই ইচ্ছা না থাকলেও মা কুন্তী, স্ত্রী দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে চ'লে এলেন হস্তিনায়। আমোদ আহ্লাদে তাঁরা রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

পরের দিন সকাল বেলায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আর আর সবাই এসে ব'সলেন সভায়। ধৃতরাষ্ট্র আছেন সিংহাসনে আর দুর্যোধনকে ঘিরে বসে আছেন কর্ণ প্রভৃতি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল। যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে ব'সলেন পাশাখেলার জায়গায়।

শকুনি পাশা নিয়ে আসতেই যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "পাশা খেলা যত অনিষ্টের মূল। আমি এ খেলা ক'রতে চাইনে।"

শকুনি ব'ললেন, "তুমি পাশা খেলবে ব'লে এত জোগাড় হ'ল, আর এখন তুমি কিনা ব'লছ পাশা খেলার ইচ্ছা নাই তোমার? না খেলতে চাও, বাড়ি ফিরে যাও। এই রকমই তোমার কথার ঠিক বটে।"

শকুনির বিদ্রূপ শেলের মত বিঁধ্‌ল যুধিষ্ঠিরের বুকে। যখন এয়েছেন, তখন তিনি খেলবেনই,—এই মনে করে শকুনিকে ব'ললেন, "কে খেলবেন আমার সঙ্গে?"

দুর্যোধন উত্তর দিলেন, "আমার হ'য়ে খেলবেন মামা শকুনি, আর আমি দেব পণের টাকা।"

খেলা সুরু হ'ল। যুধিষ্ঠির পণ রাখলেন তাঁর নিজের গলার মণির হার, শকুনি একবারেই তা জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির পণ রাখ্লেন তাঁর ভাণ্ডারের সব ধন রত্ন, তাও হারাতে হ'ল তাঁর শকুনির কাছে। ক্রমে শকুনির খেলার কৌশলে হাতী, ঘোড়া, ঘর, বাড়ি, রাজ্য পর্য্যন্ত খোয়ালেন তিনি। তখন যুধিষ্ঠিরের খেলার রোখ চেপে গিয়েছে। তিনি নিজেকে রাখলেন পণ। সেবারেও তাঁর হার হ'ল। ভাইদের পণ রেখেও তিনি জিততে পারলেন না শকুনির কাছে। সব হারিয়ে যুধিষ্ঠির চুপটী ক'রে ব'সে রইলেন।

শকুনি ব'ললেন, "এবার কি পণ রাখবে?"

যুধিষ্ঠির ব'ল্লেন, "আমার আর ত কিছু নেই, সবই ত হেরেছি আপনার কাছে।"

শকুনি হাস্তে হাস্তে ব'ললেন "কেন তোমার দ্রৌপদী র'য়েছে, তাকেই পণ রেখে খেল না এবার।"

যুধিষ্ঠিরের মাথা বিগড়ে দিল এই সর্ব্বনেশে পাশা। তিনি পণ রাখলেন দ্রৌপদীকে, তাও জিতে নিলেন শকুনি।

সভার চেহারা যেন কেমন হ'য়ে গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কেঁদে ফেললেন, বিদুর মাথা হেঁট ক'রে রইলেন ব'সে। জ্ঞানী যাঁরা ছিলেন, তারা দুঃখে একেবারে স্তব্ধ।

মনের পাপ আর গোপন করা চ'লল না। দুর্যোধন আর তাঁর ভায়েরা হেসে গড়িয়ে প'লেন। কর্ণ আনন্দে দুর্যোধনকে ব'ললেন, "কেমন বাপু, এবার তোমার অপমানের শোধ নেওয়া হয়েছে ত? পাণ্ডবদের সব এবার লাগিয়ে দাও চাকরের কাজে।"

কর্ণ মনের কথাই ব'লেছেন। দুর্যোধনের কথায় দুঃশাসন নানা রকম ক'রে অপমান ক'রলেন পাণ্ডবদের। পাণ্ডবেরা রাগে ফুল্‌তে লাগলেন। ভীম এমন কট্‌মট্‌ ক'রে তাকালেন দুর্যোধনের দিকে, তাতেই তাঁর প্রাণ উড়ে গেল।

দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভায় আন্‌তে পাঠালেন একজন লোককে সে ফিরে এল। তখন দুঃশাসন লাফাতে লাফাতে চ'ললেন দ্রৌপদীকে নিয়ে আসতে।

দ্রৌপদী অন্তঃপুরে আছেন। দুঃশাসন তাঁকে আনতে চান রাজ সভায় দুঃশাসনের চেহারা দেখে ভয়ে দ্রৌপদী পালিয়ে যেতে চান অন্য মেয়েদের ঘরে। দুঃশাসন এক লাফে গিয়ে দ্রৌপদীর চুল ধ'রলেন চেপে আর হিড় হিড় ক'রে টেনে তাঁকে নিয়ে গেলেন রাজ সভায়। দ্রৌপদীর আলু থালু বেশ, এমন বেশে তাঁকে রাজসভায় আসতে হবে তা তিনি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নি।

দ্রৌপদীর গাল ব'য়ে প'ড়ছে দর দর ক'রে চোখের জল। সভার সবাইকে লক্ষ্য ক'রে তিনি জানালেন তাঁর মনের ব্যথা। কিন্তু সবাই নীরব।

দ্রৌপদী স্বামীদের সাহায্য চাইলেন। তাঁরা নাচার, কেবল রাগে গরগর ক'রছেন।

দ্রৌপদী সভার সকল লোককে ব'ললেন, "যিনি আগেই নিজেকে হারিয়েছেন, আপনারা সব বলুন, কোন হিসাবে তিনি পণ রাখতে পারেন আমাকে ?"

কারো কোন কথা শোনা গেল না। কেবল আপত্তি জানালেন ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে বিকর্ণ। তিনি ব'ললেন, "আপনাদের ভেতর আছেন অনেক জ্ঞানী, গুণী, আপনারা সভায় থেকে কেমন ক'রে সইছেন স্ত্রীলোকের অপমান ?" কৌশল ক'রে হারাণ হ'ল যুধিষ্ঠিরকে, তার ওপর দেবী দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনা কি ধর্ম্মে সয়! সভায় কেউ কেউ গুন্‌ গুন্‌ ক'রে সুখ্যাতি ক'রলেন বিকর্ণকে।

দুর্যোধন বিকর্ণকে বেশ ক'রে ব'কে দিয়ে দ্রৌপদীর গহনা, কাপড় কেড়ে নিতে হুকুম দিলেন দুঃশাসনকে। দাদার কথায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর গহনা গুলো খুলে নিয়ে যখন তাঁর কাপড় কেড়ে নেবার চেষ্টা ক'রছেন, তখন দ্রৌপদী মনে প্রাণে ডাকলেন শ্রীকৃষ্ণকে, "কোথায় লজ্জা নিবারণ হরি, ভক্তের মান রাখ প্রভু!"

ভক্তের ডাকে শ্রীকৃষ্ণের আসন ট'লল। তিনি আকাশে থেকে দ্রৌপদীর কাপড় জোগাতে লাগলেন। দুঃশাসন যতই কাপড় টানেন, ততই বেড়ে যায় দ্রৌপদীর কাপড়। লাল, নীল, সবুজ, হ'লদে, বেগুনি কাপড়ের পাহাড় হ'য়ে গেল রাজ সভায়। দুঃশাসন কাপড় টেনে টেনে এত কাবু হ'লেন যে, আর দাঁড়াতে না পেরে ব'সে প'লেন। সভার লোকেরা দ্রৌপদীকে ধন্য ধন্য ক'রলেন আর নিন্দা ক'রলেন দুর্যোধনের।

এতেও দুর্যোধনেরা নিরস্ত নন। আবার চ'লল দ্রৌপদীর ওপর অত্যাচার। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দাসী ব'লে টানতে লাগলেন তাঁর চুল ধ'রে। ভীম প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, "আমি দুঃশাসনের বুক চিরে ক'রব রক্ত পান।" দুঃশাসনের বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল।

দুর্যোধন কটাক্ষ ক'রে দেখালেন তাঁর উরু। ভীম ফের প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, "আমি গদার ঘায়ে ভাঙ্গব তোমার উরু, তবে আমার নাম ভীম।" এই কথায় দুর্যোধনের গায়ের রক্ত যেন হিম হ'য়ে গেল।

রাজবাড়ীর মধ্যে ডেকে উঠ্‌ল কাক, শকুন, শিয়াল, ভেঙ্গে প'ড়তে লাগল বাড়ি-ঘর আর বইতে লাগল হু হু ক'রে গরম বাতাস। চারিদিকে খালি অমঙ্গল।

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে ব'ললেন, "ধ্বংসের আর দেরি নেই, এখনও এর একটা বিধান হওয়া ভাল।"

ধৃতরাষ্ট্র আদর ক'রে দ্রৌপদীকে কাছে ডেকে ব'ললেন, "মা, তুমি

আমাদের বংশের বড় বউ। তুমি বড় ভাল মেয়ে। আমার ছেলেরা তোমার ওপর অত্যাচার ক'রেছে ব'লে আমার খুব দুঃখ। তুমি বল, তুমি কি চাও। যা চাইবে, তা তোমায় দিতে আমার কোন অসাধ নেই।"

দ্রৌপদী আগে চাইলেন যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব মুক্তি। তার পর চাইলেন তাঁর অপর স্বামীদের মুক্তি। তিনি আর চাননা কিছুই, কারণ ক্ষত্রিয়ের দুটীর বেশী বর চাইবার অধিকার নেই।

কর্ণের বিদ্রূপ করা কিন্তু থামেনি। ভীমত সেই দিনই কর্ণকে হত্যা করতে চান, যুধিষ্ঠিরের বারণ শুনে তিনি তা ক'রলেন না।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরদের সব হারা জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের বিদায় দিলেন। তাঁরা মা আর দ্রৌপদীকে নিয়ে ফিরে চ'ললেন তাঁদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে।

"হাতে পেয়ে শত্রুদের এমন ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ল!" দুঃশাসন দুর্যোধনের কাছে এসে দুঃখ ক'রলেন। তখন দুর্যোধন কর্ণকে নিয়ে গেলেন ফের ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে ব'ললেন, "আমরা কেমন কৌশল ক'রে পাশা খেলায় পাণ্ডবদের দিলাম হারিয়ে, আর আপনি কিনা দিলেন তাদের সব ধন-রত্ন ফিরিয়ে দিয়ে তাদের মুক্তি! এমন একটা সুযোগ পেলাম, আপনার জন্যে তা আমাদের ভোগ হ'লনা। যা হ'ক আর একবার পাশা খেলার মত দেন আপনি। এবার আর ধন রত্ন পণ, রাখা নয়। এবার পণ হবে, যারা হারবে এই খেলায়, তাদের বার বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাত বাস ক'রতে হবে। অজ্ঞাত বাসের সময় ধরা প'লে আবার বার বছর বনবাস আর এক বছর করতে হবে অজ্ঞাত বাস। হেরে গিয়ে পাণ্ডবদের নিশ্চয় যেতে হবে বনে, তখন আমি বড় হবার সুযোগ পাব।"

ধৃতরাষ্ট্র রাজি হ'য়ে দূত পাঠালেন যুধিষ্ঠিরকে ডাকতে। দূত খুব

ছুটে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের দেখা পেলেন ইন্দ্র প্রস্থের পথে। পাশা খেলার কথা শুনে ভীম প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিলেন। কিন্তু গুরুজনের কথা অমান্য করেন নি কখনো, তাই যুধিষ্ঠির অনেক ক'রে বুঝিয়ে চ'ললেন হস্তিনায়। ভায়েরাও দাদার পিছু পিছু আসতে বাধ্য হ'লেন।

গান্ধারী পাশাখেলা বন্ধ ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন ধৃতরাষ্ট্রকে, কিন্তু খেলা বন্ধ হ'ল না।

যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেলেন। পণ রাখার জন্যে তিনি দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে বনে যেতে প্রস্তুত হ'লেন। তাঁরা প'রলেন মাথায় জটা আর পরণে গাছের ছাল। দ্রৌপদীও সমস্ত গহনা খুলে ফেলে শাঁখা আর গাছের ছাল প'রে স্বামীদের সঙ্গ নিলেন।

বিদুর কুন্তী দেবীকে যেতে দিলেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "কুন্তী দেবীর বয়স হ'য়েছে, এই বয়সে বনের কষ্ট সইতে পারবে কেন? তুমি তাঁকে আমার বাড়ী রেখে যাও।"

কুন্তী দেবীকে বিদুরের কাছে রেখে গুরুজনদের প্রণাম করে যুধিষ্ঠিরেরা বনে চ'ললেন। দুর্যোধনেরা ভারি খুশি। তখনো তাঁরা ঠাট্টা ক'রতে ছাড়লেন না। ভীম খুব রেগে ব'ললেন, "আচ্ছা আমরা বন থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত থাক তোমরা, তারপর আমি একাই তোমাদের একশ' ভায়ের দফা রফা ক'রে দেব।"

অর্জ্জুন কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, সহদেব শকুনিকে মারবার পণ ক'রলেন আর নকুল ব'ললেন, "আমি দুর্যোধনের সেনাপতিদের মৃত্যুর ভার নিলাম।"

ছেলেদের দশা দেখে কুন্তী দেবী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলের চোখেই জল, প্রজারা শোকে একেবারে পাগল।

পুরোহিত ধৌম্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রলেন, যুধিষ্ঠির মিষ্ট কথায় সকলকে শান্ত ক'রে বনে চ'লে গেলেন।

# বন পর্ব্ব।

—:o:—

প্রজারা যুধিষ্ঠিরের কথায় শান্ত হ'ল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ফ্যাসাদে পড়লেন ব্রাহ্মণদের নিয়ে। তাঁরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ ছাড়তে চান না। যুধিষ্ঠিরের অর্থ নেই, সম্পদ নেই, কি দিয়ে তিনি তাঁদের সেবা ক'রবেন! তিনি বনের পথে এক জায়গায় সূর্য দেবের আরাধনা, সুরু ক'রে দিলেন। যুধিষ্ঠিরের ওপর তুষ্ট হ'য়ে সূর্যদেব যুধিষ্ঠিরের সাম্‌নে এসে বর দিতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "দেব, আর কোন বর চাইনে আমি, আমি শুধু চাই, আপনি এমন একটা কাজ করুন, যাতে আমি এই ব্রাহ্মণদের সেবা ক'রে ধন্য হই। এখন যে কোনো সম্বল নেই আমার।"

সূর্যদেব ব্রাহ্মণ সেবায় যুধিষ্ঠিরের মন দেখে তাঁকে দিলেন একটা স্থালী আর বল'লেন, "লক্ষ্মীর অংশে হ'য়েছে দ্রৌপদীর জন্ম। তিনি রান্না ক'রে যা রাখবেন এই স্থালীতে, তা আর ফুরুবে না। তবে দ্রৌপদীর খাওয়া হ'য়ে গেলে এই স্থালী থেকে সে দিনের মত আর কিছুই পাওয়া যাবে না।"

এই কথা ব'লে সূর্য দেব চ'লে গেলেন।

আর ভাবনা কি! মনের আনন্দে ব্রাহ্মণদের সেবা ক'রে যুধিষ্ঠির রইলেন কাম্যক বনে।

ঐ বনে থাকৃত কির্ম্মীর নামে এক রাক্ষস। সে ছিল বক রাক্ষসের ভাই আর হিড়িম্বের বন্ধু। এত লোক দেখে, রাক্ষস এল তাঁদের গিলতে। দ্রৌপদী ত ভয়েই অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজের পরিচয় দিয়ে থাকৃতে চাইলেন ঐ বনে। রাক্ষসটা ভীমের নাম শুনেই ক্ষেপে গেল। ভীমই যে বক আর হিড়িম্বকে মেরে ফেলেছেন! রাক্ষস এমন মায়া ক'রল যে, সারা বনটা ডুবে গেল অন্ধকারে। রাক্ষসকে আর দেখা যায় না। কখন কোন্‌ ফাঁকে কাকে খেয়ে ফেলে এই হ'ল সবার ভয়। ধৌম্য মন্ত্র প'ড়ে

অন্ধকার সরিয়ে দিলেন ভীমের সঙ্গে বা'ধ্‌ল রাক্ষসের লড়াই। ভীমের হাতের চড় খেয়েই সে মারা গেল।

পাণ্ডবদের বনে যাওয়ার খবর পেয়ে পাণ্ডবদের আত্মীয়েরা আর অনুগত রাজারা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে এলেন পাণ্ডবদের দেখ্‌তে। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে দ্রৌপদী জলভরা চোখে নিজের সব দুঃখের কাহিনী ব'ললেন।

ভীষ্ম প্রভৃতি থাকৃতে এত বড় অন্যায় হ'য়ে গেল ভেবে শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। কিন্তু ভীষ্মেরা যে অনুগত থাকৃবেন বলে মনে প্রাণে ইচ্ছা ক'রেছেন, তাইত তাঁদের সইতে হচ্ছে সব। যাহ'ক, শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলার অনেক নিন্দা ক'রে ব'ললেন, "কপালের লেখা, কেউ হাত দিয়ে মুছে ফেল্‌তে পারে না। শ্রীবৎস প্রভৃতিও ভাগ্যের হাত এড়াতে পারেন নি। আমি আছি ভাবনা কি ?"

শ্রীকৃষ্ণেরা চ'লে গেলে পাণ্ডবেরা গেলেন দ্বৈতবনে। বনটী বড় সুন্দর। মুনি, ঋষি, গন্ধর্বেরা থাকে সেই বনে। ফুলে ফলে বনটা ভরা। পাখীর গানে পুলক জাগে প্রাণে।

বনের মুনিরা এসে দেখা ক'রলেন যুধিষ্ঠিরের সাথে। মুনির দলে ছিলেন মার্কণ্ডেয়। তিনি পাণ্ডবদের অনেক উপদেশ দিলেন।

এই ভাবে পাণ্ডবদের দিন কাট্‌ছে। মনে নেই সুখ প্রাণে শান্তি। কেবলই তাঁদের মনে পড়ে দুর্যোধনের অত্যাচারের কথা, বেশী ক'রে দুঃখের আগুন জ্বলে দ্রৌপদীর বুকে।

একদিন বেদব্যাস এলেন পাণ্ডবদের কুটীরে তাঁদের ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে ব'ললেন, "ভয় নেই, তোমাদের সুখের দিন আস্‌ছে। আমি তোমাকে প্রতিস্মৃতি ব'লে এক মন্ত্র দেব। ঐ মন্ত্র জপ করে শিবের উপাসনা ক'রলে তোমাদের মঙ্গল হবে। ভাল কথা, তোমরা এক বনে বেশী দিন থেকো না।"

বেদব্যাসের কাছে মন্ত্র জেনে নিয়ে সকলকে নিয়ে যুধিষ্ঠির হাজির হ'লেন সরস্বতী নদীর ধারে।

সেখানে থাকৃতে থাকৃতে যুধিষ্ঠিরের মনে পড়ল প্রতিস্মৃতি মন্ত্রের কথা। তিনি অর্জ্জুনকে ডেকে ব'ললেন, "ভাই তুমি বেদব্যাসের দেওয়া প্রতিস্মৃতি মন্ত্র জপ ক'রে শিবের উপাসনা ক'রলে তিনি আমাদের মঙ্গল ক'রবেন, আর আমরা পাব ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার কাছে ভাল ভাল সব অস্ত্র।"

যুধিষ্ঠিরের কাছে মন্ত্র নিয়ে গাণ্ডীব ধনু আর অক্ষয় তূণ পিঠে বেঁধে তিনি শিবের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের উত্তরে ইন্দ্রকীল পাহাড়ে আস্তেই দৈববাণী হ'ল ; "অর্জ্জুন, তুমি এখানে ব'সে কর শিবের আরাধনা।"

অর্জ্জুন অনাহারে, অনিদ্রায় শিবের তপস্যা স্থরু ক'রে দিলেন। বহুদিন ধ'রে চ'লল তাঁর তপস্যা। শিব অর্জ্জুনের তপে তুষ্ট হ'য়ে অর্জ্জুনের বাসনা পূর্ণ ক'রতে এলেন ব্যাধের রূপ ধ'রে, আর তাঁর সঙ্গে এলেন ব্যাধের রূপ ধ'রে দুর্গা। শিব ভক্ত অর্জ্জুনকে পরীক্ষা ক'রবার জন্যে তৈরি ক'রলেন এক প্রকাণ্ড শূয়োর। শূয়োরটা মারতে এল অর্জ্জুনকে, অর্জ্জুন তাই তুললেন তাঁর গাণ্ডীব ঐ শূয়োরকে মারতে। ব্যাধ ব'ললেন, "এ শূয়োর আমার শিকার, আমি এটাকে মারতে চাই।"

অর্জ্জুন বীর, কেন শুন্‌বেন সে কথা। তিনি তাঁর বাণ ছুড়ে দিলেন শূয়োরের দিকে, ব্যাধও ছুড়লেন বাণ ঐ শূয়োরের ওপর। কথা কাটাকাটি হ'তে বাধল অর্জ্জুন আর ব্যাধরূপী শিবের যুদ্ধ। অর্জ্জুন চোখা চোখা বাণ ছুড়লেন ব্যাধের দিকে, কিছুই করতে পারলেন না ব্যাধের। তূণের বাণ সব ফুরিয়ে গেল। গাণ্ডীব নিয়ে মারতে গেলেন ব্যাধকে, ব্যাধ কেড়ে নিলেন অর্জ্জুনের ধনুক। তার পর দু'জনে লেগে গেল মল্লযুদ্ধ। অর্জ্জুন কাহিল হ'য়ে প'লেন। তিনি ব্যাধকে থাম্‌তে ব'লে মাটী দিয়ে শিবের মূর্ত্তি গড়িয়ে শিবের পূজায় ব'সে গেলেন। তিনি যত ফুল দেন শিবের

পায়ে, সব গিয়ে পড়ে ব্যাধের পায়ে, আর যত মালা দেন শিবের গলায়, সব ঝুলছে দেখেন ব্যাধের গলে। আর বুঝতে বাকি রইল না অর্জ্জুনের, ব্যাধই তাঁর আরাধ্য শিব। শিব তুষ্ট হ'য়ে অর্জ্জুনকে দিলেন পাশুপত অস্ত্র, ঐ সঙ্গে অস্ত্র ছোড়ার মন্ত্র দিলেন তাঁকে শিখিয়ে। আরো দেবতারা এসে অর্জ্জুনকে ভাল ভাল অস্ত্র দিলেন। দরকার হ'লে সাহায্য ক'রবেন ব'লে, শিব দুর্গাকে নিয়ে চ'লে গেলেন কৈলাসে।

অর্জ্জুনকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে মাতলিকে দিয়ে রথ পাঠিয়ে দিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের রথ এলে তাতে চড়ে অর্জ্জুন স্বর্গে রওনা হ'লেন।

স্বর্গে অর্জ্জুনকে দেখে ইন্দ্রের খুব আনন্দ হ'ল। অর্জ্জুনকে নিজের আসনে বসিয়ে ইন্দ্র হাজার চোখ মেলে দেখ্‌তে লাগলেন তাঁকে। অর্জ্জুনের আনন্দের জন্যে ইন্দ্রের সভায় নাচ গানের বন্দোবস্ত করা হ'ল।

উর্ব্বশী নাচ্‌তে এসে অর্জ্জুনের রূপ দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। উর্ব্বশীর মন গেল অর্জ্জুনের দিকে। অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে মা বলে ডাকায় উর্ব্বশী "নপুংসক হও" ব'লে অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিলেন। ইন্দ্র যখন শুন্‌লেন এই কথা, তখন অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন, "বাপু দুঃখ ক'র না। তোমাদের অজ্ঞাত বাসের সময় এই অভিশাপ বেশ কাজে লাগবে। অজ্ঞাত বাসের পর তোমার শাপমুক্তি হ'য়ে যাবে।"

অর্জ্জুন রোজই ইন্দ্রের সভায় বসেন ইন্দ্রের নিজের আসনে। লোমশ মুনি সভায় এসে অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের আসনে ব'সতে দেখে, এর কারণ জানতে চাইলেন ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র অর্জ্জুনের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ তা ব'লে লোমশ মুনিকে ব'ললেন, "আপনি এখনি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে অর্জ্জুনের খবর জানিয়ে তাদের সবাইকে নিয়ে তীর্থ ঘুরে আসুন। যুধিষ্ঠিরকে ব'লবেন, দুঃখের হাত এড়াতে হ'লে পুণ্য ক'রতে হয়।"

অর্জুন মনের আনন্দে ইন্দ্রের কাছে নানা রকম অস্ত্র আর চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের কাছে নাচ গান শিখতে লাগলেন।

অনেকদিন হ'য়ে গেল, অর্জ্জুনের কোন খোঁজ নেই। পাণ্ডবেরা সবাই অর্জ্জুনের অভাবে মনমরা হ'য়ে আছেন। ভীম আর থাকৃতে না পেরে রাগ ক'রে যুধিষ্ঠিরকে ব'ললেন, "আপনার কাল পাশা খেলার জন্যই আমাদের এই দশা, আর সেই জন্যে আমরা হারাতে ব'সেছি প্রাণের ভাই অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুন কোথায় যে থাকল, তার কোনই ঠিকানা নেই। এই ভাই যদি আর না ফেরে, তবে কার আশায় থাকব প্রাণ ধরে। এমন বনবাসের পণ না ক'রে আমাদের উচিত ছিল, সেই দিনই দুর্যোধনদের শেষ ক'রে দেওয়া। তাও হ'লনা আপনারই দয়ার খাতিরে। শত্রু যারা, তারা আবার দয়ার যোগ্য কিসের?"

যুধিষ্ঠির ভীমের কথায় একটুও রাগ ক'রলেন না, বরং আদর ক'রে তাঁকে কোলে টেনে নিয়ে কত ভাল কথা ব'লতে লাগলেন। এমন না হ'লে কি যুধিষ্ঠিরকে এত ভাল বলে লোকে!

এমন সময় এলেন বৃহদশ্ব মুনি। যুধিষ্ঠিরের ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে পাশা-খেলায় নলরাজ কত কষ্ট পেয়ে ছিলেন, তা সব বুঝিয়ে ব'ললেন যুধিষ্ঠিরকে। দিন কত পরে নারদ মুনি এসে তীর্থের ফল ব্যাখা ক'রলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

আরো কত দিন কেটে গেল, অর্জ্জুন ফেরেন না। অর্জ্জুনের বিচ্ছেদ আর পাণ্ডবেরা সইতে পারছেন না। বিশেষ ক'রে ব্যাকুল হলেন দ্রৌপদী! পাণ্ডবেরা কোনো রকমে কাল কাটিয়ে চ'লেছেন। এই অবস্থায় লোমশ মুনি এসে হাজির। তার দেহের তেজে চারদিক আলো হ'য়ে উঠ্‌ল। যুধিষ্ঠিরের দেওয়া আসনে ব'সে লোমশ মুনি অর্জ্জুনের খবর সব বলে ইন্দ্রের ইচ্ছা জানালেন যুধিষ্ঠিরকে। তীর্থ যাবার একটু দেরি আছে ব'লে লোমশ মুনি পাণ্ডবদের সঙ্গেই রইলেন ঐ বনে।

সকলে ব'সে ব'সে শাস্ত্র বিচার ক'রছেন, হঠাৎ উত্তর দিক থেকে এল পদ্মের চমৎকার গন্ধ। ঐ পদ্ম পাবার আশায় দ্রৌপদীর মন মেতে উঠ্‌ল। তিনি ভীমকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে ব'ললেন, "প্রভু, যদি আপনি সত্যই আমাকে ভালবাসেন, তবে আমাকে এনে দিন এই পদ্ম। আমি পদ্ম ফুলে দেবতার পূজা ক'রব।"

লোমশ মুনি ধ্যানে জানতে পারলেন, ঐ পদ্ম আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক সরোবরে। পদ্মগুলো সব সোণার। লোমশ মুনির কথা শোনা মাত্রই ভীম চ'ললেন পদ্ম ফুলের খোঁজে তাঁর ধনুর্ব্বাণ আর গদা নিয়ে।

নানান পশু শিকার ক'রতে ক'রতে ভীম এগিয়ে চ'লেছেন উত্তর দিকে ভীম এসে প'লেন এক বনের ভেতর। কী সুন্দর বন! চার দিকে কত রকমই ফুলই না ফুটে রয়েছে! ভোমরার গুন গুন শব্দ আর কোকিলের কুহু বনটাকে তুলেছে যেন সজীব ক'রে! এমন ঝির ঝির ক'রে বাতাস বইছে যে, মনে হয় সেখানে চির বসন্ত।

বন পার হ'য়ে ভীম এলেন এক মস্ত কলা বাগানের ধারে। গাছে সুন্দর সুন্দর কলা দেখে ভীম এক পেট কলা খেয়ে নিলেন। তাঁর পায়ের চাপে আর চলার জোরে অনেক কলাগাছ গেল ভেঙে।

ঐ কলাবাগান পাহারা দিতেন নিজে হনুমান্। তিনি মড় মড় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন, এ যে তাঁর ভাই ভীম! হনুমান্ পবনের ছেলে ভীমও পবনের ছেলে। তিনি ভীমের জোর পরীক্ষা ক'রবার জন্যে বুড়ো বানরের আকৃতি ধ'রে সেখানে প'ড়ে রইলেন, পথের ঠিক ওপরে। পথ পাবার জো নেই। পথের ওপর শুয়ে আছেন হনুমান, আর পথের দুধারে র'য়েছে ভীষণ কাঁটা বন। ভীম হনুমান্‌কে ব'ললেন একটু পথ ছেড়ে দিতে। হনুমান্ ব'ললেন, "আমি বড্ড বুড়ো হইয়াছি, নড়বার জোর

আমার নেই মোটেই। তুমি আমাকে একটু সরিয়ে তোমার পথ ক'রে নাও।"

এতটুকু জীবকে সরাতে আর কত জোর লাগে। ভীম বাঁ হাত দিয়ে হনুমান্‌কে সরাতে গেলেন, পারলেন না। তারপর লাগালেন তার দু'হাত। তাতেও হল না, তখন ভীম তাঁর সমস্ত জোর দিয়েও সরাতে পারলেন না হনুমান্‌কে। ভীমের কেমন আশ্চর্য্য ঠেক্‌ল! তিনি তখন বিনয় ক'রে করজোড়ে হনুমানের পরিচয় চাইলেন। হনুমান্ ব'ললেন, "আমি পবনের ছেলে হনুমান্, তুমিও ত জন্মেছ তাঁর দয়ায়, তাই তুমি আমার ভাই। আমি লঙ্কার যুদ্ধে কিছু সাহায্য ক'রে ভগবান্ রামচন্দ্রের সেবা ক'রে ধন্য হ'য়েছি।"

হনুমানের পরিচয় পেয়ে ভীমের সখ হ'ল হনুমানের আসল রূপটা দেখ্‌তে। হনুমান্ নিজের দেহ বাড়াতে লাগ্‌লেন। বাপ্‌রে, এত বড় চেহারা! ভীমত প'লেন অজ্ঞান হ'য়ে হনুমানের পায়ের তলায়। হনুমান্ দেহটা কমিয়ে ফেলে অনেক চেষ্টায় ভীমের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন, তার পর "দরকার হ'লে আমাকে মনে ক'র" ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রে ভীমকে দিলেন বিদায়।

ভীম একটু পরেই গিয়ে পৌঁছুলেন সোনার পদ্মের সরোবরে। সরোবরের কাঁচের মত জলে স্নান ক'রে, কটা পদ্ম তুলে তাই দিয়ে ভীম নিত্য পূজা সেরে নিলেন। ঐ সরোবরটা ছিল কুবেরের। কুবেরের সৈন্যেরা ভীমকে সরোবরের জলে দেখে তাঁর সঙ্গে বাধিয়ে দিল লড়াই। ভীমের কাছে হেরে গিয়ে তারা কুবেরকে জানাল ভীমের আসার কথা। ভীমের নাম শুনে কুবের নিজের সৈন্যদের বারণ ক'রলেন ভীমের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে। ভীম তখন অনেক পদ্মফুল নিয়ে জল থেকে উঠলেন।

কত দিন কেটে গেল, ভীমেরো ফেরার নাম নেই। যুধিষ্ঠির চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। অর্জ্জুন আছেন স্বর্গে, ভীম পদ্ম ফুল আনতে গিয়ে কোথায় যে

গেলেন তাই ভেবে ভেবে যুধিষ্ঠির সারা হ'য়ে গেলেন। ভীমের খোঁজ করা দরকার মনে ক'রে তিনি স্মরণ ক'রলেন ঘটোৎকচকে। ঘটোৎকচ এসে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী আর সব ব্রাহ্মণদের পিঠে নিয়ে চ'ললেন ভীমের উদ্দেশ্যে। কিছু দূর এগুবার পর তাঁদের দেখা হ'ল ভীমের সঙ্গে। যে জায়গাটায় তাঁরা এলেন, জায়গাটা বেশ ভাল লাগল তাঁদের। তাঁরা দিন কয়েক সেখানে থাক্‌বার মন ক'রলেন।

একদিন ভীম গিয়াছেন, হরিণ শিকারে, এমন সময় জটাসুর এল ঐ বনে। অসুরটাকে দেখে দ্রৌপদী ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দ্রৌপদীর গলার শব্দ পেয়ে ভীম দৌড়ে এসে অসুরটাকে মেরে ফেললেন।

আর সেখানে থাকা নয়। যুধিষ্ঠির লোমশ মুনির বুদ্ধি নিয়ে গেলেন বদরিকাশ্রমে। বদরিকাশ্রমে থাকতে থাকতে অর্জ্জুনের ভাবনা জুড়ে ব'সল যুধিষ্ঠিরের অন্তর; প্রাণ হারা দেহের যে দশা হয়। অর্জ্জুনকে হারিয়ে পাণ্ডবদেরো সেই দশা।

হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের মনে প'ল, অর্জ্জুন যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, পাঁচ বছর পরে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে গন্ধমাদন পর্ব্বতে। তাই তাঁরা সবাই মিলে গন্ধমাদন পর্ব্বতে এসে অর্জ্জুনের অপেক্ষা ক'রে রইলেন। এখানে যক্ষরাজের সঙ্গে বাধল পাণ্ডবদের ঝগড়া, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারের গুণে ঝগড়া মিটে গেল সহজেই, আর যক্ষরাজ হ'লেন সন্তুষ্ট।

অর্জ্জুন পরম আদরে ইন্দ্রের অমরাবতীতে থেকে নানা অস্ত্র, নাচ, গান শেখা শেষ ক'রে ফেললেন। তখন ইন্দ্র মনে মনে ব'ললেন, "এক অর্জ্জুন ছাড়া নিবাত কবচকে ত কেউ মারতে পারবে না।" কিন্তু অর্জ্জুনকে সে কথা ব'লতে তাঁর কেমন বাধ বাধ লাগল। তিনি সারথি মাতলিকে ডেকে ব'ললেন, "দেখ মাতলি, তুমি অর্জ্জুনকে রথে নিয়ে স্বর্গের সব জায়গা দেখিয়ে আন। যখন সব জায়গা দেখান হ'য়ে যাবে, তখন তুমি কৌশল

ক'রে অর্জ্জুনকে শুনিয়ে দেবে নিবাত কবচের কথা। নিবাত কবচের কথা শুন্‌লে অর্জ্জুন নিবাত কবচকে না মেরে থাকতে পারবে না।"

মাতলির রথ অর্জ্জুনকে নিয়ে ছুটল্ স্বর্গের নানান জায়গায়। স্বর্গ দেখে ফিরবার পথেই প'ল নিবাত কবচের চমৎকার বাড়িখানা। বাড়িখানা দেখে অর্জ্জুন মাতলিকে ব'ললেন, "বাঃ বেশ বাড়ি খান ত! বলতে পারেন, এ বাড়ি খানা কার?"

মাতলি দেখ্‌লেন, ঠিক হ'য়েছে। তখন তিনি উত্তর দিলেন, "এই বাড়িটা দেবরাজ ইন্দ্রের পরম শত্রু নিবাত কবচের! ইন্দ্রের শত্রু।" অমনি অর্জ্জুনের হাত নিস্‌পিস্ ক'রে উঠল দৈত্যের সঙ্গে লড়াই ক'রবার ইচ্ছায়। অর্জ্জুনের যুদ্ধের ইচ্ছা জেনে মাতলি ব'ললেন্ "চলুন, সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে যুদ্ধ করা যাক্। আপনি একলা, তার সঙ্গে যুঝ্‌বেন কি ক'রে?"

অর্জ্জুন মাতলির এই কথায় রাগে দিশেহারা। তখুনি তিনি তাঁর গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়ে নিবাত কবচকে যুদ্ধে ডাক দিলেন। নিবাত কবচ বাধিয়ে দিল তুমুল রণ অর্জ্জুনের সঙ্গে। অনেক ভাল বাণ ছুড়েও অর্জ্জুন বিশেষ কায়দা ক'রতে পারলেন না। তখন মনে প'ল তার পাশুপত অস্ত্রের কথা। অর্জ্জুন পাশুপত ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে জ্ব'লে উঠল আগুন। অন্যের কথায় কাজ কি, অর্জ্জুন নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। স্বর্গের সকলে ভাবল, প্রলয় এসে গেল। সেই অস্ত্রের আগুনে দৈত্যের রাজ্যের জীব জন্তু গাছ-পালা সব জ্ব'লে ছার খার হ'য়ে গেল। অবশ্য নিবাত কবচো বাদ গেল না। দৈববাণী হ'ল, "অর্জ্জুন পাশুপত ফিরিয়ে নাও।"
অর্জ্জুন পাশুপত ফিরিয়ে নিলেন।

ইন্দ্রের আনন্দের অন্ত নেই। ইন্দ্রের চির শত্রুর নিপাত হ'য়েছে। ইন্দ্র তখন অর্জ্জুনকে আদর ক'রে মাথায় পরিয়ে দিলেন কিরীট, আর তাঁর

কানে পরিয়ে দিলেন কুণ্ডল। ইন্দ্র বড় ভাল বেশে তাঁকে অর্জ্জুন, ফাল্গুনি, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী আর ধনঞ্জয় এই দশ নামে ডাকলেন। ইন্দ্র ব'ললেন, "যদি কেউ এই দশটী নাম ভক্তি ভরে জপ করে, তবে তার সব অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে।"

অর্জ্জুন অনেক কাল মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গে আছেন, যুধিষ্ঠিররাও কত ভাবছেন অর্জ্জুনের জন্যে—এই ভেবে ইন্দ্র মাতলিকে রথ আনতে ব'ললেন। রথ এল। অর্জ্জুন ইন্দ্রকে প্রণাম ক'রে ব'ললেন, "আপনি জানেন, আমাদের শত্রুরা আমাদের কত কষ্ট দিচ্ছে। আমি চাই তাদের উচিত মত শিক্ষা দিতে। আপনি আমাদের সহায় হ'ন, তাহ'লেই হবে আমাদের আশা পূরণ।"

ইন্দ্র আশ্বাস দিয়ে অর্জ্জুনকে বিদায় দিলেন। নিমেষের মধ্যে রথ চ'লে এল মর্ত্যে। অর্জ্জুন রথ থেকে নেমে যুধিষ্ঠিরের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে প্রণাম ক'রে স্বর্গের ব্যাপার সব তাঁকে ব'ললেন! অর্জ্জুনকে কোলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের বুক জুড়িয়ে গেল। হারানিধি পেয়ে, পাণ্ডবেরা আর দ্রৌপদী সুখের সাগরে ডুবে গেলেন।

ঘটোৎকচের পিঠে চ'ড়ে সবাই গেলেন কাম্যবনে।

পাণ্ডবদের তাড়িয়ে দিয়ে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রছেন দুর্যোধন। শকুনি দুর্যোধনের কাছে এসে ব'ললেন, "বাপু, তোমার শত্রুরাই যদি না দেখ্‌ল তোমার ঐশ্বর্য, তবে তোমার এ ঐশ্বর্য্যের দাম কি?"

কর্ণ ও শকুনির কথায় সায় দিয়ে ব'ললেন, "চল, ভাই আমরা জাঁক-জমক ক'রে তীর্থে স্নান ক'রতে যায় প্রভাসে। পাণ্ডবেরা ব সেখানেই রয়েছে। তীর্থে স্নান করে পুণ্য লাভও হবে আর তোমার শত্রুরাও জ্বলে ম'রবে তোমার এই অসীম্ ঐশ্বর্য্য দেখে। যাকে বলে এটা "এক ঢিলে দুই পাখী মারা।

কর্ণের মত বন্ধুর কথা কি ঠেলতে পারেন দুর্যোধন। তিনি হাতী, ঘোড়া, লোক লস্কর, বন্ধু বান্ধব আর রাণীদের নিয়ে বেরিয়ে প'লেন প্রভাসের পথে।

পাণ্ডবেরা যে যার কাজে ব্যস্ত। হাতী, ঘোড়া, রথ, আর সৈন্য চলার ধুলোয় ভ'রে গিয়েছে চারিধার। নানা রকম শব্দ শুনে পাণ্ডবদের মনে হ'ল সৈন্যের দল আসছে। ভীম আর অর্জ্জুন এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। ব্যাপার কি, জানা দরকার। অর্জ্জুন কপিধ্বজ রথ স্মরণ ক'রলেম। ঘড় ঘড় শব্দে রথ হ'ল হাজির। অর্জ্জুন রথে চ'ড়ে শূন্যে উঠে দেখ্‌লেন, দুর্যোধন সৈন্যদল নিয়ে আসছেন। অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি নেমে এসে এ খবর জানালেন যুধিষ্ঠিরকে। সাবধানের মার নেই! ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা যুদ্ধের সাজে তৈরি হ'লেন।

পাণ্ডবদের আশ্রমের কাছ দিয়ে যখন দুর্যোধনের সৈন্যদল চ'লেছে, তখন্ সঞ্জয়ের ছেলে এসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা ক'রে দুর্যোধনের প্রভাসে যাওয়ার কথা জানালেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে আশীর্বাদ জানালেন।

প্রভাস তীর্থে স্নান সেরে দুর্যোধনের দল বিশ্রামের ইচ্ছায় ঢুকলেন একটা বাগানে। ওটা ছিল গন্ধর্বদের রাজা চিত্র সেনের ফুল বাগান। লোকের ভিড়ে বাগানটা লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেল। বাগানের পাহারাদার জানাল আপত্তি। তাতে কর্ণ তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলেন। এ খবর যখন পেলেন চিত্রসেন, তখন তাঁর সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য! তিনি রাগে দিশেহারা হ'য়ে রথে চড়ে এলেন তাঁর ফুল বাগানে। তাঁর ধনুকের ছিলার শব্দে চারিদিক চম্‌কে উঠ্‌ল।

দুর্যোধনের দলের সঙ্গে বাধ্‌ল চিত্রসেনের যুদ্ধ। জোরাল চিত্রসেনের কাছে সবাই হার মানলেন। চিত্রসেন রাণীদের সঙ্গে দুর্যোধনদের বেঁধে নিয়ে চ'ললেন।

এত বড় অপমানে রাণীদের কী আপশোষ। দুর্যোধনের রাণী ভানুমতী এই লাঞ্ছনার খবর দিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

যুধিষ্ঠির এই খবর পেয়েই সকলের উদ্ধারের হুকুম দিলেন ভীম আর অর্জ্জুনকে। ভীম ত রেগেই আগুন। যারা এতকাল ধ'রে দিচ্ছে কষ্ট, তাদের উদ্ধারের কিনা দাদার এত দরদ!

শেষ পর্যন্ত অর্জ্জুন চ'ললেন দুর্যোধনদের রক্ষা ক'রতে। অর্জ্জুনকে দেখে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছেন চিত্রসেন। অর্জ্জুনের বাণের চোটে তাঁর আর পালান চ'লল না, ধরা প'ড়ে গেলেন অর্জ্জুনের হাতে। অর্জ্জুন সবাইকে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির সকলের বাঁধন খুলে দিয়ে দুর্যোধনকে অনেক উপদেশ দিলেন আর মধুর কথায় তুষ্ট ক'রে চিত্রসেনকে দিলেন বিদায়।

দুর্যোধন মনে বড় আঘাত পেলেন। নিজের জোর না বুঝে এখানে এসে কি অন্যায়ই ক'রেছেন তিনি, যা হোক্ কর্ণ তাঁকে অনেক ক'রে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন হস্তিনায়।

একদিন দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্ব্বাসা এলেন দুর্যোধনের বাড়ি। দুর্যোধনের আদর যত্নে অত বড় রাগী ঋষিও তুষ্ট হ'লেন। তিনি দুর্যোধনকে বর নিতে ব'ললেন। কিন্তু দুর্যোধন একটু ভেবে দেখ্‌লেন, এইবার যুধিষ্ঠিরদের জব্দ করার ফন্দি করা যাক্। রাত্রি দশ দণ্ডের পর দ্রৌপদীর খাওয়া হ'য়ে গেলে সূর্যের দেওয়া স্থালীতে আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে সময় দুর্ব্বাসা যদি সেখানে যান, তবে যুধিষ্ঠির তাঁকে খাবার দিতে পারবেন না, তা'হলেই ঋষির রাগে তাদের অনিষ্ট হবে। দুর্যোধন দুর্ব্বাসাকে ব'ললেন, "যদি আপনি আমায় বর দিতে চান, তবে রাত্রি দশ দণ্ডের পর দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দয়া ক'রে যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে গিয়ে তাঁর কাছে আহার চান।"

দুর্ব্বাসা 'তাই হবে' ব'লে দুর্যোধনের কথায় রাজি হ'লেন।

রাত্রি দশ দণ্ড পার হ'য়ে গিয়েছে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে আর দ্রৌপদী খাওয়া শেষ ক'রে শোবার জোগাড় ক'রছেন, এমন সময় 'হর হর,' "বোম, ব্যোম," শব্দে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে হাজির হ'লেন দুর্ব্বাসা। আহারের আয়োজন ক'রতে ব'লে শিষ্য নিয়ে দুর্ব্বাসা সন্ধ্যা বন্দনা ক'রতে চ'লে গেলেন প্রভাসে।

পাণ্ডবেরা প'লেন ফাঁপরে। দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে, স্থালীতে ত আর খাবার পাওয়া যাবে না। দ্রৌপদী প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণকে।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রুক্মিণীর সঙ্গে বিশ্রাম ক'রছেন, দ্রৌপদীর ডাক শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ আকুল ক'রে তুল্‌ল। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পিঠে চ'ড়ে চ'লে এলেন কাম্যক বনে। তাঁকে দেখে পাণ্ডবেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে দেখে ব'ললেন, "আমার বড় খিদে পেয়েছে কৃষ্ণা! আমায় কিছু খেতে দাও।"

এ আর এক বিপদ! দ্রৌপদী বড় লজ্জা পেলেন। তিনি ব'ললেন "এ কি ছলনা দয়াময়! আপনাকে দেওয়ার মত কিছুই ত নেই আমার স্থালীতে। শ্রীকৃষ্ণ নাছোড় বান্দা! দ্রৌপদীকে আনতে হ'ল সেই স্থালীটা শ্রীকৃষ্ণের সামনে। দেখালেন, স্থালীতে র'য়েছে একটা ভাত আর এক কুচি শাক। শ্রীকৃষ্ণ তাই চেয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে ব'ললেন, "আঃ তৃপ্তি পেলাম!"

প্রভাসের তীরে ঋষিদের আর খিদে নেই। 'হেউ হেউ' ক'রে ঢেকুর তুলে সবাই সেখানে শুয়ে প'লেন। আর কারো নেই ন'ড়বার শক্তি।

রাতটা কেটে গেল। সকাল হ'লে দুর্ব্বাসা শিষ্যদের নিয়ে যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে এলেন। যুধিষ্ঠির আহার দিয়ে তুষ্ট ক'রলেন দুর্ব্বাসাদের। দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরদের আশীর্বাদ ক'রে চ'লে গেলেন।

একথাও পৌছাল দুর্যোধনের কানে। এত ক'রেও পাণ্ডবদের জব্দ করা যায় না! সকলে মিলে নতুন মতলব ক'রতে ব'সে গেলেন। একজন ব'লে উঠলেন, "দ্রৌপদীই পাণ্ডবদের প্রাণ। কোনো রকমে যদি দ্রৌপদীকে কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়, তবে তার শোকে পাগল হ'য়ে মারা যাবে পাণ্ডবেরা।"

এখন এত বড় সাহসের কাজ করে কে! ভার প'ল জয়দ্রথের ওপর। জয়দ্রথ ত ভয়েই অস্থির! দুর্যোধনের খাতির এড়াতে না পেরে জয়দ্রথ চ'ললেন পাণ্ডবদের আশ্রমে। অনেক দিন লুকিয়ে থাকার পর দ্রৌপদীকে চুরি করার সুবিধা হল।

ভীম ও অর্জ্জুন গিয়েছেন শিকারে, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গিয়েছেন স্নানে। দ্রৌপদী একাই রান্না ক'রছেন কুটিরে। এই সুযোগে জয়দ্রথ হঠাৎ এসে দ্রৌপদীকে রথে তুলে নিয়ে পালালেন। দ্রৌপদী গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির কুটিরে এসে দেখেন দ্রৌপদী কুটিরে নেই। তখন তিনি নকুল সহদেবকে নিয়ে ধনুর্বাণ হাতে বেরিয়ে প'লেন দ্রৌপদীর খোঁজে।

এ দিকে শিকার থেকে আসার পথে দ্রৌপদীর কান্নার শব্দ গেল ভীম অর্জ্জুনের কাণে। অর্জ্জুন কপিধ্বজ রথকে স্মরণ ক'রলেন। রথ এলে রথে চ'ড়ে দু ভাই কান্নার শব্দের পিছু নিলেন। খানিক দূরে তাঁরা দেখতে পেলেন একখান রথ। রথের নিশান দেখে বুঝলেন রথখানা জয়দ্রথের। রথ তাড়াতাড়ি চালিয়ে দিয়ে ধ'রে ফেললেন জয়দ্রথকে। ভীম চুল ধ'রে জয়দ্রথকে নামালেন মাটীতে। দ্রৌপদীর লাথি আর ভীমের কিল খেয়ে জয়দ্রথের প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! ভাগ্যে যুধিষ্ঠির এসে পড়লেন সেখানে তাই জয়দ্রথের প্রাণটা সেবারকারের মত গেল বেঁচে।

জয়দ্রথ মনের দুঃখে হস্তিনায় না ফিরে, পাণ্ডবদের মারবার জন্যে সুরু ক'রলেন শিবের তপস্যা। শিব তুষ্ট হ'য়ে জয়দ্রথকে বর দিতে চাইলেন, কিন্তু জয়দ্রথ পাণ্ডব বধের বর চাওয়ায় শিব বর না দিয়ে ফিরে গেলেন কৈলাসে।

জয়দ্রথ থামবার পাত্র নন। ফের আরম্ভ ক'রলেন আরো ভাল ক'রে শিবের তপস্যা। শিব তখন অর্জ্জুন ছাড়া আর চার পাণ্ডবের নিধনের বর দিলেন জয়দ্রথকে। অর্জ্জুন বেঁচে থাকলে জয়দ্রথের আর লাভ হ'ল কি! কাজেই তাঁর এবারও বর নেওয়া হ'ল না। শিব ব'ললেন, "শ্রীকৃষ্ণ আমার বন্ধু, আবার অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের সখা। আমা হ'তে অর্জ্জুনের কোন ক্ষতি হ'তে পারে না। তবে তোমার ভক্তিতে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি ব'লে অর্জ্জুনের ছেলে অভিমন্যু বধের বর দিতে পারি আমি। অভিমন্যুর মৃত্যু, অর্জ্জুন সইতে পারবে না।"

এবার জয়দ্রথ কতকটা তুষ্ট হ'য়ে হস্তিনায় গিয়ে সকল কথা জানালেন দুর্যোধনকে।

বার বছর বনবাস প্রায় শেষ হ'য়ে এল। যুধিষ্ঠির একে একে ব্রাহ্মণদের বিদায় দিলেন। কেন না, অজ্ঞাত বাসের সময় কেউ ত সঙ্গে থাক্‌লে চ'লবে না! ব্রাহ্মণদের কেউ বা গেলেন হস্তিনায়, আর কেউ বা গেলেন পাঞ্চালে।

পাণ্ডবেরা এক জায়গায় আর থাকবেন না। তাঁরা গিয়ে পৌছুলেন শূরসেন বনে। শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁদের সেখানেই থাকতে ব'লে গেলেন। অজ্ঞাত বাস সুরু হবার যে ক'দিন বাকি আছে, ওখানেই থাকা তাহাদের ঠিকই হ'ল।

পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে আছেন ঐ বনে। একদিন এক মুনির যজ্ঞের কাঠ শিঙে ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল এক হরিণ। কাঠের অভাবে

মুনির যজ্ঞ নষ্ট হয়। মুনি কাঠ এনে দিতে ব'ললেন যুধিষ্ঠিরকে। ঐ কাঠের খোঁজ ক'রতে ক'রতে পাঁচ ভাই বড় ক্লান্ত। জল না পেলে তাঁরা আর বাঁচেন না। যুধিষ্ঠির জল আনতে ব'ললেন ভীমকে। ভীম একটু দূরে এক সুন্দর সরোবর দেখলেন। ঐ সরোবরের ধারে ব'সে আছেন বকের রূপ ধ'রে ধর্ম্মরাজ। যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করাই তাঁর ইচ্ছা। ভীম যেমন সরোবর থেকে জল নিতে যাবেন, অমনি বকরূপী ধর্ম্ম ব'লে উঠলেন "আমার ক'টা প্রশ্ন আছে। যদি তুমি তার উত্তর দিতে পার, তবেই জল নিতে পারবে।" ভীম বকের কথায় কান না দিয়ে জল ছোঁওয়া মাত্রই ম'রে গেলেন। ভীমের দেরি দেখে একে একে ভাইয়েরা এসে ভীমের দশাই পেলেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের না দেখে তাঁদের খুঁজতে এলেন এই সরোবরে। ভাইদের অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির বারে বারে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে লাগলেন। শেষ নিজের প্রাণত্যাগ ক'রতে হ'লেন ব্যস্ত। ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে ম'রতে বারণ ক'রে ব'ললেন, "আমার ক'টা প্রশ্ন আছে। যদি তুমি তার উত্তর দিতে পার, তবে তোমার ভায়েরা বেঁচে উঠবে।"

যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "কি প্রশ্ন বলুন।"

ধর্ম্ম ব'ললেন, "কি আশ্চর্য্য, কোনটী পথ, আর সুখী কে?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

"মাস ঋতু হাতা ল'য়ে পাকের কারণে
দিবস রজনী কাষ্ঠে, সূর্য্য হুতাশনে,
মহামোহময় পাত্রে কাল পুনঃ পুনঃ
জীবগণে করে পাক,—এই বার্ত্তা শুন।

প্রতিদিন যমালয়ে যায় প্রাণিগণ,
এখনো মরেনি যারা, ভাবিছে কেমন,

মোরা সবে চিরজীবী, অক্ষয়, অজর।
অধিক আশ্চর্য্য কিবা আছে এর পর ?

বিবিধ প্রকার হেরি স্মৃতি আর বেদ।
নানান, মুনির শুনি মতের প্রভেদ।
গূঢ় ধর্ম্ম তত্ত্ব কেহ নারে নিরূপিতে।
তাই, মহাজন পথ ধরি নিজ হিতে ॥

প্রবাসে রহে না যে বা কারো কাছে ঋণ নাহি যার.
দিনের অষ্টম ভাগে গৃহে করে শাকান্ন আহার.
তাদের মতন সুখী আর কেবা ভুবন মাঝারে ?
হে বক, তোমার প্রশ্ন উত্তরিনু বুদ্ধি অনুসারে।

যুধিষ্ঠিরের কথায় খুব আনন্দ পেলেন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নিজের রূপ ধ'রে যুধিষ্ঠিরকে বর দিতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির হাত জোড় ক'রে ধর্ম্মকে ব'ললেন, "যদি বর দিতে চান, তবে দয়া ক'রে বাঁচিয়ে দেন সহদেবকে।" ধর্ম্ম একটু আশ্চর্য্য বোধ ক'রলেন। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আচ্ছা, তুমি নিজের মার পেটের ভা'য়ের প্রাণ না চেয়ে কেন চাইলে সহদেবের প্রাণ ?"

যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "যখন আমি বেঁচে আছি তখন মা কুন্তীর পিণ্ড পাবার ভাবনা নেই, কিন্তু সহদেব না বাঁচলে মা মাদ্রী নিজের ছেলের হাতের পিণ্ড পাবেন কি ক'রে ?"

ধর্ম্ম এই কথায় তুষ্ট হ'য়ে সব ভায়ের প্রাণ দিলেন ফিরিয়ে। তিনি ব'ললেন, "এত ধর্ম্ম জ্ঞান যখন তোমার, তখন তুমি কোনো বিষয়ে কষ্ট পাবে না।"

পরের দিন সকাল বেলা পাণ্ডবেরা ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম ক'রছেন, এমন সময় এলেন বেদব্যাস। তিনি যুধিষ্ঠিরের মুখে আগের দিনের ঘটনা শুনে ব'ললেন, "তোমাদের চিন্তা কি? ধর্ম্মের জোরে হবে তোমাদের জয়।"

বার বছর শেষ হ'তে আর দু'দিন মাত্র আছে। কোথায়, কেমন ক'রে তাঁরা অজ্ঞাত বাস ক'রবেন, তাই নিয়ে তাঁরা পরামর্শ ক'র্‌তে লাগলেন। এই রকমে আরো পাঁচ দিন কেটে গেল।



# বিরাট পর্ব্ব

—:০:—

আর একটা দিন গেলেই অজ্ঞাত বাস সুরু করতে হবে। অজ্ঞাত বাসের লাঞ্ছনা বড্ড ব্যথা দিচ্ছে সকলের মনে। ধৌম্য অনেক ক'রে পাণ্ডবদের বোঝালেন কোথায় লুকিয়ে থাকা যায় তা কিন্তু এখনো ঠিক হয় নি।

অর্জ্জুন একে একে পাঞ্চাল, মৎস্য, বিদর্ভ, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের নাম ক'রলেন। যুধিষ্ঠিরের পছন্দ হ'ল মৎস্য দেশটা, কেন না, সেখানকার রাজা খুব ধার্ম্মিক।

জায়গা ত ঠিক হ'ল। এখন তাঁরা মুস্কিলে প'ড়লেন নাম আর পোষাক নিয়ে। বিপদ কম নয়, নাম বা পোষাকে ধরা প'ড়ে গেলে। ফের ক'রতে হবে বার বছর বনবাস, আর এক বছর অজ্ঞাত বাস।

অনেক বুদ্ধি ক'রে সাব্যস্ত হ'ল যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে হবেন, বিরাটের সভাসদ, ভীম হবেন বল্লব নামে বিরাটের বাড়ির রাঁধুনী, অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম ধ'রে নপুংসকের পোষাকে নাচ গান শেখাবেন ঐ রাজার অন্তঃপুরের মেয়েদের। নকুল হবেন গ্রন্থিক নামে অশ্বচিকিৎসক, সহদেব তন্ত্রিপাল নামে ক'রবেন বিরাটের গোরুগুলোর দেখা শোনা, আর সৈরিন্ধ্রী নামে দ্রৌপদী নেবেন বিরাট রাজের রাণী সুদেষ্ণার সাজ গোজের ভার। নিজেদের মধ্যে কথা বার্ত্তা চালাবার সুবিধার জন্যে যুধিষ্ঠিরেরা পর পর জয়, বিজয়, জয়ন্ত, জয়ৎ সেন, আর জগদ্বল, এই পাঁচটা নাম নিলেন।

তারপর পাণ্ডবেরা পুরোহিত ধৌম্যের পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে চ'ললেন বিরাটের রাজ্যে।

বিরাটের রাজধানীর কাছাকাছি এসে যুধিষ্ঠির ভাবলেন, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে রাজ্যে ঢুকলে জানাজানি হ'য়ে যেতে পারে। তিনি অর্জ্জুনকে ব'ললেন,

"ভাই, এই অস্ত্র শস্ত্র, বিশেষ ক'রে তোমার গাণ্ডীব নিয়ে গেলে সবাই আমাদের চিনে ফেলবে। এগুলো লুকিয়ে রাখা দরকার।"

অর্জ্জুন দেখ্‌লেন সাম্‌নেই প্রকাণ্ড এক শাঁই গাছ। তিনি সেই গাছে উঠে একখানি কাপড়ে সব অস্ত্র শস্ত্র মুড়ে বেঁধে রাখ্‌লেন গাছের খুব উঁচুতে একটা ডালে। পাছে কেউ টের পায়, এই ভয়ে কাছেই যে ছেলেরা গোরু চরাচ্ছিল, তাদের ডেকে ব'ললেন, "পথে আসবার সময় আমার মা ম'লেন কিনা, তাই তাঁর দেহটা কাপড়ে ঢেকে রেখে দিলাম এই গাছে। তোমরা কেউ যেন এটা ছুঁয়ো না।" ছেলেরা রটিয়ে দিল এই কথাটা গাঁয়ের মধ্যে। মড়ার কথা শুনে কেউ আর ঘেঁসে না গাছের কাছে।

একে একে পাণ্ডবেরা হাজির হ'লেন বিরাটের সভায়। প্রথমেই যুধিষ্ঠির, কঙ্ক নামে নিজের পরিচয় দিয়ে ব'ললেম, তিনি সভার কাজ ভাল জানে না। বিরাট তাঁর রূপে আর কথায় খুশি হ'য়ে তাঁকে সভায় জায়গা দিলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, আর দ্রৌপদীও ঠিক ঠিক কাজ পেলেন রাজ বাড়িতে।

মানুষের কপাল সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। কীচক ছিলেন বিরাটের শালা। তিনি খুব বীর ছিলেন ব'লে হ'য়েছিলেন বিরাটের সেনাপতি। এই কীচক একদিন দ্রৌপদীর অপমান ক'রলেন। দ্রৌপদী কীচককে ব'ললেন, "তুমি জান না আমার পাঁচজন গন্ধর্ব্ব স্বামী আছেন। তাঁরা তোমার ব্যবহারের কথা জান্‌তে পারলে, তোমাকে তাঁরা আর আস্ত রাখবেন না।" চুপ ক'রে থাকা ঠিক নয় ভেবে, দ্রৌপদী চ'ললেন রাজার কাছে কীচকের নামে নালিশ ক'রতে। কীচক রাগের চোটে দ্রৌপদীকে আচ্ছা ক'রে অপমান ক'রলেন রাজসভার ভেতরই। ভীম ছিলেন সেখানে ব'সে। তিনি ত তখুনি মারতে চান কীচককে ; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ইসারায় গেলেন থেমে। যুধিষ্ঠির বললেন, "কিছু ভেবো না সৈরিন্ধ্রী! তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের কেউ না কেউ সাজা দেবেন এই কীচককে।"

দ্রৌপদী চোখের জল মুছে চ'লে গেলেন অন্তঃপুরে। মনে তাঁর ভারি কষ্ট। দিনটা কোন রকমে কাটিয়ে রাত দুপুরের সময় তিনি দেখা ক'রতে চ'ললেন ভীমের সঙ্গে। ভীম শুতেন রান্নার মহলে। দ্রৌপদী গিয়ে ভীমকে তার দুঃখের কথা জানালেন।

ভীম ব'ললেন, "তুমি ভেব না দ্রৌপদী, আমি নিশ্চয় মেরে ফেলব এই কীচককে। তুমি কোন ফিকিরে কীচককে রাতের বেলায় নিয়ে আসবে নাচ ঘরে। তখন কেউ সেখানে থাকে না, গোপনে কীচককে মেরে ফেলার সুবিধা হবে।"

কীচক পরের দিন ফের গেলেন দ্রৌপদীর কাছে। দ্রৌপদী একটু হেসে কীচককে রাজি করালেন নাচ ঘরে যেতে।

সন্ধ্যা থেকেই ভীম নাচ ঘরে লুকিয়ে আছেন। কীচক যেমন এসেছে সেখানে অমনি ভীম এক লাফে প'লেন কীচকের ঘাড়ে। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি মেরে কীচককে একটা মাংসের দলা ক'রে সেখানে ফেলে রেখে রান্নার মহলে গিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে রইলেন।

কীচকের মরণের কথা শুনে তাঁর আত্মীয়েরা কেঁদে ভাসালেন। কীচকের মত সেনাপতি হারিয়ে এমন রাগ হ'ল রাজার যে তিনি দ্রৌপদীকে পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিলেন। যখন কীচকের ভায়েরা চ'লেছে দ্রৌপদীকে বেঁধে নিয়ে, তখন ভীম ছদ্মবেশে ঝড়ের মত এসে কীচকের সব ভাইকে ফেললেন মেরে। দ্রৌপদীকে দেখে রাজ্যের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল।

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আর রাখতে চান না রাজবাড়িতে, কি জানি কখন আবার কি বিপদ্ ঘটে। অজ্ঞাত বাস শেষ হ'তে তখন বাকি আছে মাত্র তেরটা দিন। দ্রৌপদী নরম সুরে সুদেষ্ণাকে ব'ললেন, "আপনার কোন ভয় নেই। আর তের দিন পরে আমার গন্ধর্ব স্বামীরা এসে আমায় নিয়ে যাবেন। এই কটা দিন দয়া ক'রে আমায় থাকতে দিন আপনার বাড়িতে। সুদেষ্ণা রাজি হ'লেন।

পাণ্ডবেরা কোথায়, কি ভাবে অজ্ঞাত বাস ক'রছেন, জানবার জন্যে দুর্যোধন ব্যস্ত হ'লেন। এ সময় যদি তাঁদের জেনে ফেলা যায় তা হ'লে আবার তাদের বনে পাঠাবার সুবিধা হয়। তিনি চার দিকে চর পাঠালেন। কেউ পাণ্ডবদের কোনো খোঁজ দিতে পারল না। দুর্যোধনের আশা পণ্ড হ'ল। তবে একজন চর এসে জানাল, "গন্ধর্ব্বদের হাতে বিরাটের রাজ্যে কীচকের মৃত্যু হ'য়েছে।" এতে সুশর্ম্মার বড় আনন্দ। কারণ এই কীচকই তাঁর রাজ্য জয় ক'রে নিয়েছিলেন। তিনি চাইলেন এই সুযোগে বিরাটের রাজ্য আক্রমণ ক'রতে। সুশর্ম্মাকে উৎসাহ দিলেন কর্ণ আর দুর্যোধন। গন্ধর্ব্বের নাম শুনে বিদুরের মনে হ'ল, হয়ত পাণ্ডবেরাই গন্ধর্ব্বের নামে বাস ক'রছেন বিরাটের রাজ্যে। দুর্যোধনেরা সে রাজ্যে গেলে পাছে তাঁরা ধরা প'ড়ে যান, এই ভয়ে তিনি মানা ক'রলেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন বিদুরের কথায় কানই দিলেন না।

দুর্যোধন সুশর্ম্মার সাহায্যে হাতী, ঘোড়া, সৈন্য, সামন্ত নিয়ে হাজির হ'লেন মৎস্য দেশে। কথা হ'ল, সুশর্ম্মা রাজ্য আক্রমণ ক'রবেন একদিক থেকে, আর দুর্যোধনেরা রাজ্য আক্রমণ ক'রবেন আর এক দিক থেকে। সুশর্ম্মা এগিয়ে গেলেন আগে। ঢাক ঢোলের বাজনায় আর অস্ত্রের ঝনঝনায় মৎস্য দেশ কেঁপে উঠ্‌ল। সুশর্ম্মার হুকুমে তাঁর সেনারা বিরাটের গোরু, ঘোড়া, ধন, রত্ন সব লুটতে সুরু ক'রল।

এই খবর পেয়ে বিরাট সব সৈন্য নিয়ে সুশর্ম্মাকে বাধা দিতে গেলেন। দুপক্ষেই বাণ চ'লছে। যুদ্ধের জায়গায় ভীষণ গণ্ডগোল। সুশর্ম্মার কাছে হার মেনে রাজা বন্দি, সৈন্যেরা সব ছন্নছাড়া।

যুধিষ্ঠির ভীমকে ব'ললেন, "ভাই বিরাট আমাদের এখানে রেখে বড় উপকার ক'রেছেন। এঁর উপকার করাও আমাদের উচিত। তুমি ভাই তাড়াতাড়ি বিরাটকে বাঁচাবার একটা উপায় কর।"

দাদার কথায় ভীম গেলেন মস্ত বড় একটা গাছ ওপড়াতে। গাছ হাতে দেখে কেউ ভীমকে চীনে ফেলতে পারে, তাই যুধিষ্ঠির ভীমকে গাছ হাতে ক'রতে বারণ ক'রলেন। ভীম খালি হাতেই ছদ্মবেশে চললেন সুশর্ম্মার সঙ্গে যুঝ্‌তে।

যুদ্ধ জয় ক'রে সুশর্ম্মা শিবিরে ব'সে আরাম ক'রছেন। সন্ধ্যাকাল। সৈন্যেরা সব ক্লান্ত হ'য়ে যে যেখানে পেরেছে শুয়ে প'ড়েছে। হঠাৎ শোনা গেল একটা মড় মড় শব্দ। সৈন্যেরা দেখ্‌ল, মস্ত এক বীর এসেছেন তাদের আক্রমণ করতে। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে অনেকে হতভম্ব হ'য়ে গেল। কেউ বা ভাব্‌ল এটা স্বপ্ন। তারা অস্ত্র নেবারো সময় পেলো না। ভীমের হাতে নাস্তানাবুদ হ'য়ে তারা যে দিকে পারল চম্পট দিল। পালাবার সময় কেউ কেউ সুশর্ম্মাকে এ খবরটা জানাতে ভোলে নি। সুশর্ম্মা তখন নিছক একা, পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইলেন কিন্তু ধরা প'ড়ে গেলেন ভীমের হাতে। ভীম তখন সুশর্ম্মা আর বীরাটকে যুধিষ্ঠিরের কাছে এনে দিয়ে তখুনি স'রে প'লেন সেখান থেকে।

যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মাকে ব'ললেন, "গন্ধর্ব্বেরা এই রাজ্যে বাস করে। তুমি বিরাট রাজকে আক্রমণ ক'রে কাজটা ভাল কর নি। তোমার ভাগ্য ভাল, তাই এ যাত্রা গন্ধর্ব্বের হাতে বেঁচে গেলে।"

যুধিষ্ঠিরের কথায় বিরাট ক্ষমা ক'রলেন সুশর্ম্মাকে। রাজার মুক্তির খবর রাজধানীতে পাঠান হ'ল।

এদিকে ভীষ্ম, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি রাজধানীর উত্তর দিক থেকে আক্রমণ ক'রে বিরাটের গোরুর দল নিয়ে যেতে লাগলেন। গোরুর ভার ছিল যাদের ওপর, তারা ছুটে গিয়ে এ খবর দিল রাজবাড়ি। তখন বিরাটের ছেলে উত্তর ছাড়া আর বড় কেউ নেই। বড় বড় বীর সব চ'লে গিয়েছে রাজার সঙ্গে সুশর্ম্মার বিরুদ্ধে লড়তে। উত্তর বড় ফ্যাসাদে প'লেন।

তিনি জোর গলায় ব'ললেন, যদি তিনি ভাল সারথি পান একজন, তবে অনায়াসে যুদ্ধে জয় ক'রে গোরু ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন। দ্রৌপদী এই কথা শুনে সোজা চ'লে গেলেন নাচ ঘরে। অর্জ্জুন তখন রাজ বাড়ির মেয়েদের নাচ গান শেখাচ্ছেন। দ্রৌপদী সঙ্কেতে জানিয়ে দিলেন কৌরবদের গোরু চুরির ব্যাপারটা। ধরা প'ড়ে যাবার ভ'য়ে অর্জ্জুন যুদ্ধে যেতে রাজি নন। কিন্তু দ্রৌপদীর অনুরোধ এড়ান তাঁর দায় হ'ল। অগত্যা অর্জ্জুন উত্তরের সারথি হ'তে রাজি হ'লেন। অর্জ্জুন যখন যাচ্ছেন, তখন উত্তরা আব্দার ক'রে অর্জ্জুনকে ব'ল্‌লেন "আমার পুতুলের জন্যে রাজাদের পোষাক থেকে রঙ, বেরঙের কাপড় এনে দিতে হবে কিন্তু।"

অর্জ্জুন উত্তরের রথ চালিয়ে দিলেন কুরুসৈন্যের দিকে। হাওয়ার চেয়ে জোরে চলেছে রথ। যাবার পথে অর্জ্জুন ব'ললেন উত্তরকে, "যুদ্ধ জয় না ক'রে রাজধানীতে ফেরা হবে না।"

সমুদ্রের মত কুরু সৈন্য দেখে উত্তরের হ'ল বিষম ভয়। তিনি ফিরে যেতে চান রাজধানীতে? তা কেমন ক'রে হয়! অর্জ্জুনের পণ, রণ জয় না ক'রে ফেরা হবে না। উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে পালাতে গেলেন। অর্জ্জুন ধ'রে ফেল্‌লেন তাঁকে। অর্জ্জুন ব'ললেন, "তোমার ভয় কি? তুমি সারথি হও, আমি যুদ্ধ ক'রে তোমাদের গোরু উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি।"

অর্জ্জুন রথের মুখ ফিরিয়ে চ'লে এলেন শাঁই গাছের তলায়। এখানেই র'য়েছে যে তাঁদের সব অস্ত্র শস্ত্র। অর্জ্জুনের কথায় উত্তর গাছে উঠে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, তূণ, শঙ্খ, আরও নানান অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি অস্ত্রের শোভা দেখে একেবারে থ' হ'য়ে গেলেন।

অর্জ্জুন নিজের আর সব ভাইদের পরিচয় দিলেন উত্তরকে, আর তাঁকে ব'লে দিলেন, তিনি যেন তাঁদের পরিচয় কারো কাছে ব'লে না বেড়ান।

অর্জ্জুন স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কপিধ্বজ রথ শন্ শন্ ক'রে নেমে এল। অর্জ্জুন রীতিমত যুদ্ধের সাজে চ'ড়ে ব'সলেন রথের ওপর। তারপর তিনি তাঁর গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়ে তাঁর শাঁক বাজিয়ে দিলেন। সেই শাঁকের আওয়াজে উত্তর ত অজ্ঞান। চেষ্টা ক'রে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে এনে অর্জ্জুন ব'ললেন "একটা শাঁকের শব্দে তোমার এত ভয়, তুমি যুদ্ধের জায়গায় হাজার হাজার রকমের শব্দ শুনে ঠিক থাক্‌বে কি ক'রে ?"

অর্জ্জুনের বিখ্যাত দেবদত্ত শাঁকের আওয়াজ শুনে কৌরব পক্ষের আর বুঝতে দেরি হ'ল না যে, অর্জ্জুনই এসেছেন যুদ্ধ ক'রতে তাঁদের সঙ্গে। সবাই মিলে তখন দুর্যোধনকে সাবধানে রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রলেন। কর্ণ এক লহমায় অর্জ্জুনকে হারিয়ে দেবেন ব'লে জাহির ক'রলেন।

কার কত জোর এই নিয়ে যখন চ'লেছে তর্ক বিতর্ক কৌরবদের মধ্যে তখুনি অর্জ্জুন হাজির হ'লেন স্বশরীরে।

অর্জ্জুন সৈন্যের মধ্যে দুর্যোধনকে দেখেন না ! যা'হ'ক আগে গোরুর দল উদ্ধার করা দরকার। তার পর যা করার আছে, করা যাবে, মনে করে অর্জ্জুন ছুড়ে দিলেন দুটো বাণ। বাণ দুটো গিয়ে প্রণাম জানাল গুরু দ্রোণের চরণে। দ্রোণের বাণ এসে অর্জ্জুনের মাথায় চুমো দিয়ে মাটীতে গেল প'ড়ে।

আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কৌরবদের সব অত্যাচার নতুন ক'রে জাগল অর্জ্জুনের প্রাণে। তিনি খুব বেগে রণ সুরু ক'রে দিলেন। কপিধ্বজ রথ কৌরব সেনার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। অর্জ্জুনকে দেখে ভীষ্মের ভারি আনন্দ।

দুপক্ষে এত বাণ ছোড়া হল যে, সূর্য্য একেবারে ঢাকা প'ড়ে গেল। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের কী আওয়াজ ! রথের সাদা ঘোড়া চারটে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল। রথের মাথায় ব'সে হনুমান এমন চেঁচিয়ে উঠলেন যে, সেই শব্দে

যে সৈন্যেরা গোরুগুলো ঘিরে ছিল, তারা দিক্ বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। গোরুগুলো ছাড়া পেয়ে ছুটল রাজধানীর গোশালায়। রাখালেরা সে গুলোকে যত্ন ক'রে রেখে দিল।

এইবার বাধল আসল লড়াই। অর্জ্জুন যেন সাক্ষাৎ যম। তাঁকে যুদ্ধে পেরে না উঠে, কর্ণ রণে ভঙ্গ দিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিও অর্জ্জুনের যুদ্ধের বেগ সামলাতে না পেরে সরে গেলেন। এইবার নিরানব্বই ভাইকে নিয়ে যুদ্ধে এলেন দুর্যোধন। অর্জ্জুনের বাণে ঘা খেলেন তাঁরা বিস্তর, তবু যুদ্ধ ছাড়েন না। অর্জ্জুন দেখলেন, কৌরবদের না মেরে ফেললে তাঁরা যুদ্ধ ছাড়বেন না। কিন্তু তিনি ত যুধিষ্ঠিরের হুকুম পান নি। তিনি তখন আর কি করেন! তিনি সম্মোহন বাণে সকলকে অজ্ঞান ক'রে ফেললেন, পরে উত্তরকে ব'ললেন "উত্তর যাও, দ্রোণাচার্য্য আর ভীষ্মদেব ছাড়া সকলের পোষাক থেকে কাপড় নিয়ে এস। তোমার বোন্ উত্তরা এই কাপড় তার পুতুলকে পরাবে ব'লেছে।"

অর্জ্জুনের কথা মত কাজ হ'ল।

গোরু উদ্ধার করার কথা, তা হ'য়েছে; কাজেই অর্জ্জুন ফিরে এলেন শাঁই গাছের তলায়। আগেকার মত সব অস্ত্র গাছে তুলে রেখে ফিরে গেলেন রাজবাড়ি।

এ যুদ্ধ জয়ের খবর রাজার কাণে গিয়েছে। তাঁর ধারণা উত্তরই যুদ্ধ জয় ক'রেছে। আনন্দে তাঁর হৃদয় নাচছে। তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাশা খেলতে চাইলেন।

যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "পাশা খেলায় পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের হাতে বড় কষ্ট পেয়েছেন। এটা না খেলাই ভাল, বিশেষ ক'রে বেশী আনন্দের সময় পাশা খেলায় ভাল মনও বসে না।"

উত্তর যখন কৌরবদের হারিয়ে দিয়েছেন, তখন বোঝাই গিয়েছে তাদের কত জোর, তাই তিনি ব'ললেন, "ভারি ত জোর দুর্যোধনের, তার হাতে আবার হ'ল পাণ্ডবদের লাঞ্ছনা। এইত আমার ছেলে উত্তর দুর্যোধনের বিষ দাঁত দিল ভেঙে।

যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "বৃহন্নলা না থাকলে, তা কখনো সম্ভব হ'ত না।"

বিরাট বৃহন্নলার নামে জ্ব'লে উঠ্লেন। রাগের মাথায় বিরাট পাশা ছুড়ে মেরে দিলেন যুধিষ্ঠিরের নাকে। নাক থেকে দরদর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগল। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি এসে একটা বাটীতে ঐ রক্ত ধ'রে ফেললেন, এক ফোটা রক্তও প'ড়তে দিলেন না মাটীতে।

উত্তর এসে যুধিষ্ঠিরের অবস্থা দেখে পিতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, বৃহন্নলা যুদ্ধ জয় করেছেন, এই কথা কঙ্কের মুখে শুনে তিনি রাগে পাশা ছুড়ে মেরে দিয়েছেন তাঁর নাকে।

উত্তরের দুঃখ হ'ল, তিনি ব'ললেন, "দ্বিজ কঙ্ক ঠিকই ব'লেছেন। যুদ্ধ জয় ক'রেছেন বৃহন্নলা, আর আমি চালিয়েছি তাঁর রথ।"

বিরাট অনুতাপ ক'রে কঙ্কের কাছে ক্ষমা চাইলেন। যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "আমি আগেই ক্ষমা ক'রেছি আপনাকে। দেখছেন না, আমার রক্ত ধরা হ'য়েছে এই পাত্রে। আমার রক্ত যেখানে পড়বে, সেখানে আর কিছু থাক্বে না, সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে।"

সে দিন রাতে যখন রাজবাড়ির প্রায় সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছে, তখন পাণ্ডবেরা আর দ্রৌপদী এক জায়গায় মিললেন। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে শুন্লেন যুদ্ধের সব কথা। তাঁর ভয় হ'ল, অজ্ঞাত বাস শেষ হবার আগেই বা অর্জ্জুন ধরা প'ড়ে গেলেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি সহদেবকে ব'ললেন, "দেখ ত ভাই, অজ্ঞাত বাস আমাদের শেষ হ'ল কিনা।"

সহদেব গুনে ব'ললেন, "অজ্ঞাত বাস শেষ হ'য়ে গিয়েছে।"

এই কথায় সকলেরই বেশ স্ফুর্ত্তি হ'ল।

আষাঢ় মাস পূর্ণিমার দিন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ ক'রে দ্রৌপদীকে নিয়ে ব'সলেন বিরাটের সিংহাসনে। ভীম সোনার ছাতা ধ'রলেন যুধিষ্ঠিরের মাথায়। নকুল আর সহদেব পিছনে দাঁড়িয়ে দুধের মত শাদা চামর নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বাতাস ক'রতে লাগ্‌লেন আর অর্জ্জুন রইলেন সিংহাসনের সাম্‌নে হাত জোড় ক'রে।

এই না দেখে, মন্ত্রীরা গিয়ে বিরাট রাজকে দিল খবর। বিরাটের সিংহাসনে ব'সেছেন দ্বিজ কঙ্ক! বিরাটের কি রাগ! তিনি রাগে গরগর ক'রতে ক'রতে অনেক লোক জন আর উত্তরকে নিয়ে এলেন রাজ সভায়। উত্তর এসেই প্রণাম ক'রলেন, যুধিষ্ঠিরকে। কারণ কি কিছুই বোঝেন না বিরাট। তখন উত্তর একে একে সবার পরিচয় জানিয়ে দিলেন। আনন্দে বিরাটের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে প'ল। তিনিও সটাং শুয়ে প'লেন সিংহাসনের নীচে।

এমন বংশের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছা হ'ল বিরাটের। অর্জ্জুনই লড়াই ক'রে যখন তাঁর মুখ রেখেছেন, তখন অর্জ্জুনের সঙ্গে তিনি উত্তরার বিয়ে দিতে চাইলেন। অর্জ্জুন নিজের মেয়ের মত যাকে এত দিন নাচ গান শিখিয়েছেন, তাকে কি তিনি বিয়ে ক'রতে পারেন! তিনি ব'ললেন, "আমার ছেলে অভিমন্যুর সঙ্গে হবে উত্তরার বিয়ে। তাই ঠিক হয়ে গেল।

উত্তরার বিয়ে। মৎস্য রাজ্যে আনন্দের স্রোত বইল। বিয়ের খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর পাণ্ডবদের বন্ধু রাজারা এলেন বিয়েয় যোগ দিতে। খুব ধূম ধামে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে হ'য়ে গেল।

# উদ্যোগ পর্ব্ব

—:০:—

বার বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাত বাস ত শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এখন রাজ্য ফিরিয়ে পাওয়া যায় কেমন ক'রে, তাই নিয়ে পাণ্ডবেরা রাজাদের সঙ্গে আলাপ ক'রছেন। নিজের নিজের বুদ্ধি মত মত্ জানাতে লাগলেন সকলে। যখন কথা হ'ল দূত পাঠিয়ে রাজ্য চেয়ে নেওয়াই ভাল দুর্যোধনের কাছে, তখন ভীমের হ'ল বড় রাগ। তিনি ব'ললেন, "আপনারা কি মনে করেন, দুষ্ট দুর্যোধন দেবে শুধু শুধু রাজ্য ছেড়ে? যুদ্ধ যখন হ'বেই, তখন দূত পাঠিয়ে ছোট হ'তে যাই কেন?" অর্জ্জুন দাদার কথায় সায় দিলেন।

যুধিষ্ঠির বড় ভাল লোক, আর দুর্যোধনের ওপর তাঁর ভালবাসাও কম ছিল না। তিনি অনেক ক'রে ভীম আর অর্জ্জুনকে বুঝিয়ে পুরোহিত ধৌম্যকে পাঠালেন হস্তিনায়।

ধৌম্য হস্তিনা নগরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের কথা জানালেন। ধৃতরাষ্ট্রও যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে বোঝালেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন একেই ত দুষ্ট, তার ওপর তাঁকে মতলব দেবার লোকের অভাব নেই। কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি তাঁকে যুদ্ধের দিকেই টানতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের কোন আব্দার শুনবেন না, সঞ্জয়কে পাঠিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

এদিকে দুর্যোধন গোপনে গোপনে তাঁর বন্ধু রাজাদের খবর পাঠিয়ে দিলেন যুদ্ধের জন্যে তৈরি হ'তে ব'লে। তাঁরাও সবাই দুর্যোধনের কথা রাখ্‌তে রাজি হ'লেন।

সঞ্জয়ের মুখে যুধিষ্ঠির যা শুনলেন, তা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, যুদ্ধ হবেই হবে। তাই তিনিও নিজের বন্ধু রাজাদের সাহায্য চেয়ে লোক পাঠালেন তাঁদের কাছে।

যুদ্ধের সাহায্যে যোগ দিলেন রাজারা তাঁদের এগার অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে, আর যুধিষ্ঠির পেলেন বন্ধুদের কাছে সাত অক্ষৌহিণী সেনা।

দুর্যোধনের দলে কথা উঠ্‌ল শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করতে। দুঃশাসনের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ মোটেই বীর নন। তিনি জরাসন্ধের কাছে বার বার হেরে গিয়ে পালিয়ে গেলেন দ্বারকায়! তাঁকে আবার নিমন্ত্রণ! তবুও কর্ণের কথায় দুর্যোধন উলূককে দূত ক'রে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ আগেই হ'তে চেয়েছেন অর্জ্জুনের সারথি, তাই তিনি দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ নিতে পারলেন না। উলূক হস্তিনায় ফিরলে, তাঁর মুখে শোনা গেল এই কথা। তা হ'লেও দুর্যোধন একবার নিজে যাবেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ বু'ঝলেন, দুর্যোধন আর অর্জ্জুন দুজনেই আসছেন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রতে। তিনি একখান খুব ভাল সিংহাসন রেখে দিলেন তাঁর বিছানার মাথার দিকে।

শ্রীকৃষ্ণ ঘুমুচ্ছেন নিজের ঘরে। দুর্যোধন এসেই ব'সে প'লেন সিংহাসনটার ওপর, আর অর্জ্জুন এসে শ্রীকৃষ্ণের বিছানায় ব'সলেন তাঁর পায়ের কাছে। শ্রীকৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গল। তিনি উঠেই অর্জ্জুনের গলা জড়িয়ে ধ'রলেন আনন্দে। অর্জ্জুন জানালেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে সারথি হবার জন্যে জানিয়েছেন তাঁকে, শ্রীকৃষ্ণ নিমন্ত্রণ নিয়ে যেমন ফিরেছেন, অমনি তাঁর চোখ প'ল দুর্যোধনের দিকে। শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "আজ বড় ভাগ্যে তোমার দেখা পেলাম। তোমার আসার কারণটা জানতে পারি কি ?"

দুর্যোধন ব'ললেন, "আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। তুমি যুদ্ধে আমার পক্ষে সারথি হবে, আশা ক'রে এলাম তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রতে।"

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "দেখলেইত, আমি আগেই অর্জ্জুনের নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছি। আমায় নিয়েই বা কি ফল ? আমি ত যুদ্ধে অস্ত্র ধ'রব না। আমার বদলে আমার নারায়ণী সেনা চাও ত দিতে পারি।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন অস্ত্রই ধ'রবেন না তখন তাঁকে নিয়ে কি লাভ। দুর্যোধন নারায়ণী সেনা নিয়ে হস্তিনায় ফিরে গেলেন।

এত জোর যে নারায়ণী সেনার, তাই পেলেন কিনা দুর্যোধন! দুঃখে অর্জ্জুনের মুখখানা কালো হ'য়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরে ব'ললেন, "ভাই, কিছু দুঃখ ক'র না। তাদের যত জোরই থাক্, তারা ম'রবে তোমার হাতে। শোন তাদের কথা তোমায় বলি। একদিন আমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা জানালেন মগধ রাজ্যে মৃগয়া করে সেই মাংসে তাঁদের শ্রাদ্ধ করা হোক্। কাজেই মৃগয়া ক'রতে একাই চ'লে গেলাম জরাসন্ধের রাজ্য মগধে। জরাসন্ধের সৈন্যেরা আমায় ঘিরে ফেলল। যত সেনা মারি, ততই যেন বেড়ে যায়। তখন কি করি। আমি আমার দেহটা খুব বাড়িয়ে ফেললাম, আর আমার গা থেকে পিল পিল ক'রে বেরিয়ে এল নারায়ণী সেনার দল। তাদের হাতে হেরে গেল জরাসন্ধ। তখন মৃগয়া সেরে নিয়ে নারায়ণী সেনা সঙ্গে ক'রে দ্বারকায় চ'লে এলাম। দ্বারকায় এসে তাদের বর দিতে চাইলে তারা ব'লল, "প্রভু, যদি আমাদের বর দিতে চান, তবে বর দিন, আপনার মত রূপ যাঁর, তাঁর হাতেই যেন আমাদের মরণ হয়।" আমি ব'ললাম, "তাই হবে। রূপে ঠিক আমারই মত আছেন এক অর্জ্জুন! তাঁর হাতেই হবে তোমাদের মরণ।" তাই ভাই অর্জ্জুন, তুমি অনায়াসে মারতে পারবে নারায়ণী সেনাদের।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুনের মুখে হাসি ফুটল।

অর্জ্জুনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিরাট নগরে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে খুব আদর জানালেন।

জ্ঞাতিদের মারতে যুধিষ্ঠিরের একটুও ইচ্ছা নেই। তখনও তিনি যুদ্ধ বন্ধ ক'রতে চাইছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনেক বোঝালেন। ভীম আর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে রাগ ক'রে ব'ললেন, "যুদ্ধ ছাড়া যখন কিছুতেই দুর্যোধন রাজ্য ছেড়ে দেবে না, তখন তাদের সব মেরে রাজ্য কেড়ে নেওয়াই উচিত।"

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, "ভাই কৃষ্ণ, তুমি যখন এসেছ, তখন একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ। তুমি হস্তিনায় গিয়ে দুর্যোধনের কাছে আমাদের জন্যে মাত্র পাঁচটা গ্রাম চেয়ে নাও। দুর্যোধন এতে রাজি না হ'লে যুদ্ধ করা যাবে।"

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনায় যেতে মানা ক'রলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চ'ললেন হস্তিনা নগরে।

শ্রীকৃষ্ণ আসছেন জেনে বিদুর তাঁকে আদর ক'রতে ব'ললেন ধৃতরাষ্ট্রকে। শ্রীকৃষ্ণকে যে আদরেই বশ করা যায়। বিদুরের কথা ধৃতরাষ্ট্র জানালেন ভীষ্ম প্রভৃতিকে।

দুর্যোধনের বড় অহঙ্কার। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অমন ক'রে সম্মান ক'রতে চান না। শেষে কিন্তু পিতার কথায় মত দিতে বাধ্য হ'লেন।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসতেই খুব আদর ক'রে তাঁকে রাজ সভায় নিয়ে এলেন দুর্যোধন। শ্রীকৃষ্ণকে উপহারও দেওয়া হ'ল অনেক। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তার একটাও ছুঁলেন না। অভক্তির দান ত শ্রীকৃষ্ণ নেন না! "পরের দিন, আবার দেখা হবে" ব'লে তিনি সাত্যকির হাত ধ'রে চলে গেলেন তাঁর পরম ভক্ত বিদুরের বাড়ি।

শ্রীকৃষ্ণ চ'লে গেলেই দুর্যোধন বন্ধুদের নিয়ে মতলব ক'রলেন, পরের দিন শ্রীকৃষ্ণ এলে তাঁকে বেঁধে কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হবে। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য না পেলে পাণ্ডবদের আর জোর থাকবে না।

বিদুর বাড়ি নেই, ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। কুন্তীদেবীর সঙ্গে দেখা হ'ল শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম ক'রলেন। কুন্তী অনেক দুঃখ জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

একটু পরে ভিক্ষা সেরে বিদুর ফিরে এসে দেখেন, অনেক আরাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর আশ্রমে। বিদুরের আনন্দের সীমা নেই। কাঁধের

ঝুলি ফেলেই বিদুর শ্রীকৃষ্ণের চরণে মাথা লুটিয়ে, চোখের জলে তাঁর চরণ ধুইয়ে দিলেন। এত ভক্তি না থাকলে কি শ্রীকৃষ্ণ রাজভোগ ছেড়ে অতিথি হন বিদুরের ?

শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বিদুরকে তুলে, কোলে নিয়ে ব'ললেন, "বিদুর, তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার ভক্তিতেই আমি বাঁধা।"

কুন্তী রেঁধেবেড়ে খাওয়ালেন শ্রীকৃষ্ণকে আর সাত্যকিকে। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ পেলেন বিদুর। খাওয়া হ'য়ে গেলে নানা কথায় তাঁদের সময় কাটছে। ভগবান্‌কে পেয়ে আজ ভক্তের কি আহ্লাদ!

বিদুর দুর্যোধনের মতলব টের পেয়েছিলেন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন, দুর্যোধন তাঁকে বেঁধে রাখতে চান।

পরের দিন শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় হাজির হ'লেন। সবাই এসে ব'সলে তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা পাড়লেন সভার মাঝে। ধৃতরাষ্ট্র অর্ধেক রাজ্য দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে ব'ললেন দুর্যোধনকে।

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "অর্ধেক রাজ্যও তাঁরা চান না, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থ, কুশস্থল, পাণ্ডবনগর, বারণাবত আর সিদ্ধিগ্রাম, শুধু এই পাঁচটা জায়গা পেলেই খুশি হবেন।"

দুর্যোধন বেস চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "সূর্য যদি পশ্চিমে ওঠেন, আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে সমুদ্রের বুকে, সাত সাগরের জল যদি শুকিয়ে যায়, আর ব্রাহ্মণ যদি গায়ত্রী জপ ছেড়ে দেন, তবু আমার প্রতিজ্ঞা, বিনা যুদ্ধে আমি সূচ পরিমাণ জমিও ছেড়ে দেব না পাণ্ডবদের।"

দুর্যোধনের এত অহঙ্কার! শ্রীকৃষ্ণ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললেন, "বড় গর্ব তোমার দুর্যোধন! এই গর্ব হবে তোমার ধ্বংসের কারণ। তোমার এত তেজ, তুমি বাঁধতে চাও আমাকে। মনে জেনো, আমি যদি

ইচ্ছা করি, তোমার সমস্ত রাজ্য শেষ ক'রে দিতে পারি এক নিমেষের ভেতর।"

শ্রীকৃষ্ণ আর বেশী কিছু না ব'লে খুব জোরে হেসে উঠলেন। তাঁর চোখ দুটো হ'ল লাল টকটকে, আর সারা গায়ে ছেয়ে পড়ল তাঁর রাগ। তাঁর দেহে ফুটে উঠল স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দিব্যদৃষ্টি পেয়ে সবাই দেখলেন, তাঁর পেছনে তেত্রিশ কোটি দেবতা, নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, বুকে নারদ, চোখে একাদশ রুদ্র, আর সাম্নে স্তব করছেন অনন্ত বাসুকি। কী ভয়ঙ্কর রূপ! বিশ্ব চরাচর এক সঙ্গে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে। ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণের স্তব ক'রতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ফের নিজের রূপ ধ'রে অনেক বোঝালেন দুর্যোধনকে, দুর্যোধন কিন্তু কোন কথা শুনলেন না। অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে নিয়ে রাজ সভা ছেড়ে চ'লে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পথে দেখা পেলেন কর্ণের। তিনি কর্ণকে জানালেন, তিনি সূর্যের বরে কুন্তীর গর্ভেই জন্মেছেন। তিনি যদি পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যান, তবে যুধিষ্ঠির ভক্তি ভরে তাঁকেই ক'রে দেবেন রাজা।

কর্ণ সব শুনে একটু ভেবে ব'ললেন, "তা হয় না। লোকে জানে আমি রাধার ছেলে। এখন নিজেকে কুন্তীর ছেলে ব'লে চালিয়ে দেওয়া চ'লবে না। দুর্যোধনই বা ব'লবেন কী! যে দুর্যোধন আমার এত উপকার ক'রেছেন, তাঁকে ছেড়ে যেতে এখন আমি কিছুতেই পারব না।"

শ্রীকৃষ্ণ আর কি করেন! তিনি দুর্যোধনের মনের ভাব জানিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুদ্ধ যখন হবেই, তখন অপেক্ষা ক'রে লাভ কি! পাণ্ডবদের সৈন্যদল এগিয়ে গেল কুরুক্ষেত্রের দিকে।

কর্ণ যুদ্ধে যাচ্ছেন শুনে কুন্তী দেবীর বড় ভাবনা হ'ল। কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবেরা পেরে উঠবেন না কিছুতেই, এটা কুন্তী বেশ বুঝতে পারলেন।

কিন্তু কর্ণকে নিরস্ত করা যায় কি ক'রে! বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করার পর কুন্তী ঠিক ক'রলেন, তিনি নিজেই কর্ণের সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি যে তাঁরই এক ছেলে, তা জানিয়ে দেবেন তাঁকে।

সকাল বেলায় কর্ণ নদীতে স্নান সেরে সূর্যের পূজা ক'রছেন, কুন্তী সেখানে গিয়ে কর্ণকে সব কথা জানালেন আর তাঁকে ব'ললেন, "বাবা, তুমি আর পাঁচ ভায়ের সঙ্গে মিলে শত্রুদের মেরে সুখে রাজ্য ভোগ কর।"

কর্ণ মার কথায় রাজি হ'তে পারলেন না। এত দিন যদি তিনি জানতেন, তিনি কুন্তীরই এক ছেলে, তবে যা হয় একটা হ'তে পারত। কিন্তু এখন দুর্যোধনের মত বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়া হয় না। লোকের মধ্যে যে নিন্দা রটবে তা আর সইতে পারবেন না তিনি। বিশেষ ক'রে কর্ণের পণ, অর্জ্জুনের সাথে রণ। হয় কর্ণ না হয় অর্জ্জুন থাকবেন ধরণীর বুকে। এক সঙ্গে দুজনের থাকা চলবে না।

কুন্তী বুঝলেন সব, পরে বিনয়ের সুরে কর্ণকে ব'ললেন, "বাছা তোমার রাগ ত শুধু অর্জ্জুনের ওপর, তবে তুমি যেন আর কোন ভায়ের অনিষ্ট ক'র না।

কর্ণ উত্তর দিলেন, "কোন ভাবনা নেই আপনার। আপনার পাঁচ ছেলেই থাকবে, হয় অর্জ্জুনকে নিয়ে, নয় আমাকে নিয়ে, এটা বেদব্যাসের কথা। আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তাতে আমার মনে হয় আমারই মরণ আছে অর্জ্জুনের হাতে।

কর্ণ আর কোন কথা ব'লতে পারলেন না, তাঁর মনের মধ্যে চ'লেছে তখন এক অস্বস্তির ঝড়। তিনি কুন্তীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বিদায় নিলেন। কুন্তী দেবী বিদুরকে সব কথা খুলে ব'ললেন।

মহাবীর ভীষ্ম কৌরব আর পাণ্ডব পক্ষের বীরদের কার কত জোর ঠিক ক'রতে গিয়ে কর্ণকে অর্ধরথ ব'লে ফে'ললেন। কর্ণ ভীষ্মের ওপর চ'টে গিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, ভীষ্মের অধীনে ত নয়ই, এমন কি ভীষ্ম বেঁচে থাকতেও তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্র ধ'রবেন না। কর্ণের কথা নড়চড় হবে না, দুর্য্যোধনের মনে কষ্ট হ'লেও তিনি কর্ণকে আর অনুরোধ ক'রলেন না।



# ভীষ্মপর্ব্ব।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের মত নিয়ে ভাল সময় দেখে পাণ্ডব সৈন্যের দল যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রে প্রস্তুত হ'ল। পাণ্ডব পক্ষের বীরেরা নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে ক'রছেন আস্ফালন। ভীমের গদাটা দেখাচ্ছে যেন যমের দণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য আর অর্জ্জুন দেবদত্ত শাঁখ বাজিয়ে দিলেন। সৈন্যেরা দাঁড়াল পূর্ব্ব মুখো হ'য়ে।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি আর মঘা নক্ষত্রে কৌরব সৈন্য যুদ্ধ যাত্রা ক'রে কুরুক্ষেত্রে পশ্চিম মুখো হ'য়ে দাঁড়াল। কৌরব পক্ষের বীরেরা অস্ত্র নিয়ে তৈরি। ভেরী, তুরী, ঢাক, ঢোলের শব্দে চারিদিক ভ'রে গেল। এত গোলমাল, কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। হঠাৎ ভারি অমঙ্গল দেখা দিল হস্তিনাপুরে। প্রকৃতির সবই যেন ওলট পালট হ'য়ে গিয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র বড় কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন, কি জানি কি হয় ভেবে। বেদব্যাস যুদ্ধ দেখবার জন্যে ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য দৃষ্টি দিতে চাইলেন, তিনি তা নিলেন না। তাই সঞ্জয়কে বাহাল করা হ'ল যুদ্ধের খবর দেবার জন্যে।

কৌরব পক্ষের সেনাপতি হ'লেন ভীষ্ম। তিনি দুর্য্যোধনকে ব'ললেন, "যুদ্ধে গোটাকতক নিয়ম বেঁধে দিতে চাই আমি। প্রথম—অন্যায় যুদ্ধ আমি করতে দেব না, দ্বিতীয়—যার হাতে অস্ত্র থাকবে না, বা যে যুদ্ধ ছেড়ে পালাবে, তাকে মারা হবে না, তৃতীয়—লড়াই হবে একা একা, চতুর্থ—রথে রথে, হাতীতে হাতীতে, ঘোড়ায় ঘোড়ায়, পদাতিকে পদাতিকে হবে লড়াই। এই আমার নিয়ম, অমত ক'রলে চ'লবে না।"

ভীষ্মকে সেনাপতি হ'তে শুনে যুধিষ্ঠিরের হ'ল ভারি ভয়। পরশুরাম

যাঁকে যুদ্ধে আঁটতে পারেন নি, এহেন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ করা কি সহজ কাজ! যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের কথা জানালেন।

অর্জ্জুন ব'ললেন "দাদা শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার সারথি তখন আমাদের হারাতে পারেন, এমন বীর ত দেখিনে।"

যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে ভীষ্ম, দ্রোণ আর কৃপাচার্যের আশীর্ব্বাদ নিতে গেলেন কৌরব সৈন্যের ভিতরে। তাঁরা তিন জনই আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'ললেন, "তুমি ধর্ম্মের রক্ষক, আর শ্রীকৃষ্ণ তোমার পক্ষ, কাজেই তোমার জয় হবেই হবে।"

যুধিষ্ঠির কৌরব সৈন্যের মধ্যে আসায় একটা মুস্কিল হ'ল। দুর্যোধনের এক ভাই নাম তাঁর যুযুৎসু, এক লাখ সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চ'লে গিয়ে তাঁর পক্ষে যোগ দিলেন।

যুযুৎসুর এই কাজে দুর্যোধনের মন একটু খারাপ হ'ল। ভীষ্ম ব'ললেন্ "যুযুৎসু বোধ হয় ভয় পেয়ে চ'লে গেল। আমি আছি, তোমার ভাবনা কি? আমি যখন তোমার সেনাপতি, তখন দেবতারা যুঝতে এলেও আমি সহজে ছাড়ব না। প্রতিজ্ঞা অটুট রেখে আমি কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাও ভেঙ্গে দেব।"

দুর্যোধন বেশ আনন্দ পেয়ে ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আচ্ছা বলুন ত, এই যুদ্ধে যত বীর জড় হ'য়েছেন, এঁদের মধ্যে কে, কতক্ষণে এই সব সৈন্য মেরে ফেলতে পারেন।"

ভীষ্ম ব'ললেন, "আমি এই সৈন্য মারতে পারি একদিনে, দ্রোণ তিন দিনে, কর্ণ প্রাণপণে ল'ড়ে পাঁচ দিনে, অশ্বত্থামা তিন দণ্ডে, আর অর্জ্জুন ইচ্ছা ক'রলে এক নিমেষে সব সেনা শেষ ক'রে দিতে পারেন।"

তবেই হয়েছে! দুর্যোধনের প্রাণ আঁতকে উঠল।

ভীষ্ম ব'ললেন, "আমি দশদিনের যুদ্ধের ভার নিলাম। নিজেদের সৈন্য বাঁচিয়ে রেখে পাণ্ডবপক্ষের দশ হাজার রথীর প্রাণ নেব রোজ।"

যুদ্ধ বাধে বাধে অবস্থা। দু'পক্ষই অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কার সঙ্গে ল'ড়তে হবে জানা দরকার, তাই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে রথ নিয়ে দাঁড়াতে ব'ললেন দুদল সেনার মাঝে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা মত কাজ ক'রলেন।

কি সর্ব্বনাশ! জ্ঞাতি, বন্ধু আত্মীয়দের মারতে হবে অর্জ্জুনের। অর্জ্জুন ভেঙ্গে প'ড়লেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল, গায়ের লোম সব খাড়া হ'য়ে উঠল, হাত থেকে খ'সে প'ল তাঁর গাণ্ডীব। অর্জ্জুন যুদ্ধ করতে একেবারেই নারাজ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনে বল দেবার ইচ্ছায় ব'ললেন,—

"উত্তিষ্ঠ বর্জ্জিয়া ক্লৈব্য পার্থ, ইহা তব যোগ্য নয়।
ছাড় তুচ্ছ কাতরতা, মহাবীর, কর রণ জয়॥

কিন্তু বৃথা হ'ল। তিনি বোঝালেন ত কে কাকে মারতে পারে অর্জ্জুন? আত্মার জন্ম নেই, মরণ নেই। নিজের কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারো। ভগবানই সব করেন, মানুষ উপলক্ষ মাত্র।"

অর্জ্জুন তবুও বোঝেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহে ব্রহ্মাণ্ডের ছবি দেখালেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুন দেখ্‌লেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভেতর র'য়েছে বিশ্ব চরাচর, আর ম'রে প'ড়ে র'য়েছে কুরুক্ষেত্রের সমস্ত সেনা। এই সব দেখে অর্জ্জুন বড় লজ্জা পেলেন, ভয়ও তাঁর কম হ'ল না। তিনি চোখ বুঁজে সুরু ক'রলেন শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

শ্রীকৃষ্ণ এই ভয়ানক রূপটা লুকিয়ে ফেলে অর্জ্জুনকে চোখ খুলতে ব'ললেন। এখন অর্জ্জুন আর মুসড়ে পড়া অর্জ্জুন নয়। তিনি খুব উৎসাহে গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হ'লেন।

যুদ্ধ লেগে গেল দু'পক্ষে। ভীষ্মের সঙ্গে লড়তে এলেন অর্জ্জুন। দু'জনেই দু'জনের বাণ কাটতে লাগলেন। ভীমের সঙ্গে দুর্যোধন, সাত্যকির সঙ্গে

কৃতবর্ম্মা, নকুলের সঙ্গে দুঃশাসন, ঘটোৎকচের সঙ্গে অলম্বুষ। এই রকমে একের সঙ্গে একের যুদ্ধ বেধে গেল। চারিধারেই 'মার মার' শব্দ। শেল, শূল, মুষল, পরিঘ, গদা, ত্রিশূল আর বাণে বাণে গগন ছেয়ে গেল। দেবতারাও যেন কাঁপতে লাগ্‌লেন আকাশে। অভিমন্যুর তেজে কুরুসৈন্য অস্থির। তিনি কাউকেও ছাড়েন না। কারো রথ্, কারো ধ্বজা, আর কারো বা ধনুক কেটে ফেলে দিচ্ছেন মাটীতে। নকুলের হাতে নাকাল হ'লেন দুঃশাসন।

অর্জ্জুনের সঙ্গে ভীষ্মের কি ভীষণ রণ। আগুনে আগুনে চ'লেছে ঠোকা ঠুকি। ভীষ্ম রাগের মাথায় ছুড়ে দিলেন পরশুরামের অস্ত্র, পৃথিবী কেঁপে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুন তা কেটে দিলেন ইন্দ্রবাণে।

ভীমের দাপটে রণস্থলে পড়ে গিয়েছে হুলস্থুল। অর্জ্জুন অবাক্ হ'য়ে তাই দেখ্‌ছেন। এই সুযোগে ভীষ্ম পাণ্ডব পক্ষের দশ হাজার রথী মেরে প্রথম দিনের যুদ্ধ ক'লেন শেষ।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে সেনাপতি হ'লেন বিরাটের ছেলে শঙ্খ, আর সারথি হ'লেন সাত্যকি। বিরাটের ভারি আনন্দ। এত বড় যুদ্ধে সেনাপতি হ'লেন তাঁর ছেলে! শ্রীকৃষ্ণের মতেই এ রকম ব্যবস্থা হ'ল। অর্জ্জুন সেনাপতি হ'লে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতেই তাঁর সময় ব'য়ে যায়, কৌরব পক্ষের সৈন্য মারা আর তাঁর ঘটে না।

শঙ্খের সঙ্গে ভীষ্মের লড়াই চ'লেছে, আর এদিকে অর্জ্জুন মনের সাধে হাজার হাজার কুরু সৈন্যকে যমের বাড়ির অতিথি ক'রে দিচ্ছেন। দুর্য্যোধন দৌড়ে এলেন অর্জ্জুনকে বাধা দিতে। দুর্য্যোধনের সাধ্য কি! অর্জ্জুনের বাণ খেয়ে পালিয়ে যেতে হ'ল দুর্য্যোধনকে। তার পর এলেন ভীষ্ম।

শল্যের বাণে প্রাণ হারালেন উত্তর। বিরাট, ছেলের মৃত্যুর শোধ

নেবার জন্যে সমস্ত জোর দিয়ে আক্রমণ ক'রলেন শল্যকে। উভয় পক্ষের অনেক বীর জীবন দিলেন।

দ্রোণ ভীষ্মের জায়গায় লড়াই ক'রতে লাগ্‌লেন শঙ্খের সঙ্গে। শঙ্খের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দ্রোণের কঠিন হ'য়ে উঠল। তিনি বেগতিক দেখে ছুড়ে দিলেন ব্রহ্ম অস্ত্র। অস্ত্র ছুটেছে যেন আগুনের হল্‌কা। আগুনের তাপে চারধার জ্বলে যেতে লাগল। সাত্যকি শঙ্খকে নিয়ে স'রে যেতে চাইলেন, শঙ্খ অস্ত্রের ভয়ে পালাতে রাজি নন। ভাল ভাল বাণ ছুড়ে শঙ্খ চাইলেন ব্রহ্ম অস্ত্র রোধ করতে, কিন্তু পারলেন না কিছুতেই। তখন তিনি তাঁর বুক পেতে দিলেন ব্রহ্ম অস্ত্রের সাম্‌নে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভস্ম হ'য়ে গেলেন।

ভীষ্ম রথী মারবার ফাঁক খুজে পাচ্ছেন না। অর্জ্জুন যেমন ব্রহ্ম অস্ত্রের তেজ দেখ্‌তে লাগলেন, অমনি ভীষ্ম দশ হাজার রথী মেরে তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন। সন্ধ্যা হ'ল, সকলে শিবিরে ফিরে গেলেন।

তৃতীয় দিন সকাল বেলায় ভীষ্ম গরুড় ব্যূহ রচনা ক'রে নিজে রইলেন সকলের আগে। অর্জ্জুন গ'ড়লেন অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ। সৈন্যের গোলমালে কুরুক্ষেত্র মেতে উঠল। দু পক্ষ থেকেই নারাচ, ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র ছোড়া চ'লেছে। অস্ত্রে অস্ত্রে লেগে যে আগুন বেরুচ্ছে, তাতে মনে হ'চ্ছে, আকাশে যেন হাজার হাজার বিদ্যুৎ খেলে বেড়াচ্ছে। যত অস্ত্র এসে প'ড়ছে অর্জ্জুনের ওপর। তিনি তাড়াতাড়ি সে সব রুখে দিচ্ছেন। কিন্তু অর্জ্জুনের বাণ ঠেকিয়ে রাখা কৌরব পক্ষের দায় হ'য়ে প'ল। লাখ লাখ সৈন্য মার খেতে লাগল কৌরব পক্ষে। ভীম দুর্যোধনকে এমন মার দিলেন যে, দুর্যোধন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন রথের ওপর। সারথি তার রথ সরিয়ে নিল।

ঘটোৎকচ আর অভিমন্যু মিলে যে যুদ্ধ স্বরু ক'রলেন তাতে বুঝি আর

কৌরব সেনা থাকে না! দুর্যোধন জ্ঞান ফিরে পেয়ে অভিমানের সুরে ভীষ্মকে ব'ললেন, "আপনি থাকতে বিনা হ'চ্ছে আমার সৈন্যের এমন দুর্গতি।"

দুর্যোধনের কথায় হ'ল ভীষ্মের রাগ। তিনি ব'ললেন, "যখন তোমায় মানা ক'রেছিলাম, তখন শোননি। এখন আমার মত বুড়ো লোকের ওপর এত জুলুম কেন? আমি ত আমার সব জোর দিয়েই যুদ্ধ করছি, কিন্তু কোন ফলই হ'চ্ছে না। আর কি ক'রতে পারি বল?"

ভীষ্ম আবার প্রাণপণে লড়াই সুরু ক'রে দিলেন। ভীষ্মের বাণের চোটে পাণ্ডব সেনারা পালিয়ে যেতে চায়, অর্জ্জুন তা দেখে ভীষ্মকে বাধা দিতে এলেন, বিপুল বিক্রমে। অর্জ্জুন আর পারেন না, শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসে উৎসাহ পেয়ে অর্জ্জুন খুব ভাল ভাল বাণ ছুড়তে লাগলেন।

ভীষ্ম বাণে বাণে অর্জ্জুনের রথ দিলেন ঢেকে। অর্জ্জুন তখন ইন্দ্রবাণে ভীষ্মের সারথির মাথা কেটে ফেললেন। অর্জ্জুন ভীষ্মকে থামাতে ঘেমে উঠলেন। যেমন তিনি কপালের ঘাম মুছতে গেলেন, অমনি ভীষ্ম দশ হাজার রথী মেরে ফেললেন। এই রকমে শেষ হ'ল তৃতীয় দিনের যুদ্ধ।

আজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্থ দিন, দু'পক্ষই প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ নিয়ে এলেন ভীষ্মের সামনে। ভীষ্ম আর অর্জ্জুনে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। সুশর্ম্মা ঢুকে প'লেন পাণ্ডব সেনার মাঝখানে। সুশর্ম্মার বাণে অনেক সৈন্যের প্রাণান্ত হ'ল। ভীম এগিয়ে এলেন গদা নিয়ে সুশর্ম্মাকে বাধা দিতে। একেবারে দশ হাজার রথী ঘিরে ফেলল ভীমকে। ভীম গদা মেরে দুশ রথীর দফারফা ক'রে দিলেন। ভীমের দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই, রথ দিয়ে রথ ভাঙ্গছেন, হাতী দিয়ে হাতী মারছেন। তিনি সামনে যাকে পাচ্ছেন, তাকেই গদার বাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন চিরকালের মত। ভীমের ভয়ে সুশর্ম্মা পালিয়ে বাঁচলেন।

দুর্যোধন চাইলেন ভীমকে বাধা দিতে। ভীম চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই এক বাণে কাটলেন দুর্যোধনের রথের ঘোড়া, আর এক বাণে কাটলেন তাঁর সারথির মাথা। ভীষ্ম দুর্যোধনকে ভীমের হাত থেকে বাঁচাতে বড় বড় বীরকে পাঠিয়ে দিলেন।

ভগদত্ত নিজের নামজাদা হাতীটা দিলেন ছেড়ে। ভীম কিছুতেই রুখ্‌তে পারেন না হাতীটাকে, তাই দেখে ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ মায়ার দ্বারা তৈরি ক'রে ফেলল আটটা জোয়াল হাতী, ঘটোৎকচ নিজে যে হাতীটায় চ'ড়ে বসল সেটা যেন ঠিক্ ঐরাবত। সে তখন এই হাতীটাকে টুইয়ে দিল ভগদত্তের হাতীর দিকে! ভগদত্তের হাতীটার জারিজুরি আর খাটল না, সেটা তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

অলম্বুষের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ঘটোৎকচের। দুজনেই রাক্ষসী মায়ায় যুদ্ধ ক'রতে লাগল।

এদিকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে ভীষ্মের আর অর্জ্জুনের মধ্যে। অর্জ্জুন এক বাণে দিলেন ভীষ্মের ধনুক কেটে। ভীষ্ম আর একখান ধনুক ঠিক ক'রে নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ ছুড়লেন অর্জ্জুনের ওপর। তারপর অর্জ্জুন এক বাণে ভীষ্মের রথ হটিয়ে দিলেন হাজার পা দূরে আর ভীষ্মের বাণে অর্জ্জুনের রথ হ'টল মাত্র তিন পা, অথচ শ্রীকৃষ্ণ সুখ্যাতি ক'রলেন ভীষ্মের। অর্জ্জুন এর কারণ জানতে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "যে রথের চূড়ায় ব'সে হনুমান, যে রথের সারথি আমি বিশ্বম্ভররূপে, আর যে রথের চারধারেই আছেন নানা দেবতার দল, সেই রথ তিন পা হটান কি সহজ ব্যাপার?"

অর্জ্জুন এই কথায় আশ্চর্যবোধ ক'রে অন্য দিকে মন দিলেন, অমনি ভীষ্ম দশ হাজার রথীর প্রাণ নিয়ে শিবিরে চ'লে গেলেন।

পঞ্চম দিন সকালে লড়াই সুরু হ'ল। কৌরব পক্ষে তৈরি হ'ল সমুদ্রের

মত ব্যূহ আর পাণ্ডব পক্ষে হ'ল শৃঙ্গট ব্যূহ। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অর্জ্জুন থাকলেন ব্যূহের মাঝখানে। দুপক্ষেই হানাহানি চ'লেছে। পাণ্ডবদের বাণে কৌরবদের হাতী, ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত সব ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। ভীষ্ম প্রবল বেগে তুলে নিলেন তার ধনুক। ভীষ্মের বাণে কারো রথ, কারো ঘোড়া, কারো মুকুট, আর কারো বা মাথা কেটে প'ড়তে লাগল।

এই সব দেখে ভীম গদা দিয়ে যাকে পান তাকেই মেরে ফেলতে লাগলেন। ভীমের গদার ঘায়ে ভীষ্মের রথ, ঘোড়া সব চুরমার! তিনি আর একখানা রথে চ'ড়ে ব'সলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিয়ে এলেন ভীষ্মের সঙ্গে লড়তে। ভীষ্ম যত বাণ মারেন, অর্জ্জুন মাঝ পথেই বাণগুলো কেটে দেন। এমন যুদ্ধ বাধ্‌ল দুজনের ভেতর, যেন সেই দিনই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।

অর্জ্জুনের ছেলে ইলাবন্ত যুদ্ধে এলেন। ইনি অর্জ্জুনের স্ত্রী উলূপীর গর্ভে জন্মেছিলেন। ইলাবন্তের সঙ্গে যুদ্ধ বাধ্‌ল সুবলের ছেলেদের। তারা তোমর, শেল, মুষল মুদ্গর ছুড়তে লাগল ইলাবন্তের ওপর। ইলাবন্তের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর রাগে কৌরব পক্ষের সেনারা উড়ে যাচ্ছে খড়ের মত। অলম্বুষ এগিয়ে আসতেই ইলাবন্তের একটা ধারাল বাণ বিঁধল অলম্বুষের বুকে। অলম্বুষের আর দাঁড়ানর জোর রইল না। দুর্যোধন দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা সবাই অস্থির ইলাবন্তের বাণে।

অলম্বুষের জ্ঞান ফিরে এলে, তাঁর প্রচণ্ড খাঁড়া গিয়ে প'ল ইলাবন্তের মাথায় তাতেই তাঁর মাথা কেটে প'ল।

ইলাবন্তের মরণে ভীম আর অর্জ্জুন নতুন ধরণে আক্রমণ করলেন কৌরবদের। ভীষ্মের সঙ্গে অর্জ্জুনের কী ভীষণ রণ। দেবতারা আকাশ থেকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন সেই যুদ্ধ। দুজনেই নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির

ক'রছেন নানা রকম বাণে। ভীষ্মের এক বাণে অর্জ্জুনের রথ ব'সে গেল মাটীর ভেতর। শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই রথ ওঠাচ্ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুন চেয়ে রইলেন শ্রীকৃষ্ণের দিকে। ভীষ্ম দশ হাজার রথী মেরে সে দিনের মত যুদ্ধ শেষ ব'লে ঘোষণা ক'রলেন।

পাঁচদিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের অনেক সেনা গেল, তাই তিনি বড় কাতর হ'য়ে কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের পরামর্শ করতে লাগলেন।

কর্ণ ব'ললেন, "একে ভীষ্ম বুড়ো হ'য়েছেন, তার ওপর তাঁর ভালবাসা পাণ্ডবদের দিকে, এতে তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ চলে কি? আমি যদি হতাম সেনাপতি, তবে দেখিয়ে দিতাম যুদ্ধ জয় করা কাকে বলে।

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন গেলেন ভীষ্মের কাছে। কর্ণের নামে ভীষ্মত চটেই লাল। ভীষ্ম ব'ললেন, "শ্রীকৃষ্ণ যাদের সহায়, তাদের জয় করা কি সহজ ব্যাপার। আচ্ছা, কাল দেখা যাবে কি করা যায়।"

ষষ্ঠ দিন সকালে নিশান উড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে সেনারা হাজির কুরুক্ষেত্রে।

সহদেবের কৌশলে হাজারে হাজারে কৌরব সেনা ম'রতে লাগল। শকুনি এলেন তেড়ে। তখন তাঁর সঙ্গে বাধল সহদেবের যুদ্ধ। ধৃষ্টদ্যুম্ন ছুটে গেলেন ভূরিশ্রবার বিরুদ্ধে। অভিমন্যুর সঙ্গে সুরু হ'ল দ্রোণাচার্যের লড়াই। অভিমন্যুর একটা বাণ দ্রোণের বর্ম্ম ভেদ ক'রে বিঁধল দ্রোণের বুকে, তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ললেন।

ভীষ্মের সঙ্গে অর্জ্জুনের আজ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ভীষণ আস্ফালন ক'রে চোখা চোখা বাণ মারলেন অর্জ্জুনের ওপর। অর্জ্জুনো কম যায় না। তিনিও সেই রকম সব বাণে ভীষ্মের বাণ কেটে দিলেন। দুজনে এত বাণ ছুড়লেন যে, বাতাস আর চলে না, সূর্যের আলোও আর দেখা যায় না। অর্জ্জুনের অস্ত্রে ভীষ্মের রথ গেল ভেঙ্গে। ভীষ্ম লজ্জায় আর

একখানি রথে উঠে ব'সলেন। এই লজ্জার শোধ তোলার ইচ্ছায় তিনি মন্ত্র প'ড়ে ছেড়ে দিলেন নারায়ণ অস্ত্র। সর্ব্বনাশ! অস্ত্রের তেজে বসুমতী টলমল, বাসুকির ফনা কেঁপে উঠে ক'রল একটা ভূমিকম্পের সৃষ্টি। অস্ত্রধারী মাত্রেই ম'রবে এই অস্ত্রে। দেবতারা পাণ্ডব নাশের ভয়ে আকুল। শ্রীকৃষ্ণের কথায় সবাই ছাড়ল অস্ত্র, কেবল ভীমই রাজী নন। ভীমের হাতে তখনো রয়েছে গদা, তাই অস্ত্রটা শন্ শন্ ক'রে ছুটে আস্ছে ভীমের দিকে। এইবার বুঝি ভীমের প্রাণ যায়। শ্রীকৃষ্ণ কি করেন, নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রাখলেন ভীমকে। নারায়ণ অস্ত্রের তেজ মিশে গেল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে।

ভীষ্মের কী আহ্লাদ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব ক'রতে লাগলেন। ভীষ্ম আবার যুদ্ধ সুরু ক'রে একটা ধারাল বাণে বিঁধলেন অর্জ্জুনের দেহ। অর্জ্জুন যেমন বাণটা বের ক'রতে গেলেন তাঁর হাত দিয়ে, অমনি দশ হাজার রথী প্রাণ হারাল ভীষ্মের হাতে। এই রকমে হ'ল ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ শেষ।

সপ্তম দিনে দুপক্ষই রণসাজে সেজেছে। হাতী ঘোড়ার চীৎকারে আর রথের ঘর্ঘর শব্দে কুরুক্ষেত্র চঞ্চল। ভীম অর্জ্জুনের যুদ্ধে কৌরব সেনা অস্থির। ভীমের সঙ্গে চলল অশ্বত্থামার লড়াই। ভীমের বাণে অশ্বত্থামার রথ, ঘোড়া, সারথি কাটা প'ল, অশ্বত্থামা হ'লেন অজ্ঞান। কৌরব সেনার মাঝে উঠ্ল হাহাকার। অনেকে এসে ভীমকে ক'রলেন আক্রমণ, কিন্তু ভীমের দাপটে সবাইকে হ'ল পালাতে।

ভীমের হাতে ভাইদের মৃত্যু হ'য়েছে, তাই কলিঙ্গের রাজা এলেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে যাট হাজার হাতী নিয়ে। ভীমের গদায় হাতী গুলো গুঁড়ো হ'য়ে গেল, সেনারা হ'ল লণ্ডভণ্ড। উনপঞ্চাশ পবন ঢুকেছে ভীমের গদায়, তাই আজ গদায় এত জোর। কলিঙ্গের রাজাও নিস্তার পেলেন না ভীমের হাতে।

মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের শরীর বিঁধে ফেললেন হাজার হাজার বাণে, দরদর করে রক্ত ঝ'রে পড়্ছে অর্জ্জুনের গা থেকে। অর্জ্জুন কোন দিকে না তাকিয়ে ভীষ্মের দিকে ছাড়ছেন ভাল ভাল বাণ। হঠাৎ ভীষ্মের একটা বাণে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের ছিলে কেটে গেল। তিনি আর একটা ছিলে নিয়ে গাণ্ডীবে পরাতে ব্যস্ত হ'লেন, অমনি ভীষ্ম দশ হাজার রথী মেরে কৌরব পক্ষের সেনাদের শিবিরে ফিরতে হুকুম দিলেন।

সাত দিন কেটে গেল। যুদ্ধের বেগ একটুও ক'মল না। দুর্যোধন বড় ভাবনায় প'ড়লেন। শেষে তিনি ভীষ্মের কাছে গিয়ে ব'ললেন, "সাত দিন যুদ্ধ ক'রেও আমরা হারাতে পারলাম না পাণ্ডবদের, লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?"

ভীষ্মের খুব রাগ হ'ল দুর্যোধনের কথায়। তিনি তখুনি তাঁর তূণ থেকে পাঁচটা বাণ বার ক'রে দুর্যোধনকে দেখিয়ে ব'ললেন, "এই বাণের নাম মহাকাল। কালই এই বাণে হবে পঞ্চ পাণ্ডবের মরণ।" দুর্যোধন ভাবলেন যুদ্ধ জয় যুঝি হ'য়েই গেল!

পরের দিন কেমন ক'রে যুদ্ধ করা হবে, তাই নিয়ে চ'লেছে পাণ্ডব শিবিরে পরামর্শ। এমন সময় সহদেব ব'ললেন, "আমি জানতে পেরেছি, ভীষ্মদেব মহাকাল বাণে আমাদের শেষ ক'রে দেবেন ব'লে দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন।"

যুধিষ্ঠিরের মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখের পানে চাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "কিছু ভাববেন না আপনি। আমি অর্জ্জুনকে নিয়ে গিয়ে ভীষ্মের কাছে আদায় ক'রেনেব সেই মহাকাল।"

তাও কি সম্ভব! যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব জেনে শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "দুর্যোধন চিত্রসেনের হাতে বন্দি হ'লে অর্জ্জুন যখন তাঁকে বাঁচান গন্ধর্ব্বের

হাত থেকে, তখন দুর্যোধন অর্জ্জুনকে বর দিতে চেয়ে ছিলেন। আজই সেই বর নেওয়ার দিন।"

এই ব'লে অর্জ্জুনকে নিয়ে চ'লে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ বরাবর দুর্যোধনের শিবিরে। দুর্যোধন আদর ক'রে বসালেন দুজনকে। দুর্যোধন, তাদের আসার কারণ কি জানতে চাইলে অর্জ্জুন ব'ললেন, "আপনি আমার ইচ্ছা পূরণ ক'রতে চেয়েছিলেন। আপনার মুকুটটা আমায় দিয়ে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।"

দুর্যোধন কোন কথা না ব'লে অর্জ্জুনকে দিয়ে দিলেন তাঁর মুকুটটা।

ভীষ্মের শিবিরে মিটমিট্ ক'রে আলো জ্ব'লছে। সারাদিন যুদ্ধের পরিশ্রমের পর ভীষ্মদেব নিরিবিলি বিশ্রাম ক'রছেন। অর্জ্জুন দুর্যোধনের মুকুট মাথায় দিয়ে ঢুকলেন ভীষ্মের শিবিরে। শ্রীকৃষ্ণ রইলেন বাইরে। ভীষ্ম মুকুট দেখেই অর্জ্জুনকে ভাবলেন দুর্যোধন। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এত রাতে আমার কাছে! বল তোমার কি চাই?"

অর্জ্জুন ব'ললেন, "আপনার মহাকাল বাণ দিন আমাকে। আমি নিজের হাতে পাণ্ডবদের মেরে মনের দুঃখ মিটাই।"

ভীষ্ম অর্জ্জুনের হাতে বাণ ক'টা দিতেই দেখা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

ব্যাপারটা বুঝতে ভীষ্মের আর দেরি হ'ল না। তিনি ব'ললেন, "দয়াময় পাণ্ডবদের বাঁচাতে তুমি নষ্ট করালে আমার প্রতিজ্ঞা। আচ্ছা কাল দেখা যাবে, তুমি কেমন ক'রে তোমার প্রতিজ্ঞা রাখ ঠাকুর!"

যুদ্ধের অষ্টম দিনে দুর্যোধনের মনে শান্তি নেই। বাণ হরণের কথা জেনে তাঁর অন্তর বড় কাতর। সময় মত সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্যে সাজল। ভীষ্ম রাতের ঘটনা ভুলতে পারেন নি। তিনি অর্জ্জুনকে শুনিয়ে দিলেন, "অর্জ্জুন, আজ যুদ্ধে তোমার কৃষ্ণকে অস্ত্র ধরাবই। যদি না পারি, তবে আমার নাম ভীষ্ম নয়।"

দেবতারা অন্তরীক্ষ থেকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় বেশ কৌতুক বোধ ক'রলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধ'রবেন না, ব'লেছেন। দেখা যাক, তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় কি না!

অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে ভীষ্মের। বাণে বাণে গগন ছেয়ে গিয়েছে।

দ্রোণের বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক আর রথ ভেঙ্গে গেল। তিনি খাঁড়া নিয়ে আক্রমণ ক'রলেন দ্রোণকে। ভীমের তেজে কৌরব সেনার মাঝে খালি "পালা পালা" রব। সহদেবের হাতে মার খেয়ে পালালেন শকুনি।

দেবতারা দেখ্‌ছেন ভীষ্মের যুদ্ধ। আজ ভীষ্মের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের গা ময় বিঁধল ভীষ্মের বাণ। অর্জ্জুন রেগে খুব ভাল ভাল বাণে বিঁধে ফেললেন ভীষ্মকে। ভীষ্ম আজ রণোন্মাদ! তাঁর বাণে রথীর পর রথী ম'রে প'ড়ছে অর্জ্জুনের চার ধারে। অর্জ্জুন কিছুতেই ঠেকাতে পারছেন না ভীষ্মকে। এত দুর্ব্বল হ'লেন অর্জ্জুন যে, তাঁর আর রথে বসে থাকাও যেন সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারেন না। প্রতিজ্ঞা তাঁর, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরবেন না; কিন্তু সব যে যায়। শ্রীকৃষ্ণ একটা রথের চাকা হাতে নিয়ে ছুটলেন ভীষ্মকে মারতে। ভীষ্মও ত তাই চান। শ্রীকৃষ্ণের হাতে ম'রে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই ত তাঁর সাধ! তিনি ধনুর্ব্বাণ ছেড়ে হাত জোড় ক'রে শ্রীকৃষ্ণের স্তব ক'রতে লাগলেন। আনন্দে তাঁর সকল শরীরে রোমাঞ্চ।

অর্জ্জুন রথ থেকে নেমে ধ'রে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণকে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, "আমি যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আমি মারব ভীষ্মদেবকে। ভক্তের প্রতিজ্ঞা রাখতে দাও, বন্ধু!"

অর্জ্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ রথে চ'ড়ে ব'সলেন। আগেই ভীষ্ম মেরেছেন দশ হাজার রথী। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, সেদিনের মত যুদ্ধ হ'ল বন্ধ।

নবম দিনের যুদ্ধে সৈন্যেরা এসে জমল। প্রথমেই যুদ্ধ বাধল ভীষ্মের সঙ্গে অর্জ্জুনের। শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহ দিচ্ছেন অর্জ্জুনকে। সে দিন যে যুদ্ধ হ'ল, তা ব'লে ওঠা যায় না। কুরুক্ষেত্রে ব'য়ে গেল রক্তের নদী। আজ যেন দেবী চামুণ্ডা রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে এয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। ভীষ্মের বাণে পাণ্ডবদের সেনারা কাতারে কাতারে মরেছে। এই না দেখে, ভীম এলেন তাঁর গদা নিয়ে। ভীম বাধা পেলো দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধনের সাথে চ'লল ভীমের গদার লড়াই। ভীমের গদায় দুর্যোধনের সারথি ম'রে গেল। দুর্যোধন তখন পড়্লেন বিপদে। দ্রোণ এলেন ভীমকে জব্দ ক'রতে।

ভীমের লাথির ঘায়ে অনেক রথ চুরমার। অভিমন্যুর বাণে কৃপাচার্য অজ্ঞান। অশ্বথামা অভিমন্যুকে বাধা দিতে না পারায় লজ্জায় মুখ হেঁট ক'রে রইলেন।

ভীষ্ম অর্জ্জুনের বাণে বিষম ঘা খেয়ে দিব্য বাণে মেরে ফেললেন দশ হাজার রথী। সকলে বিশ্রামের জন্যে চ'লে গেলেন নিজের নিজের শিবিরে।

রাতে ব'সল পাণ্ডবদের মন্ত্রণা সভা। ভীষ্মকে সরাতে না পারলে পাণ্ডব সেনার নিস্কৃতি কৈ? এত লোক মরছে দেখে যুধিষ্ঠির প্রাণে বড় ব্যথা পেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে ব'ললেন, "চলুন, আমরা সকলে মিলে ভীষ্মের শিবিরে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুর কৌশল জেনে আসি। তিনি নিশ্চয় তাঁর মৃত্যুর কৌশল জানিয়ে দেবেন।"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরদের দেখে ভীষ্মের বড় আনন্দ হ'ল। ভীষ্মের চরণে প্রণাম ক'রে যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "আমরা জানি আপনি আমাদের কত ভালবাসেন। হস্তিনার সিংহাসনে যিনিই থাকুন, তাঁর মতে চ'লতে

আপনার প্রতিজ্ঞা, তাও আমরা জানি। কিন্তু দেখুন, দুর্যোধনের অন্যায় ব্যবহারে আমরা কত কষ্ট পাচ্ছি। মাত্র পাঁচটা জায়গা চাইলাম মাথা গুঁজে থাকতে, তাতেও হ'লাম বঞ্চিত। আপনি অনেক বার ব'লেছেন যে আমরা ধর্ম্ম বলে জয়ী হব। মন যে প্রবোধ মানে না। এত লোকের মরণ যে আর দেখ্‌তে পারছিনে আমি। আপনি এমন ক'রে যুদ্ধ ক'রলে কি জয়ী হ'তে পারব, মানুষ মরা বন্ধ হবে কোন দিন? আপনি দয়া ক'রে আপনার মৃত্যুর কৌশল ব'লে দিন আমাদের।"

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা পুরণ ক'রতে বিমুখ হ'লেন না। তিনি ব'ললেন, "আমি যুদ্ধ ক'রলে দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, কেউ হারাতে পারবে না আমাকে। তবে আমার প্রতিজ্ঞা আছে, স্ত্রীলোক আর অস্ত্রহীনের সঙ্গে যু ব না কখনও। যুদ্ধের সময় অমঙ্গল দেখলেও আমি যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দেব। বিরাটের শিখণ্ডী নামে যে ছেলে আছে, সে ছিল আগে স্ত্রীলোক, কিন্তু তপস্যা ক'রে পুরুষ হ'য়েছে। তাকে সাম্‌নে রেখে যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ ক'রে আমার সঙ্গে, তবে হবে আমার মরণ।"

আর চাই কি! ভীষ্ম বধের উপায় ত জানা গেল। এই কথায় কিন্তু অর্জ্জুনের মন দ'মে গেল। যে ভীষ্ম কোলে ক'রে কত যত্নে মানুষ ক'রেছেন অর্জ্জুনকে, সেই ভীষ্মকে মারতে হবে তাঁর! শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন অর্জ্জুনকে।

রাত শেষ হ'ল। সূর্যদেব লাল রঙ্‌ গায়ে মেখে পূব আকাশে দেখা দিলেন। ভীষ্মের রথ চ'লল কুরুক্ষেত্রের দিকে। চার ধারে কেমন অমঙ্গল দেখা দিল! চারিদিকে কাকের কা' কা' শব্দ, শিয়ালের ভয়ঙ্কর চীৎকার! রথের ওপর উ'ড়ছে শকুনের দল, বিনা মেঘে হ'চ্ছে বৃষ্টিপাত। এইসব দেখে, ভয়ে ভীষ্মের সারথির গা ছম ছম ক'রতে লাগল। সারথির ভয়ের ভাব দেখে ভীষ্ম ব'ললেন, "ভয় কি? যাঁর নামে পাপীর পাপ দূরে

যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধে উপস্থিত তখন কি কোন অমঙ্গল আস্‌তে পারে কখনো ? সেই নবঘন শ্যাম স্বন্দরের রূপ চোখে দেখে অমঙ্গলের ভয় ক'রব কেন ? তুমি তোমার রথ চালিয়ে দাও, সারথি।"

ভীষ্ম অর্জ্জুনের সামনে এসে তুলে নিলেন তাঁর ধনুক। তাঁর ধনুক থেকে ছুটল আগুনের মত বাণ। অর্জ্জুনও মহাকালের মত ভীষ্মকে জর্জ্জর ক'রে ফেললেন বাণে বাণে।

এদিকে ভীমের গদায় কৌরব সেনারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। দুঃশাসন বাধা দিতে গিয়ে ভীমের মারে চেতনা হারালেন। ভীমের বাণে দ্রোণ প'ড়লেন ফাঁপরে। তাঁর রথ, ঘোড়া, সারথির কিছুই রইল না। তিনি অন্য রথে চ'ড়ে অভিমন্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রতে লাগলেন।

ঘটোৎকচের উৎপাতে রাজারা রণ ছেড়ে পালালেন। দুর্যোধনও দাঁড়াতে পারলেন না ঘটোৎকচের সামনে।

ভীষ্ম এমন যুদ্ধ করছেন যে, তা কেউ কখনো দেখেনি। অর্জ্জুনও কম যাচ্ছেন না। তাঁর বাণের মুখে আর কেউ দাঁড়াতে পারছে না। দ্রোণের মনে হ'ল, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বুঝি আজই ফলে যায়।

অর্জ্জুনের বিক্রমে ভীষ্ম যেন পাগল। তাঁর তূণে যত ভাল বাণ ছিল, তিনি তার সব ছুড়তে লাগলেন পাণ্ডব সেনার দিকে। আজ যেন একটা প্রলয়ের দিন। পাণ্ডব সেনা আর রাখা যায় না। অর্জ্জুন অনেক চেষ্টা ক'রেও ভীষ্মকে রুখতে পারলেন না। তখন শিখণ্ডীকে আনবার ব্যবস্থা হ'ল।

শিখণ্ডী ব'সলেন অর্জ্জুনের রথে। শিখণ্ডীকে দেখেই ভীষ্ম অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইলেন রথের ওপর। শিখণ্ডী মনের সাধে বাণ ছুড়ে ভীষ্মের দেহ ভ'রে দিলেন। ভীষ্মের মুখে শুধু কৃষ্ণ নাম, আর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূরতি।

অর্জ্জুনও অনেক বাণ মারলেন ভীষ্মের দেহে। বাণ আর সহ্য হয় না! থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল ভীষ্মের দেহ। তিনি আর ব'সে থাক্‌তে না পেরে গড়িয়ে প'লেন রথ থেকে। এত বাণ বেঁধা তাঁর গায়ে যে, তাঁর দেহটা আর মাটী ছুঁলো না, সব দেহটা রইল বাণের ওপর।

কৌরব পক্ষে হাহাকার প'ড়ে গেল। সবাই এলেন ভীষ্মের কাছে। দুর্যোধন কেঁদে আকুল।

পাণ্ডবেরা দেখতে এলেন ভীষ্মকে। ভীষ্ম চোখ বুজে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখচেন হৃদয়ে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে শোনালেন কৃষ্ণ নাম। শেষ সময়ে কৃষ্ণ নাম শোনালেন ব'লে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন। ভীষ্ম জানালেন সূর্যের উত্তরায়ণে হ'বে তাঁর মৃত্যু।

ভীষ্মের দেহটা বাণের ওপর, কিন্তু মাথাটা ঝুলে প'ড়ছে। তিনি এর ব্যবস্থা ক'রতে ব'ললেন। দুর্যোধন খুব ভাল বালিশ এনে দিলেন, ভীষ্ম সে দিকে তাকালেন না। তখন অর্জ্জুন তিনটে বাণ মেরে ভীষ্মের মাথাটা ঠিক ক'রে রেখে দিলেন।

ভীষ্মের গলা শুকিয়ে আস্‌ছে, তিনি চাইলেন জল। দুর্যোধন সোণার পাত্রে সুবাসিত জল এনে দিলেন। সে জল প'ড়ে রইল। ভীষ্ম চাইলেন অর্জ্জুনের দিকে। অর্জ্জুন ভীষ্মের মনের ভাব বুঝে বাণ দিয়ে মাটী ভেদ করলেন। ভোগবতীর জল ফোয়ারার মত প'ড়ল ভীষ্মের মুখে। ভীষ্ম বড় আরাম পেলেন।

কর্ণের আর রাগ নেই, তিনিও এলেন ভীষ্মকে দেখ্‌তে। কর্ণকে দেখে ভীষ্ম সুখী হ'লেন।

সেইখানেই ভীষ্মের থাকবার বন্দোবস্ত করা হ'ল, ভীষ্মের সেবার জন্যে রাখা হ'ল অনেক সৈন্য। তার পর সবাই ভীষ্মের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে নিজেদের শিবিরে চ'লে গেলেন।

# দ্রোণ পর্ব্ব।

—:০:—

ভীষ্মের পতন হ'য়েছে এখন কৌরব পক্ষে সেনাপতি হ'ন কে! দুর্যোধনের ইচ্ছা, সেনাপতি হন কর্ণ, কিন্তু কৃপাচার্যের কথায় তাঁকে সেনাপতি ক'রতে হ'ল দ্রোণাচার্যকে।

দ্রোণকে এই কথা জানিয়ে দুর্যোধন ব'ললেন, "গুরুদেব, আপনি যুদ্ধ করে যুধিষ্ঠিরকে ধ'রে দিন।"

অর্জ্জুন কাছে না থাকলে তিনি তা পারবেন ব'লে, আশ্বাস দিলেন দুর্যোধনকে।

গুপ্তচর গিয়ে দ্রোণের সেনাপতি হবার আর যুধিষ্ঠিরকে ধ'রে দেবার কথা জানাল যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের ভয় হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহ দিলেন। ভীম ব'ললেন, "ভয় কি দাদা? কাল আমার হাতে দুর্যোধনের কি দুর্গতি হয়, তা দেখবেন।"

শ্রীকৃষ্ণের মতে ভীমকে সেনাপতি করা হ'ল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

সকাল হ'লে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে নিয়ে গেলেন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম পাণ্ডবদের রাজ্যের ভাগ দিয়ে যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলতে ব'ললেন দুর্যোধনকে। তাঁর সেই এক কথা, যুদ্ধ ছাড়া কিছু দেবেন না যুধিষ্ঠিরকে।

ভীষ্ম বুঝলেন দৈব কখনো খণ্ডাণ যায় না।

দ্রোণ চক্রব্যূহ ক'রে যুদ্ধ সুরু ক'রলেন, পাণ্ডব পক্ষে অর্জ্জুন সৃষ্টি ক'রলেন মকর ব্যূহ। সৈন্যের কোলাহল, শত সমুদ্রের গর্জ্জন ব'লে বোধ হ'ল। যোদ্ধার হুঙ্কার আর ধনুকের টঙ্কারে মেতে উঠল কুরুক্ষেত্র।

দ্রোণের সঙ্গে অর্জ্জুনের, আর ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের অপরূপ যুদ্ধ!

অর্জ্জুন ব'ললেন, দ্রোণকে, "আপনি নাকি প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন দাদাকে ধ'রে দিতে ? আমি বেঁচে থাকতে তা কেমন ক'রে পারেন দেখা যাক্।"

দ্রোণের হ'ল রাগ, তিনি বাণে বিঁধতে লাগলেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুনও বাণে বাণে কাবু ক'রে ফে'ললেন দ্রোণকে। দ্রোণ মারেন অগ্নি বাণ ত অর্জ্জুন বরুণ বাণে তা রোধ ক'রে, কুরুক্ষেত্র জলে ভাসিয়ে দিলেন। দ্রোণ শোষক বাণে সেই জল নিলেন শুষে। দ্রোণ মারেণ বায়ু অস্ত্র, আকাশ অস্ত্রে নিরস্ত্র করেন অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের একটা বাণ বিঁধল বাজের মত দ্রোণের বুকে। তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন। কৌরব সেনারা হায় হায় ক'রে রণ ছেড়ে পালাল।

ভীম দুর্যোধনে বাধল গদার লড়াই। ভীমের গদা খেয়ে দুর্যোধন পালিয়ে বাঁচলেন। তখন ভীমের দিকে হাতী ছেড়ে দিল রাজারা। ভীম গদার পর গদা মেরে হাতীদের হস্তিলীলা শেষ ক'রে দিলেন। কর্ণ এগিয়ে এলেন। ভীমের ঘুসির চোটে কর্ণের রথের ঘোড়া একটু ছট্‌ফট্ ক'রে চিরকালের মত ঘুমিয়ে প'ড়ল। কর্ণ রণে ভঙ্গ দিলেন।

পরের দিন সকালে আবার যুদ্ধ স্বরু হ'ল। অর্জ্জুন যমের মত মারছেন কৌরব সেনা। দুর্যোধনের সব বাণই কাটা গেল অর্জ্জুনের বাণে অশ্বত্থামাও জ্ঞান হারালেন অর্জ্জুনের বাণ খেয়ে।

দুঃশাসনের সঙ্গে ভীমের লড়াই। ভীমের গদায় দুঃশাসন টিকতে না পেরে পালিয়ে বাঁচলেন।

অশ্বত্থামা পারঘ ছুড়ে মারলেন ভীমকে। ভীম খানিকক্ষণ অজ্ঞান হ'য়ে থাকার পর মেরে তাড়িয়ে দিলেন অশ্বত্থামাকে।

দুর্যোধন আর কত সৈন্যের মৃত্যু দেখবেন চোখে। তিনি অভিমানে একটু কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন দ্রোণকে। দ্রোণ অশ্বত্থামাকে ডেকে নিয়ে যুদ্ধ ছেড়ে চ'লে যেতে চাইলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁর

কাছে ক্ষমা চাওয়ায় তাঁর আর যাওয়া ঘটল না। সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত থাকল।

দুর্যোধনের শিবিরে ঠিক হ'ল, পরের দিন ত্রিগর্তের রাজাকে নারায়ণী সেনার সেনাপতি ক'রে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া হবে, তা হ'লেই যুধিষ্ঠিরকে ধরা সোজা হবে।

রাত শেষ হ'য়ে গেল। নারায়ণী সেনারা অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে চাইল। কর্ণ দুর্যোধনকে ব'ললেন, "আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, অর্জ্জুনকে মারব। তা বুঝি আর হয় না। আজ আর নারায়ণী সেনার হাতে অর্জ্জুনের রক্ষা নেই।

দ্রোণ চক্রব্যূহ তৈরি ক'রে তার মাঝে রাখলেন জয়দ্রথকে। আজ যুধিষ্ঠিরকে ধ'রতেই হ'বে। সব যোদ্ধা আজ চক্রব্যূহে জমেছেন। দ্রোণ আছেন সামনে। তুমুল যুদ্ধ। দ্রোণের বাণে পাণ্ডব সেনা চঞ্চল, অর্জ্জুন নারায়ণী সেনার সঙ্গে মেতেছেন। ভীম একা যতখানি পারছেন, যোদ্ধাদের ঠেকিয়ে রাখছেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণের হাতে ধরা পড়েন পড়েন, এই অবস্থা, তাঁকে বাঁচাতে এলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে দ্রোণ মূর্চ্ছিত। জ্ঞান ফিরে এলে দ্রোণ বড় লজ্জা পেলেন। তিনি তখন বাণ মেরে ধৃষ্টদ্যুম্নের দেহ ঢেকে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন খুব রেগে খাঁড়া নিয়ে উঠলেন দ্রোণের রথে। এইবার বুঝি দ্রোণের প্রাণ যায়। যা'ক্ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের খাঁড়া আর, ঢাল দিলেন খান্ খান্ ক'রে।

অর্জ্জুন নেই, চক্রব্যূহে ঢোকে কে? হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের মনে প'ড়ল অভিমন্যুর কথা। অভিমন্যুকে ডেকে যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "বাপু, তুমি জান চক্রব্যূহে ঢোকার কৌশল। আজ তুমি আমাদের না বাঁচালে আমাদের বাঁচবার আর উপায় নেই।"

অভিমন্যু ব'ললেন, "শ্রীকৃষ্ণ আমার বাবাকে এই কৌশল

শিখিয়েছিলেন। আমি যখন মার গর্ভে ছিলাম, তখন আমার বাবা মার কাছে চক্রব্যূহে ঢোকার কৌশল ব'লে ছিলেন, কিন্তু বা'র হবার কৌশল বলেন নি, তাই আমি ঢোকার কৌশল শিখেছি. কিন্তু বা'র হবার কৌশল শিখতে পারি নি।

ভীম আর অন্য যোদ্ধারা তাঁকে বার ক'রে আন্‌বেন ব'লে যুধিষ্ঠির রাজি করালেন অভিমন্যুকে।

অভিমন্যু প্রকৃত বীরের ছেলে! "হয় জয়, না হয় ক্ষয়" এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বীর দর্পে চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে এগিয়ে গেলেন অভিমন্যু, তাঁর পেছনে রইলেন পাণ্ডব পক্ষের বড় বড় বীর। এক অভিমন্যু ছাড়া আর কেউ এগুতে পারলেন না। জয়দ্রথ প্রাণপণে ব্যূহ রক্ষা ক'রছেন। তিনি বিপুল জোরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে বাধা দিলেন। জয়দ্রথ শিবের বরে অর্জ্জুন ছাড়া আর কোন পাণ্ডবকে ভয় করেন না। অভিমন্যু একাই চ'লেছেন। যত বার পাণ্ডবেরা এগুতে চান অভিমন্যুর সাহায্যে ততবারই বাধা পান জয়দ্রথের হাতে। পাণ্ডবেরা অভিমন্যুর ভাবনায় অস্থির হ'য়ে প'লেন।

অভিমন্যু একা. কোন সহায় নেই তাঁর। তবু তাঁর বাণ সহ্য করা বড় শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। কৌরব পক্ষের বড় বড় সেনাপতি ঘিরে ফেলেছেন অভিমন্যুকে। খাঁচার পাখীকে খুঁচিয়ে মারলে যেমন হয়, তেমনি হ'ল আজ অভিমন্যুর দশা। তাহ'লে কি হয়! অভিমন্যুর যুদ্ধের কায়দা দেখে দুঃখে দুর্যোধনের মুখখান পড়ল ঝুলে।

দুঃশাসনের ছেলে উলক প্রাণ দিলেন অভিমন্যুর হাতে। কর্ণের ছেলে বৃষসেনের ঐ গতি হ'ল! কর্ণ রেগে গিয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে লড়তে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন।

দুর্যোধনের ছেলে লক্ষণ আর পদ্ম মারা পড়লেন অভিমন্যুর বাণে

তখন দুর্যোধন পাগলের মত হ'য়ে গদা নিয়ে ধেয়ে এলেন। অভিমন্যুর রাগের চোটে তাঁকেও পালাতে হ'ল। অভিমন্যু কৌশিক, কপালী, রুদ্রকাল, অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি বাণে—কৌরব সৈন্যদের ধূলোর মত উড়িয়ে দিলেন।

অনেক চেষ্টা হ'ল, অভিমন্যু কিছুতেই হারেন না। তখন দুর্যোধনদের অন্যায় পথ ধ'রতে হ'ল অভিমন্যুকে মারতে। কৃপাচার্য্য আপত্তি জানালেন, তাঁর আপত্তি টিক্‌ল না। তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি আর কর্ণ এই সাত জনে একযোগে ঘিরে ধ'রলেন অভিমন্যুকে। বালক অভিমন্যুর তেজ যেন বেড়ে গেল একশ গুণ। দুর্যোধন দেখলেন অমঙ্গল। তাঁর মাথার মুকুট গেল খ'সে। বিষয়ের মায়া যাঁকে এমন ক'রে বেঁধেছে, তাঁর কি দৃষ্টি আছে অমঙ্গলের দিকে। সাতজনেই এক সঙ্গে বাণ মারলেন অভিমন্যুকে। অভিমন্যু ঘুরে ঘুরে বিদ্যুতের মত বাণ ছুড়ছেন সকলের ওপর। তাঁর বাণে সাত জনই পড়লেন অজ্ঞান হ'য়ে। জ্ঞান ফিরে এলে, তাঁরা খুব জোরে আক্রমণ ক'রলেন অভিমন্যুকে।

অভিমন্যুর সব অস্ত্র ফুরিয়ে গেল। রথ নেই, ঘোড়া নেই, সারথি নেই, তবু অভিমন্যু খালি হাতে যমের মত লড়াই ক'রছেন। তাঁর কিল, চড়, ঘুসি খেয়ে কৌরব সেনারা মাটিতে দিচ্ছে গড়াগড়ি, আর তাদের মুখে উঠছে ঝলকে ঝলকে রক্ত। অভিমন্যু রথের চাকা দিয়েও মারলেন অনেক সৈন্য। অভিমন্যু আর ত পারেন না। কেবল পড়ছে ঘন ঘন নিঃশ্বাস, চোখে দেখছেন কেবল সব অন্ধকার। কেবল মনে হ'চ্ছে তাঁর আর বুঝি মামা কৃষ্ণ আর পিতা অর্জ্জুনের সঙ্গে দেখা হ'ল না। খালি হাতে দুর্বল দেহে দাঁড়িয়ে আছেন অভিমন্যু, তবুও তাঁর ওপর বাণ বৃষ্টির বিরাম নেই। তাঁর সকল শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর দাঁড়াতে

পারলেন না, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অভিমন্যু। দুঃশাসনের এক ছেলে এসে গদার পর গদা মারলেন অভিমন্যুর মাথায়। অভিমন্যুর আর কোন দিকে মন নেই। তাঁর মুখে শুধু কৃষ্ণ নাম, আর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ। ক্রমে অভিমন্যুর সব দেহ অবশ হ'য়ে প'ড়ল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি মাটির মায়া কাটালেন। দুর্যোধনের আনন্দ হ'ল আর পাণ্ডব সেনার মাঝে উঠ্‌ল কান্নার রোল।

সংসপ্তকের সঙ্গে লড়াই ক'রতে আর অর্জ্জুনের মন ব'সছে না। কি এক অজানা দুঃখে তাঁর প্রাণ অস্থির হ'য়ে প'ড়ল। অর্জ্জুন ফিরে এলেন চক্রব্যূহের কাছে। অর্জ্জুনকে দেখে সবাই মুখ লুকুচ্ছে, কেউ কিছু ব'লতে চায় না। ভীমের কাছে অর্জ্জুন পেলেন অভিমন্যুর খবর।

অর্জ্জুন শুনলেন, সপ্তরথী মিলে অন্যায় যুদ্ধে মেরেছেন অভিমন্যুকে। আর জয়দ্রথ পথ আটকে রেখে পাণ্ডবদের বাধা দিয়েছে।

ছেলের শোকে অর্জ্জুন দিশেহারা। শ্রীকৃষ্ণের কথায় একটু শান্ত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, "কাল সূর্য অস্ত যাবার আগে আমি হত্যা ক'রব জয়দ্রথকে, আর যদি না পারি তবে আগুনে ক'রব প্রাণ বিসর্জন।"

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনলেন জয়দ্রথ। কৌরবপক্ষ ঠিক করলেন, পরের দিন সারা সময়টা তাঁরা জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখবেন।

রাত দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জেগে আছেন শুধু শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন। অর্জ্জুন কেমন ক'রে তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখ্‌বেন, সেই ভাবনাই হ'ল শ্রীকৃষ্ণের। তিনি অর্জ্জুনের হাত ধ'রে কপিধ্বজ রথে উঠে সরাসরি চলে গেলেন কৈলাসে। মহাদেব আর পার্বতী ব্যাপার সব শুনে আশীর্ব্বাদ ক'রে অর্জ্জুনকে সাহস দিলেন। কৈলাস থেকে ফিরে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন শুয়ে পড়লেন।

সকালে কৌরবপক্ষ বার ক্রোশ জায়গা জুড়ে একং

ব্যূহ তৈরী ক'রে তার মধ্যে রেখে দিল দুর্যোধন আর জয়দ্রথকে।

ভীম, সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার ভার দিয়ে জয়দ্রথের খোঁজে বেরুলেন অর্জ্জুন। পথে বাধা পেলেন দ্রোণের হাতে। দ্রোণকে পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মানা করলেন। যাঁর সামনে এত বড় অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু প্রাণ হারাল, তাঁকে আবার অনুরোধ! অর্জ্জুন যুদ্ধ করে এগিয়ে চ'ললেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে বাধা দিলেন, কিন্তু অজ্ঞান হ'লেন অর্জ্জুনের বাণে। কর্ণকে সামনে দেখে অর্জ্জুন এমন বাণ মারলেন, তাতেই কর্ণ অচেতন। এই রকমে দু ক্রোশ এলেন অর্জ্জুন।

বেলা অনেক হ'য়ে গেল। অর্জ্জুনের ঘোড়া আর চ'লতে পারে না। ঘোড়ার জন্যে চাই জল। কোনখানে জল নেই। অর্জ্জুন বাণ মেরে মাটি ভেদ ক'রে কুরুক্ষেত্রের মাঝখানেই সৃষ্টি করলেন এক অপরূপ সরোবর। শ্রীকৃষ্ণ রথের ঘোড়া খুলে তাদের গা ধুয়ে দিয়ে, বেশ ক'রে তাদের জল খাইয়ে নিলেন। ঘোড়াগুলো পেল নতুন বল।

অর্জ্জুনকে অনেকক্ষণ দেখেন নি। যুধিষ্ঠিরের মন খারাপ হ'য়ে গেল। সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের কথায় চ'ললেন অর্জ্জুনকে দেখতে। কৌরব সেনারা তাঁকে বাধা দিল। তিনি একাই অনেক সৈন্য মেরে ফেললেন। পাঁচ ক্রোশ পথ গিয়ে তিনি অর্জ্জুনের রথের নিশান দেখতে পেলেন। ভূরিশ্রবা আক্রমণ ক'রল সাত্যকিকে। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে মেরে ফেলেন আর কি,—অমনি অর্জ্জুন ভূরিশ্রবার হাত দুটো দিলেন কেটে। সাত্যকি তখন তলোয়ারের এককোপে ভূরিশ্রবার প্রাণ নিলেন।

অর্জ্জুন এখনোত ফেরেন না। যুধিষ্ঠির চঞ্চল হ'য়ে ভীমকে পাঠালেন অর্জ্জুনের খোঁজে। ভীম রথে চ'ড়ে কৌরব সেনার মধ্যে ঢুকতেই সকলে

তাঁকে ঘিরে অস্ত্র মারতে লাগল। ভীম রথ থেকে নেমে গদা হাতে এগিয়ে চলেছেন। দুর্যোধনের দশ ভাই দিলেন ভীমকে বাধা। ভীম গদার বাড়ি দশ জনকেই দিলেন শেষ ক'রে। দুর্যোধন হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন।

কর্ণ এলেন ভীমের সামনে। ভীম এক চ'ড়ে সারথির দফা শেষ ক'রে কর্ণের চুল ধ'রে তাঁকে টেনে নামালেন রথ থেকে। ভীম কর্ণকে মারার জন্যে অস্ত্র তুলতেই তাঁর মনে পড়ল অর্জ্জুনের কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞার কথা। তিনি ছেড়ে দিলেন কর্ণকে। কর্ণের দুর্দশায় দ্রোণ আর কৃপ হেসে উঠলেন। লজ্জায় কর্ণের কান দুটো হ'ল লাল।

তিরিশটা জোরাল হাতী চ'ড়ে ভীমকে বাধা দিতে এলেন দুর্যোধনের আর তিরিশ ভাই। নিমেষের মধ্যে ভীম তিরিশ জনকেই নিকেশ ক'রে দিলেন।

সঞ্জয়ের কাছে চল্লিশ ছেলের মৃত্যু শুনে ধৃতরাষ্ট্র ছেলে মানুষের মত কাঁদতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, ভীম একাই বুঝি তাঁর বংশ নাশ করেন!

ভীম এগিয়ে গিয়ে সাত্যকির কাছে জানলেন, অর্জ্জুন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছেন! ভীম খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক ধার থেকে মারতে লাগলেন কৌরব সেনাদের। এইবার ভীম বাধা পেলেন দুর্যোধনের পঞ্চাশ জন ভায়ের কাছে। ধরার আলো আর তাঁদের বেশিক্ষণ দেখতে হ'ল না। তাঁরা সবাই হ'লেন যমালয়ের যাত্রী।

নব্বুই ছেলের মরণে ধৃতরাষ্ট্র শোকে পাগল, আর—অন্তঃপুরের কান্নার শব্দে আকাশ বাতাস ভরপুর।

ভীমের বেগ বন্ধ করা দরকার। দুর্যোধন প্রাণের আশা ত্যাগ ক'রে যুঝতে লাগলেন ভীমের সঙ্গে। দুজনের গর্জ্জনে কুরুক্ষেত্র কাঁপতে লাগল।

ভীমের গদা দুর্যোধনকে কাবু ক'রে দিল। দুঃশাসন আর বাকি ভাইদের নিয়ে যুদ্ধে এলেন। ভীম সকলেরই ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে দিলেন, থাক্‌লেন শুধু দুর্যোধন আর দুঃশাসন।

ভীম এতক্ষণ লড়াই ক'রে কাহিল হ'য়ে পড়েছেন। কর্ণ তখন সু বিধা পেয়ে ধনুকের ছিলে দিয়ে ধ'রলেন ভীমের গলা। কুন্তীর কথা মনে পড়ায় ছেড়ে দিলেন ভীমকে।

বেলা আর বেশী নেই। জয়দ্রথকে ত পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বড় ভাবনায় পড়লেন। অর্জ্জুন ব'ললেন, "শ্রীকৃষ্ণ যাদের সহায়, তাদের প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ হয়, সব দায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের।" "শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে সূর্য ঢেকে দিলেন। সবাই ভাবল,—রাত হ'য়ে গেল। তখন কৌরব পক্ষের সবাই চ'লল অর্জ্জুনের মরণ দেখতে, তিনিত জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেন নি। জয়দ্রথের আর ভয় নেই, তিনিও এলেন সবার সঙ্গে।

'দাউ দাউ, করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। অর্জ্জুন প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। " শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, অর্জ্জুন, তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, অস্ত্র নিয়ে মৃত্যুবরণ করা তোমার উচিত।" শ্রীকৃষ্ণেরকথায় অর্জ্জুন তুলে নিলেন তাঁর গাণ্ডীব। আগুনের চারিধারে অর্জ্জুনের সাতবার ঘোরা শেষ হ'তেই শ্রীকৃষ্ণ নিলেন তাঁর সুদর্শন সরিয়ে, সূর্যের শেষ আলো আবার গড়িয়ে পড়ল কুরুক্ষেত্রের বুকে। তখনও দুদণ্ড বেলা আছে। শ্রীকৃষ্ণ জয়দ্রথকে দেখিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব থেকে শোঁ ক'রে একটা বাণ ছুটে গিয়ে কেটে ফেলল জয়দ্রথের মাথা। মাথাটা মাটী না ছুঁয়ে একেবারে গিয়ে প'ড়ল কাম্যবনে তাঁর পিতার কোলে। জয়দ্রথের মাথাটা মাটিতে ফেলে দিতেই তাঁর মুণ্ডটা গেল গুঁড়ো হ'য়ে। শিবের এই রকমই বর ছিল কিনা!

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন জয়দ্রথের মৃত্যুর কথা। পাণ্ডব পক্ষ জয়ধ্বনি দিল।

দুর্যোধন রাগে অগ্নিশর্মা। তিনি হুকুম দিলেন, সেদিন রাতে আর যুদ্ধ বন্ধ রাখা হবে না। লক্ষ লক্ষ মশাল জ্ব'লে উঠল সারা কুরুক্ষেত্রে।

নারায়নী সেনার সঙ্গে অর্জ্জুন লড়তে লাগলেন। দ্রোণ চক্রব্যূহ তৈরি ক'রে যুধিষ্ঠিরকে ধরার চেষ্টায় আছেন। সাত্যকির যুদ্ধে দ্রোণের হার হ'ল। যুদ্ধের ফল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যুধিষ্ঠির বড় ভাবছেন তাই দেখে ঘটোৎকচ 'মার মার' শব্দে ছুটে এল সৈন্যদের মধ্যে। হাতে তার প্রকাণ্ড গদা। ঘটোৎকচের যুদ্ধে পাণ্ডব সেনারা বুকে বল পেল।

ঘটোৎকচ সৈন্য মারতে মারতে ঢুকে প'ল চক্রব্যূহের ভেতর, পেছনে আছেন ভীম প্রভৃতি বীর। ঘটোৎকচের বিকট হাসিতে কৌরবদল ত্রস্ত। তার চেহারা দেখে বিনা যুদ্ধেই অনেক সৈন্য প্রাণ হারাল। ঘটোৎকচ যাকে পায় তাকেই মারে গদার বাড়ি। অলম্বুষ ঘটোৎকচের হাতে প্রাণ দিল।

কৌরব সেনা বুঝি আর বাঁচে না। কর্ণের ছিল একঘাতী অস্ত্র অর্জ্জুনকে মারবার জন্যে। দুর্যোধনের কথায় কর্ণ সেই বাণটা ছুড়লেন ঘটোৎকচের ওপর। ঘটোৎকচ অনেক চেষ্টা ক'রেও, সে বাণটা থামাতে পারল না। বাণটা তার বুকে বিধল বাজের মত। ঘটোৎকচের দেহের চাপে হাজার হাজার কৌরব সেনা মারা গেল।

ছেলের শোকে ভীম পাগলের মত হ'য়ে সৈন্য মারতে লাগলেন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কৌরব সেনা আর লড়তেও পারছে না, দুর্যোধনের ভয়ে পালাতেও পারছে না। অর্জ্জুন তখন যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। কৌরব সেনারা অর্জ্জুনকে ধন্য ধন্য ক'রে উঠল।

যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। নানা দেশের বীর রাজারা রক্ত মাখা গায়ে

কেউ বা হাতীর ওপর কেউ বা ঘোড়ার ওপর, আবার কেউ বা মাঠের ওপর ঘুমিয়ে প'ড়েছেন। চারিধার নিস্তব্ধ। শিবিরে ব'সে অভিমন্যু আর ঘটোৎকচের জন্যে অর্জ্জুন দুঃখ ক'রছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "ঘটোৎকচ না ম'লে ঐ একঘাতী বাণে যেত তোমার প্রাণ।"

অর্জ্জুন বাণের ব্যাপারটা জানতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন "একদিন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধ'রে এলেন কর্ণের কাছে তাঁর কবচ আর কুণ্ডল নিতে। কবচ কুণ্ডল থাকতে ত আর কেউ মারতে পারবে না কর্ণকে! ইন্দ্র এলে কর্ণ তাকে আদর করে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে। ইন্দ্র চাইলেন কর্ণের কবচ কুণ্ডল। কর্ণের মত দাতা বড় দেখা যায় না। তিনি মনে মনে সব জেনেও কবচ কুণ্ডল দিয়ে দিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র বর দিতে চাইলে, তোমাকে মারার জন্যে কর্ণ চেয়ে নিলেন একঘাতী বাণ। সেই বাণটা নষ্ট ক'রে দিল ঘটোৎকচ।"

পরের দিন যুদ্ধে ভগদত্তের হাতে মৃত্যু হ'ল দ্রুপদের। ভগদত্তের হাতী ছুটল ভীমের দিকে। ভীম হাতীটার পা ধরে আছাড় মারতে যান, কিন্তু পারেন না। শেষে তিনি এমন ঘুসি মারলেন হাতীর মাথায় যে, সে চীৎকার ক'রে ভীমকে ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'ল।

ভগদত্ত অর্জ্জুনের সঙ্গে ল'ড়তে এলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে হ'ল তাঁর প্রাণান্ত।

ভগদত্তের মৃত্যুর পর অশ্বত্থামা নামে এক হাতীতে চ'ড়ে দুর্যোধন এলেন ভীমের সামনে। হাতীটা ভীমের গদা সইতে পারল না। গদার এক ঘায়ে হাতীর বিরাট দেহ লুটিয়ে প'ল। মাটিতে দাঁড়িয়ে গদা নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে লাগলেন দুর্যোধন; তবে তাঁকে পালাতে হ'ল ভীমের কাছে হেরে গিয়ে।

দ্রোণের বাণে যেন সবার হবে অবসান। দ্রোণকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করার জন্যে পাণ্ডব পক্ষে রব উঠল " অশ্বথামা হত "। যুধিষ্ঠিরের মুখে ছাড়া একথা বিশ্বাস ক'রবেন না দ্রোণাচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ আর ভীম অনেক ক'রে একথা ব'লতে রাজি করালেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের "অশ্বথামা হত "কথাটা দ্রোণের কানে পৌছিল, কিন্তু গজ—শব্দটা যখন যুধিষ্ঠির বলেন, তখন ঢাক ঢোলের শব্দে কথাটা চাপা প'ড়ে যাওয়ায় ওটা দ্রোণের কানে গেল না। দ্রোণের ধারণা হ'ল তাঁর ছেলে অশ্বথামাই ম'রেছেন, তিনি ছেলের শোকে, রথে ব'সে কাঁদতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এক লাফে রথে উঠে খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেললেন দ্রোণকে। অশ্বথামা পিতৃহত্যার শোধ নিতে প্রতিজ্ঞা ক'রলেন।

# কর্ণ পর্ব্ব

—:•:—

কৌরব পক্ষ বীর শূন্য। ভীষ্ম প'ড়ে আছেন, দ্রোণের মৃত্যু হয়েছে। সবাই মুসড়ে পড়েছেন। ভরসা এখন খালি কর্ণের,—তাঁকে করা হয়েছে সেনাপতি। কর্ণ দুর্যোধনকে খুব সাহস দিলেন।

রাতটা কেটে গেল। কর্ণ ভাল করে সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধ সুরু ক'রলেন। যুদ্ধ জয়ের আশায় তিনি ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন। ভীমের পায়ের দাপে কুরুক্ষেত্র টল মল। নকুল অশ্বথামাকে হারিয়ে দিয়ে যুঝতে এলেন কর্ণের সঙ্গে। নকুল সোজা বীর নন। নকুলের হাতে অনেকবার হার হ'ল কর্ণের। নকুল শেষে কর্ণের হাতে প'ড়ে গেলেন। কুন্তীর কথা মনে হওয়ায় কর্ণ নকুলকে ছেড়ে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ নিয়ে এলেন কর্ণের সমুখে। অর্জ্জুন আর কর্ণে ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে। কোথাও পারঘ, কোথাও শূল, কোথাও তোমর বৃষ্টি হ'চ্ছে। কৌরব পক্ষের সেনা ভয় পেয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। অর্জ্জুনের বাণে কৌরব সেনারা দাঁড়াতে না পেরে, রণ ছেড়ে পালাল। পাণ্ডবপক্ষে বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ল। সে দিনের মত যুদ্ধ হ'ল শেষ।

লজ্জায় কর্ণের মুখ চোখ লাল, তাঁর গর্ব্ব আজ খর্ব্ব। অর্জ্জুনের বাণে কৌরব সেনা ছিন্নভিন্ন, তার ওপর রয়েছে দুর্যোধনের অনুরোধ। যুদ্ধ তাঁকে জিততেই হবে। তিনি দুর্যোধনকে ব'ললেন "অর্জ্জুনের যেমন আছে গাণ্ডীব, আমারো আছে তেমন পরশুরামের দেওয়া বিজয় ধনুক। হয় অর্জ্জুনকে মারব, না হয় তার হাতে দেব আমার প্রাণ। এমন ক'রে আর ফিরে আসব না, কিন্তু শল্যকে হ'তে হবে আমার সারথি।"

দুর্যোধনের মুখে সারথি হবার কথায় শল্যের হ'ল রাগ। তিনি দুর্যোধনের

কাছে বিদায় চাইলেন। কিন্তু দুর্যোধনের খাতির এড়াতে না পেরে তাঁকে হ'তে হ'ল কর্ণের সারথি।

শল্য কর্ণের রথ চালিয়ে চ'লেছেন কুরুক্ষেত্রের দিকে। কর্ণের আস্ফালন শল্যের বড় খারাপ লাগল। তিনি মনে মনে ব'ললেন অর্জ্জুনের ঠিক পাল্লায় প'লে তখন বাছাধন বুঝতে পারবেন।

যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জ্জুন সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধে প্রস্তুত। তাঁকে ঘিরে ধ'রল নারায়নী সেনা। তিনি একে একে প্রায় সকলকেই শেষ ক'রে এনেছেন। কর্ণ এক ছেলে সঙ্গে ক'রে এলেন অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে, কর্ণের ছেলের প্রাণ নিলেন ভীম। শকুনিও হার মান্‌লেন ভীমের কাছে।

যুধিষ্ঠির কর্ণকে একবার হারিয়ে দিয়ে, ফিরে বারে তিনি কর্ণের কাছে হেরে লজ্জায় শিবিরে চ'লে গেলেন।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের খোঁজ নিতে পারেন নি অনেকক্ষণ, তাই তিনি শিবিরে গেলেন দেখ্‌তে। যুধিষ্ঠির ভাবলেন অর্জ্জুন কর্ণকে মেরে বুঝি এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু যখন জানলেন, তা নয়, তখন দুঃখে, ক্ষোভে বেশ দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন অর্জ্জুনকে। কর্ণের হাতে অপমানটা যুধিষ্ঠিরের বুকে বড় লেগেছে। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, "যদি আজ কর্ণকে না মারতে পারি তবে যেন সত্য ভ্রষ্ট হই।"

অর্জ্জুন চলে এলেন যুদ্ধের জায়গায়। ভীম একা কৌরব সেনাদের অস্থির করে তুলেছেন। শকুনিকে সাম্‌নে দেখে ভীম ছুড়ে দিলেন শক্তি অস্ত্র, শকুনি সেটা বাঁ হাতে ধরে মারলেন ভীমকে। ভীম রথের ওপর অজ্ঞান। তার পর উঠে এমন মার দিলেন শকুনিকে, শকুনি কিছুক্ষণের জন্যে উঠ্‌তে পারলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ রথ নিয়ে এলেন যুদ্ধের মাঝখানে। কর্ণ অর্জ্জুনকে দেখে সব রথীকে হুকুম দিলেন অর্জ্জুনকে ঘিরে ফেলতে। তুমুল যুদ্ধের মাঝে ভীম গদা ছুড়ে মেরে দিলেন দুঃশাসনকে। দুঃশাসন সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন। ভীম একলাফে গিয়ে চেপে বসলেন দুঃশাসনের বুকে। তারপর তলোয়ার দিয়ে তাঁর বুক চিরে ঢক্ ঢক্ করে খেতে লাগলেন দুঃশাসনের বুকের গরম রক্ত। ভীমের কি তৃপ্তি হইল, অমৃত খেয়েও বুঝি এমন তৃপ্তি হয় না। দুর্যোধন আর কর্ণ ফেল ফেল করে চেয়ে দেখলেন এই বীভৎস দৃশ্য, ভীমকে বাধা দেবার সাহস হল না কারো। মুখে গায়ে রক্ত মেখে ভীমের চেহারা হল কি ভীষণ। ঐ মূর্ত্তি দেখে যে যেখানে পারল পালিয়ে বাঁচতে চাইল।

কর্ণের ছেলে বৃষ সেনের মৃত্যু হ'ল। একটা একটা ক'রে অনেকগুলো ছেলে হারাতে হ'ল কর্ণের। চোখে অবিরল জল ধারা। কর্ণ মনের আগুন চেপে রেখে সিংহের মত গর্জে উঠলেন। ভীষণ লড়াই চ'লেছে কর্ণ আর অর্জ্জুনের ভেতর।

কর্ণ ছুড়লেন এক দিব্য বাণ, সেই বাণের আগায় এক ভয়ানক সাপ। খাণ্ডববণ দাহে মার মৃত্যুর শোধ নিতে এই সাপ এসেছে বাণের আগায়। বাণের কি জোর,—আজ বুঝি অর্জ্জুনের রক্ষা নেই। শ্রীকৃষ্ণ চাপ দিয়ে —রথখানা বসিয়ে দিলেন মাটিতে, ঘোড়াগুলো হাঁটু গেড়ে ব'সল। বাণটা অর্জ্জুনের মাথার মুকুটটা কেটে দিল। কর্ণ ফের ছুড়লেন এক বাণ, তাতেও সেই সাপ। অর্জ্জুন ছটা বাণে কর্ণের বাণ কেটে দিলেন।

বাণে বাণে অনেক যুদ্ধ হল। আজ যেন কর্ণ সব অস্ত্র ভুলে যাচ্ছেন। অর্জ্জুনের বাণে কর্ণের সকল দেহ ছিন্ন ভিন্ন। পুত্রের দশা দেখে সূর্যদেব আকাশে কাঁপছেন।

কর্ণ বেশ মন ঠিক করে বাণ ছুড়তে লাগলেন। কর্ণের বাণে অর্জ্জুন

বেশ কাবু হয়ে প'লেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় তিনি ছুড়ে দিলেন রুদ্রবাণ। ঠিক সেই সময় কর্ণের রথের চাকা ব'সে গেল মাটিতে। কর্ণ অনুনয় ক'রে সময় চাইলেন অর্জ্জুনের কাছে। অভিমন্যুর মরণের কথা স্মরণ ক'রে রথ তুলবার একটুও সময় দিলেন না অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের বিষম বাণে কর্ণ কাঁপতে কাঁপতে প'ড়ে গেলেন। একটু পরেই হ'ল তার মরণ। কর্ণের তেজ দিনশেষে রাঙা সূর্যে—মিশে গেল। পাণ্ডবপক্ষ ব'লে উঠল, " জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়"।



# শল্য পর্ব

—:০—

কৌরব পক্ষ এক রকম উজোড়। দুর্যোধন ভাইদের বিশেষ ক'রে কর্ণের মরণে একেবারে অসহায়। এখন কৌরবপক্ষে যুদ্ধ চালায় কে! দুর্যোধন ত ভেবে সারা হ'য়ে যাচ্ছেন। অশ্বত্থামার পরামর্শে সেনাপতি করা হ'ল শল্যকে।

শল্য হ'লেন নকুল আর সহদেবের মামা। মামা হ'য়ে এখন তাঁকে মারতে হবে ভাগ্নেদের। ক্ষত্রিয় বীরের সম্বন্ধের বিচার করলে ত চ'লবে না। শল্য ভাল ক'রে সৈন্য সাজাবার হুকুম দিলেন।

পাণ্ডব পক্ষও চুপটি ক'রে ব'সে নেই। তারাও সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

চারিধারে বাজনার শব্দ আর অস্ত্রের ঝন ঝনায় কুরুক্ষেত্র মুখরিত। আজ যুধিষ্ঠিরের জোরে কৌরব সৈন্য দাঁড়াতে পারছে না। শল্য ভীম বিক্রমে আক্রমণ ক'রলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে এলেন ভীম আর অন্য রাজারা। ভীমের গদায় ব্যথা পেয়ে শল্য ছুড়ে দিলেন শক্তি। শক্তি বিঁধল ভীমের বুকে ভীম খুব জোরে সেই শক্তি উপড়ে নিয়ে ছুড়ে দিলেন শল্যের দিকে। শল্য শক্তির ঘা সইতে না পেরে জ্ঞান হারালেন।

তারপর ভীম শল্যের সঙ্গে সুরু ক'রলেন গদা যুদ্ধ। ভীমের গলার আওয়াজে কৌরব সেনারা ভয় পেয়ে গেল।

শল্য গদা ছেড়ে ধ'রলেন ধনুক। শল্যের বাণে ভীম কাহিল। তখন যুধিষ্ঠির শল্যের এমন অবস্থা ক'রলেন যে, শল্য আর উঠে দাঁড়াতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ শল্যকে মেরে ফেলতে ব'ললেন।

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জ্ঞান আছে। ঐ অবস্থায় শল্যকে মারতে তাঁর

হাত ওঠে না। শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন "শত্রুর প্রতি ক্ষমা নেই। একবার মনে করুন অভিমন্যুর মরণের কথা।"

অভিমন্যুর কথা মনে পড়ায় যুধিষ্ঠিরের অন্তর জ্ব'লে উঠল। যুধিষ্ঠির শল্যের ওপর ছুড়ে দিলেন শক্তি অস্ত্র, তাতেই শল্য প্রাণ হারিয়ে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে গেলেন মাটিতে। কৌরব সৈন্য—ছত্র ভঙ্গ হ'য়ে প'ল। সেনা-পতি নেই, যুদ্ধ চলে কেমন ক'রে।

শকুনি দুর্যোধনকে যুদ্ধ থামিয়ে—পাণ্ডবদের সঙ্গে মিতালি করতে ব'ললেন। দুর্যোধন ভাবলেন, শকুনি ভয় পেয়ে এমন কথা ব'লছেন।

দুর্যোধন নিজে এলেন সৈন্যদের সাহস দিতে। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণ—সহ্য করা তাঁর শক্ত হ'ল। ভীমের গদায় কৌরব সেনা ম'রে গাদা হ'য়ে যেতে লাগল। কৌরব পক্ষের আর গোটাকতক সৈন্য মারতে পারলেই পাণ্ডবদের হয় জয়।

দুর্যোধনের কথায় শকুনি সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ জুড়ে দিলেন। তাঁর ছেলে উলুক এলেন তাঁর সাহায্যে, কিন্তু ভীমের বাণে তাঁর প্রাণপাখী উড়ে গেল।

শকুনি ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে শেল, শক্তি, তোমর প্রভৃতি যত অস্ত্র জানা ছিল তাঁর, সব ছুড়তে লাগলেন, কোনই ফল হ'ল না তাতে। শকুনির রথ গেল, সারথি গেল, ঘোড়া গেল। শকুনি পালাতে লাগলেন। পাণ্ডব সৈন্যরা হাত তালি দিয়ে পেছনে ছুটে ধ'রে আনল শকুনিকে সহদেবের সামনে। অপমান আর সইতে পারছেন না শকুনি। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁকে মেরে ফেলতে ব'ললেন সহদেবকে। সহদেব প্রথমে কাটলেন তাঁর হাত দুটো। এই হাতেই পাশা খেলে ত তিনি দিয়েছেন তাঁদের এত কষ্ট। তারপর সহদেব তলোয়ারের কোপে কাটলেন শকুনির মাথা।

কৌরবপক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য হ'ল শেষ। দুর্যোধন, কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা প্রভৃতি ছাড়া আর বেশী কেউ বেঁচে নেই কৌরবপক্ষে। দুর্যোধন একেবারে ম্রিয়মাণ।

মলিন বেশ, চোখে জল, গদা হাতে চ'লেছেন দুর্যোধন, সঙ্গে লোক নেই একজনও। পথে সঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। সঞ্জয়কে তাঁর পিতার কাছে দুঃখের কাহিনী ব'লতে ব'লে দ্বৈপায়ন হ্রদে ঢুকে প'লেন একান্ত অসহায় দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র সব শুনলেন সঞ্জয়ের মুখে। কান্না ছাড়া আর কি গতি আছে তাঁর। তিনি মনে মনে বুঝলেন, "যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"

যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে পাঠিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। যুযুৎসু প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে কোলে টেনে নিলেন।

# গদা পর্ব্ব

—:০:—

যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হ'য়েছে। কিন্তু দুর্যোধনের কোন খোঁজ না পাওয়ায় যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি নেই। শত্রুর শেষ যে রয়ে গেল। আবার কখন দুর্যোধন এসে অশান্তি বাধায় কে জানে! নানান জায়গায় চর পাঠান হ'ল, কেউ কোন খবর আনতে পারে না।

কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা আর অশ্বত্থামা কেমন ক'রে খোঁজ পেয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে দেখা ক'রলেন দুর্যোধনের সঙ্গে। তখনও তাঁকে খুব সাহস দিলেন অশ্বত্থামা।

যখন তাঁদের কথা বার্তা চ'লছে, ঠিক সেই সময় এক ব্যাধ হ্রদে জল খেতে এসে দেখে ফেলল দুর্যোধনকে।

ব্যাধ মনে ক'রল দুর্যোধনের খবরটা যদি পাণ্ডবদের জানান যায়, তবে তাঁরা খুব খুশি হবেন। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ভীমকে দিল দুর্যোধনের খবর। ভীম আনন্দে লাফিয়ে উঠে যুধিষ্ঠিরকে ব'ললেন দুর্যোধনের কথা। তাঁরা সবাই তখন চ'ললেন দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে, তাঁদের সঙ্গে আছে অনেক বাজনা। বাজনা আর লোকের শব্দ শুনে দুর্যোধন ব'ললেন, "কারা এই দিকেই আসছে না? আপনারা কাছে কোথাও লুকিয়ে থাকুন, আমি ঢুকে পড়ি দ্বৈপায়নে। পরে আর সব কথা কওয়া যাবে।" এই বলে দুর্যোধন দ্বৈপায়নে লুকিয়ে প'ড়লেন।

যুধিষ্ঠির হ্রদের ধারে এসে অনেক কড়া কথা শোনাতে লাগলেন দুর্যোধনকে। কথা আর কত সহা যায়। দুর্যোধন মাথা তুললেন জলের ওপর। যুধিষ্ঠিরের কথায় রাগও তাঁর কম হয় নি। তিনি ব'ললেন, "আজ আমার কিছু নেই, মরণের ভয় আমি করি নে।

যে আমার সঙ্গে যুঝতে চায়, আমি তারই সঙ্গে যুঝব। তবে আমার যখন গদা ছাড়া আর অস্ত্র নেই, তখন গদা যুদ্ধই ক'রতে চাই আমি। ভীম ছাড়া আর কেউ আমার গদার ঘা সইতে পারবে না, তাই প্রতি পক্ষ হিসাবে আমি বেছে নিলাম ভীমকে। ভীমের প্রাণ নিয়ে তুলব আমার অন্তরের কাঁটা।"

দুর্যোধনের বীর হৃদয় নেচে উঠল। তিনি গদা নিয়ে উঠে এলেন জল থেকে।

ভীম শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে গদা হাতে মূর্তিমান্ যমের মত দাঁড়ালেন।

গদা যুদ্ধের উপক্রম। দুজনেই প্রাণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। এমন সময় তীর্থ যাত্রা সেরে বলরাম সেখানে গিয়ে হাজির। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বলরাম তীর্থ ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। বলরামের তীর্থে যাওয়ার ব্যাপারটা শুনবার মত কথা।

একদিন সূত নৈমিষারণ্যে পুরাণ পাঠে ব্যস্ত, এমন সময় বলরাম সেখানে গিয়ে উপস্থিত। সূত বেদীতে ছিলেন, তাই বলরামকে সম্মান দেখাতে পারলেন না তিনি। এই অপমানে বলরাম সূতের প্রাণ নাশ করেন। সেই পাপে বেদব্যাসের কথায় যেতে হ'ল তাঁকে তীর্থে পুণ্য লাভের জন্য।

শাণ্ডিল্য আশ্রমে বলরাম শুনলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা, আর শুনলেন ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের গদা যুদ্ধের উপক্রম, তাই তিনি তাড়াতাড়ি এলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে।

শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সব ব'ললেন, অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা তাঁকে জানাতে ভুললেন না। তখনও পাঁচটা জায়গা ছেড়ে দিলে দুর্যোধনের সঙ্গে ঝগড়া মিটে যেতে পারে, সে কথাও তিনি জানালেন বলরামকে।

দুর্যোধন বলরামের অনুরোধও রাখতে রাজি নন।

দুজনে চ'লল যুদ্ধ। ভীম দুর্যোধনকে পেরে ওঠেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন ভীমের দুর্যোধনের উরু ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞার কথা। ভীম অন্যায় যুদ্ধে একটু ইতস্ততঃ ক'রলেন। কিন্তু যখুনি তার মনে জাগল, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা, তখুনি তিনি গদার ঘায়ে ভেঙ্গে দিলেন দুর্যোধনের উরু। দুর্যোধন দাঁড়াতে পারলেন না, প'ড়ে গেলেন। ভীম লাথি মারলেন দুর্যোধনের মাথায়, লাথির চোটে তাঁর ঝলমলে মুকুটটা গুঁড়ো হ'য়ে গেল।

এই অন্যায় যুদ্ধের জন্য বলরাম গেলেন চ'টে। শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের শত শত অন্যায়ের কথা বলরামকে বুঝিয়ে দিলেন। বলরাম আর কিছু না ব'লে দ্বারকায় চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে নিয়ে শিবিরে চ'ললেন, সেখানে একা প'ড়ে রইলেন দুর্যোধন!

# সৌপ্তিক পর্ব্ব ঃ

—ঃ০ঃ—

ঘোর অন্ধকার রাত। কুরুক্ষেত্রের চারদিকে খালি শোনা যাচ্ছে শেয়াল কুকুরের ডাক। এখানে, ওখানে, প'ড়ে র'য়েছে, হাত, পা, আর মানুষের মাথা। হাতী ঘোড়ার দেহ আর ভাঙ্গারথে কুরুক্ষেত্র একাকার। কেমন একটা বিকট দুর্গন্ধ। তারই মাঝে প'ড়ে আছেন দুর্যোধন।

দুর্যোধনকে দেখা দিলেন কৃপাচার্য, কৃতবর্ম্মা আর অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামা জানালেন, তখনও তাঁকে সেনাপতি ক'রলে তিনি পাণ্ডবদের সবংশে শেষ করে দিতে পারেন। ডুবন্ত লোক খড় ধ'রে বাঁচতে চায়। আজ সেই দশা হ'ল দুর্যোধনের। তিনি সেনাপতি ক'রলেন অশ্বত্থামাকে।

বীর তিন জন চ'ললেন পাণ্ডবদের শিবিরের দিকে। এত অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা তিন জনে ব'সলেন একটা গাছের তলায়। হঠাৎ ঐ গাছের ওপর শোনা গেল কাক আর পেঁচার শব্দ। কিছু পরে কাকের শব্দ গেল থেমে, আর ঝুপ ঝাপ ক'রে তাঁদের পায়ের কাছে প'ল কতগুলো পাখীর দেহ। পেঁচাগুলো চীৎকার ক'রে উড়ে গেল। অশ্বত্থামা বুঝলেন, পেঁচারা ঘুমন্ত কাকগুলোর প্রাণ নিয়ে পালাল। তাঁর মাথায় গজাল এক বুদ্ধি। তিনি কৃপাচার্য আর কৃতবর্ম্মাকে ব'ললেন, "ঘুমন্ত পাণ্ডবদের মেরে ফেলতে পারলে মন্দ হয় না।" এত কাপুরুষতা! তাঁরা অশ্বত্থামার কথায় সায় দিতে পারলেন না।

অশ্বত্থামা ব'ললেন, "ছলে, বলে, কৌশলে শত্রু নিপাত করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ হয়েও যখন ধ'রেছি ক্ষত্রিয়ের কাজ, তখন ক্ষত্রিয়ের রীতি মেনেই চ'লতে হবে আমাকে।"

অশ্বত্থামা শিবিরের দিকে এগুলেন, পিছু চ'ললেন কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা।

পাণ্ডবেরা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছেন অন্য শিবিরে। প্রহরীও একটা জেগে নেই। অশ্বত্থামা দেখলেন শিবির পাহারা দিচ্ছেন একজন। অদ্ভুত চেহারা তাঁর। মানুষের মত দেহ, অথচ চারটে হাত! অশ্বত্থামা শিবিরে ঢুকতে গিয়ে তাঁর কাছে পেলেন বাধা। অশ্বত্থামা বাণ ছুড়ে মারতে লাগলেন। তিনি সব বাণই গিলে ফেললেন। তখন পরিচয়ে জানা গেল তিনি স্বয়ং মহাদেব।

অশ্বত্থামা স্তবে তুষ্ট ক'রলেন মহাদেবকে। মহাদেব বর দিতে চাইলেন, অশ্বত্থামা চাইলেন শিবিরে ঢোকার বর। কিছুতেই হয় না! তখন অশ্বত্থামা আত্মহত্যায় প্রস্তুত হ'লেন। মহাদেব বাধ্য হ'য়ে অভীষ্ট বর দিলেন অশ্বত্থামাকে। অশ্বত্থামা চেয়ে নিলেন শিবের খাঁড়া। শিব কৈলাসে চ'লে গেলেন।

অশ্বত্থামা ঢুকলেন শিবিরে, বাইরে রইলেন কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা। অনেক খুঁজে খুঁজে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেললেন। দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছেন। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অশ্বত্থামা মনে ভাবলেন, তাঁরাই পাঁচ পাণ্ডব। চুপি চুপি তাঁদের মাথা কেটে বেঁধে ফেললেন একখান কাপড়ে। এর মধ্যে জেগে উঠেছে শিবিরের প্রহরীর দল। শিখণ্ডী বাধা দিলেন অশ্বত্থামাকে কিন্তু তিনি মারা প'লেন অশ্বত্থামার হাতে। অশ্বত্থামা একাই খাঁড়া দিয়ে সৈন্য কাটতে কাটতে শিবির থেকে বেরিয়ে কৃপাচার্য আর কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে চ'ললেন দুর্যোধনের কাছে।

দুর্যোধন প'ড়ে আছে। হাঁটুর যন্ত্রণায় অস্থির। অশ্বত্থামা গিয়ে পাঁচ পাণ্ডবের

মাথা ব'লে খুলে দিলেন মাথা ক'টা দুর্যোধনের সামনে। দুর্যোধনের ভারি আনন্দ !

আগে চাই ভীমের মাথাটা। অন্ধকারে হাতড়ে যেটা বড় মাথা দেখলেন সেইটে ভীমের মাথা ভেবে যেমন হাতের একটু চাপ দিলেন অমনি মচ্ ক'রে গেল মাথাটা ভেঙে, আর চারটে মাথা'ও ভেঙে গেল খুব সহজে।

ভীমের মাথা ব'লে যে মাথাটা ভাঙ্‌লেন, সেটা অত সহজে ভাঙ্‌ল দেখে তাঁর মনে হ'ল সন্দেহ। যে মাথা পেতে নিয়েছে কত গদার ঘা, তার মাথাও অত সহজে ভাঙ্‌বে না। তিনি বেশ বুঝলেন, মাথা গুলো পাণ্ডবদের নয়, মাথাগুলো পাণ্ডবদের ছেলেদের। দুর্যোধন কেঁদে ফেললেন। তারপর অশ্বত্থামাকে ব'ললেন, "আজ এ কি কাজ ক'রলে অশ্বত্থামা। কুরুবংশের জল পিণ্ডের আশা লোপ ক'রে দিলে একেবারে। উঃ, কি অন্যায়—কি অন্যায়—কি অন্যায় ক'রলে অশ্বত্থামা।" দুর্যোধন আর কথা কইতে পারলেন না, শোকে তাঁর বুক ফেটে গেল। তিনি মরণের কোলে ঢ'লে প'ড়লেন। রাজার এই দশা দেখে দুফোঁটা জল দেখা দিল অশ্বত্থামার চোখে।

# ঐষিক পর্ব্ব ।

—:১:—

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবেরা ছিলেন অন্য শিবিরে। রাতের ঘটনা তাঁরা জানেন না কেউ। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি কোন রকমে ছিল বেঁচে। সে গিয়ে রাতের ঘটনা জানাল যুধিষ্ঠিরকে।

দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে যুধিষ্ঠির অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'ল, বনবাসই ছিল তাঁর ভাল। এই যুদ্ধে তাঁর লাভ হ'ল কি? জ্ঞাতি গেল, বন্ধু গেল, কুটুম্ব গেল, আপন বলতে আর থাকল ক'জন! শেষে কিনা জলপিণ্ডের আশাও হ'ল লুপ্ত! দুঃখে যুধিষ্ঠিরের প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। দ্রৌপদীর অন্তরের ব্যথা বোঝাবার নয়।

যুধিষ্ঠির আর দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়ে ভীম ব'ললেন, "জন্ম হ'লেই হবে মরণ। দুঃখ ক'রে লাভ কি?"

দ্রৌপদীর মন কিছুতেই মানে না। তিনি ভীমকে ব'ললেন, "অশ্বত্থামার মাথায় আছে মণি। সেই মণি পেলে তবে কতকটা দুঃখ যাবে আমার।"

ভীম যুধিষ্ঠিরের অনুমতি চাইলেন। যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "যে যেমন কাজ করে, ফল হয় তার সেই রকম।" ভীম, তুমি যাও, দ্রৌপদীর আশা পূর্ণ কর।"

ভীম নকুলকে সারথি ক'রে চ'ললেন অশ্বত্থামার সন্ধানে। শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "ভীম সেন গিয়ে কাজটা ভাল ক'রলেন না। তাঁর সাধ্য কি, তিনি অশ্বত্থামাকে জয় করেন! অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির নামে যে ভয়ানক অস্ত্র র'য়েছে! একবার অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্রের বদলে চাইলেন আমার সুদর্শন। আমি তাঁকে দিলাম আমার সুদর্শন। তিনি

তা তুলতে না পেরে ব'ললেন, তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্রই পারবে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস ক'রতে। এ হেন অস্ত্র রোধ করা ভীমের কাজ নয়।"

উপায় শ্রীকৃষ্ণকেই ক'রতে হবে। তাই তিনি অর্জ্জুনকে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লেন ভীমের পিছু পিছু।

অশ্বত্থামা প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বেদব্যাসের আশ্রমে। ভীম খুঁজে খুঁজে তাঁকে ধ'রে ফেললেন। ভীমের মূর্ত্তি দেখে ভয়ে অশ্বত্থামা ছুড়ে দিলেন ব্রহ্মশির। সর্ব্বনাশ! প্রলয়ের আগুন দেখা দিল যে বাণে। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন এসে প'ড়লেন সেখানে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় ঐ বাণ রুখবার জন্য অর্জ্জুন মন্ত্র প'ড়ে ছুড়ে দিলেন এক দিব্য বাণ। দুই বাণে মিলন হ'ল মাঝ পথে। তা থেকে হ'ল উল্কাপাত। উল্কার শব্দ কাঁপিয়ে দিল স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল। দেবতারাও ভাবলেন বিশ্ব চরাচর সেই দিনই পাবে লয়।

বেদব্যাস আর নারদ দাঁড়ালেন বাণ দুটোর নীচে। তাঁরা দুজনকেই বাণ ফিরিয়ে নিতে ব'ললেন। অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভনাশ না ক'রে বাণ ফিরুতে রাজি নন, অর্জ্জুনও চান না বাণ ফিরুতে অশ্বত্থামার মাথার মণি না নিয়ে। বেদব্যাসের কথায় অশ্বত্থামা নিজের মাথার মণি কেটে দিলেন অর্জ্জুনের হাতে। অর্জ্জুন বাণ থামিয়ে দিলেন। অশ্বত্থামার বাণ শোঁ শোঁ শব্দে গিয়ে উত্তরার গর্ভে ঢুকে উত্তরার সন্তানের প্রাণ নাশ ক'রে তবে ফিরে এল। শ্রীকৃষ্ণ গর্ভের সন্তানকে দিলেন বাঁচিয়ে।

অশ্বত্থামার মাথা জ্ব'লে যাচ্ছে। বেদব্যাস ব'ললেন, "বাছা, যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। তবে লোকে তেল মাখার সময় "অশ্বত্থাম্নে নমঃ" ব'লে তিনবার তেলের ছিটে দেবে তোমার উদ্দেশ্যে। তাতেই হবে তোমার জ্বালার শান্তি।"

ভীম মণি দিলেন দ্রৌপদীর হাতে। তিনি তা পরিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরের মুকুটে। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় সব শোক ভুলে গেলেন পাণ্ডবেরা।



# স্ত্রী পর্ব্ব ।

—:০:—

ধৃতরাষ্ট্র একশ' ছেলে হারিয়ে শোকে আত্মহারা হ'য়ে প'ড়েছেন। তাঁর মনে হ'ল, তিনি আগে থেকে সাবধান হ'লে আজ তাঁকে এমন ক'রে কাঁদতে হ'ত না। তাঁর সব চেয়ে রাগ ভীমের ওপর। ভীমকে হাতের গোড়ায় পেলে তাঁকে মেরে পুত্র শোক কতকটা ভুলতে চান তিনি।

সঞ্জয় অনেক ক'রে তাঁকে বোঝালেন। বিদুর সান্ত্বনা দিয়ে ব'ললেন "কি আর ক'রবেন কেঁদে। নিয়তির হাত ত এড়ান যায় না?"

ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারেন না। বেদব্যাস নানা রকম উপদেশ দিয়ে ব'ললেন, "যা গিয়েছে তার জন্য শোক করা বৃথা। কাল দুর্যোধনের রূপ ধ'রে জন্মেছিলেন গান্ধারীর গর্ভে, তাঁর সঙ্গী হ'য়ে ছিলেন কর্ণ আর শকুনি। তোমার ছেলেরা নিজের নিজের কাজের ফল ভোগ ক'রেছে।"

ধৃতরাষ্ট্র কিছু শান্ত হ'লে সঞ্জয় ব'ললেন, "অনেক দেশের রাজা ম'রেছেন কুরুক্ষেত্রে। তাঁদের শ্রাদ্ধ তর্পণ ক'রবেন চলুন।"

ধৃতরাষ্ট্র উঠ্‌লেন, সঙ্গে চ'ললেন অন্তঃপুরের মেয়েরা। দেবতারা যাঁদের দেখতে পেতেন না. তাঁরাই কিনা আজ চ'লেছেন আলুথালু বেশে রাজপথের ওপর দিয়ে। তাঁদের কেউ বা স্বামীর শোকে, কেউ বা ছেলের শোকে, কেউ বা আত্মীয়ের শোকে পাগল।

পথে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা ক'রে কৃপাচার্য গেলেন হস্তিনায়, অশ্বত্থামা গেলেন বেদব্যাসের আশ্রমে আর কৃতবর্মা গেলেন নিজের বাড়িতে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব'সে আলাপ ক'রছেন পাণ্ডবেরা। গান্ধারীর অভিশাপকে বড় ভয় ক'রছেন তাঁরা। তাঁদের ধারণা গান্ধারীর রাগের

ফল হবে ভয়ানক। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, "ভাই কৃষ্ণ, তুমি ভাইদের নিয়ে লুকিয়ে রাখ। আমি একলাই ক'রব মা গান্ধারীর রাগের ফল ভোগ।"

শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চাইলেন, কেন তিনি তাঁর এমন দশা ক'রলেন। শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন, তাঁর কথা আগে থেকে শুনলে এমন ধারা কখনই হ'তে পারত না। হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্রের চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখে ফুটে উঠল রাগের চিহ্ন। তিনি তখনই চাইলেন ভীমকে কোলে নিতে। শ্রীকৃষ্ণ, যা ঘটবে তা আগেই জানতেন। তিনি একটা লোহার ভীম তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন, সেইটা দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সামনে। মূর্ত্তিটা হাতে পেয়েই ধৃতরাষ্ট্র সেটা খুব জোরে চেপে ধ'রলেন নিজের বুকে আর মড় মড় ক'রে লোহার মূর্ত্তিটা গুঁড়ো হ'য়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন, ভীমেরই ক'রেছেন দফা শেষ। পরেই তিনি হা হুতাশ ক'রে ব'ললেন, "শেষে ভীমকে মেরে ফেললাম আমি।"

শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন, "আপনার কোন ভাবনা নেই। ভীম বেশ ভালই আছেন। আপনি যেটা ভাঙ্গলেন, ওটা ছিল একটা লোহার মূর্ত্তি। যাক্, রাগ ত মিটেছে আপনার। আর নিষ্ঠুরতার ঠাঁই দেবেন না মনে।"

ধৃতরাষ্ট্র শান্ত হ'য়ে পাণ্ডবদের আশীর্ব্বাদ ক'রলেন।

গান্ধারী মনে মনে ভাবছেন, তিনি দেবেন পাণ্ডবদের অভিশাপ। বেদব্যাস ব'ললেন "কেন বৃথা রাগ ক'রছ তুমি? দুর্যোধন যাবার আগে প্রণাম ক'রতে এলে তুমিইত ব'লেছিলে "যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।" ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মেরই ত ক্ষয় হ'য়েছে। এখন সব রাগ ভুলে পাণ্ডবদের ছেলের মত ভালবাসা তোমার উচিত।"

গান্ধারীর কাছে এলেন পাণ্ডবেরা। গান্ধারী কোন কথা না ব'লে, ছাড়লেন একটা দীর্ঘশ্বাস। যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সব পাণ্ডব ভয়ে গেলেন পালিয়ে।

গান্ধারীর মনের হিংসা কেটে গেল। তিনি প্রাণ ভ'রে পাণ্ডবদের ক'রলেন আশীর্ব্বাদ।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিয়ে দেখা ক'রলেন কুন্তী দেবীর সঙ্গে। কুন্তী পাণ্ডবদের কোলে তুলে নিয়ে অঝোরে কাঁদছেন। শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন, "পাণ্ডবেরা এখন ক'রবেন নিস্কণ্টক রাজ্য ভোগ। এখন আপনার দুঃখ কি?"

কুন্তীর প্রাণে বইছে শোকের ঝড়। আহা! এই পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে যদি তিনি কর্ণকেও কোলে নিতে পারতেন! উত্তরা সবাইকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন,—তাঁর চোখে ঝ'রছে অবিরল অশ্রুধারা।

তারপর সকলে নিজেদের আত্মীয়দের দেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

গান্ধারী দুর্যোধনের দেহ দেখেই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে তাঁর মুখে শুধু শোনা গেল, দুর্যোধন, আর দুর্যোধন। তাঁর যত রাগ হ'ল শ্রীকৃষ্ণের ওপর। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, "তুমি থাকতে যেমন হ'ল আমাদের বংশ নাশ, তেমনি আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার বংশও হ'বে ধ্বংস এমনি ভাবে কাটাকাটি ক'রে।"

ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গায় স্নান সেরে তাঁর ছেলেদের আর রাজাদের তর্পণ ক'রলেন।

কুন্তী এতো দিনে কর্ণের পরিচয় দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠিরের বড় অনুতাপ হ'ল। আগে যদি জানতেন, কর্ণ তাঁরই বড় ভাই, তবে এমন ক'রে তাঁকে মারতে হত না।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির কর্ণ প্রভৃতির তর্পণ শেষ করে নিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি বসেন হস্তিনার সিংহাসনে। যুধিষ্ঠির কিছুতেই রাজি নন। জ্ঞাতি বন্ধুদের মেরে কলঙ্কের ডালি মাথায় ক'রে তিনি ব'সবেন হস্তিনার সিংহাসনে। তার চেয়ে বরং কুরুক্ষেত্রে প'ড়ে থেকে করবেন এই জ্ঞাতি, বন্ধু বধের প্রায়শ্চিত্ত।

বেদব্যাস ব'ললেন, "ভীষ্মের দর্শনে সব পাপ কেটে যাবে। তিনি যে গঙ্গার ছেলে!"

যুধিষ্ঠির শান্ত হ'লে আনন্দ পেলেন শ্রীকৃষ্ণ আর যুধিষ্ঠিরের ভায়েরা।

ভাল সময় দেখে সবাই ঢুকলেন রাজবাড়ীতে। প্রজারা যুধিষ্ঠিরকে পেয়ে আমোদে মেতে উঠল। গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে রাজা হ'তে ব'ললেন। যুধিষ্ঠির লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলেন।

গান্ধারী ব'ললেন, "দুঃখ ক'র না বাবা! আমার ছেলেরা ম'রেছে তাদের আপন পাপে।"

যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। আনন্দ কোলাহলের মাঝখানে যুধিষ্ঠির ব'সলেন হস্তিনার সিংহাসনে।



## শান্তি পর্ব্ব ।

—:০:—

যুধিষ্ঠিরকে পেয়ে প্রজারা সুখে দিন কাটাচ্ছে। তাদের মনে হচ্ছে, যেন তারা রামরাজ্যেই বাস ক'রছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে এক তিল শান্তি নেই। দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিকে হারিয়ে সব সময় তাঁর আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছা হচ্ছে। বেদব্যাস এসে যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব জেনে ব'ললেন, "যাঁর নাম শুনলে, যাঁর রূপ দেখলে সব পাপ ও অশান্তি দূর হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণই তোমার সঙ্গী, তবে কেন তুমি আত্মহত্যা করতে চাও? আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যার কথা মনেও ঠাঁই দিও না। তুমি ভীষ্মদেবের কাছে যাও, তিনি উপদেশ দিয়ে তোমার মনের কালি মুছে দেবেন।"

বেদব্যাসের আদেশ মাথায় ক'রে যুধিষ্ঠির সব পরিজন আর প্রজাদের অনেককে নিয়ে গেলেন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম সকলকে দেখে খুব সুখী হ'লেন।

যুধিষ্ঠিরের কেবল 'হা, হুতাশ।' জ্ঞাতি বন্ধু হত্যায় তিনি অনেক দুঃখ ক'রলেন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি দেবার আশায় হরিনাম মাহাত্ম্য, দানধর্ম, একাদশীর কথা, নরক ভোগের কারণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। ভীষ্মের কথায় যুধিষ্ঠির অনেকটা শান্তি পেলেন মনে।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ব'ললেন, "নিজের ভোগ বিলাস ছেড়ে দিয়ে, প্রজাদের সুখ দেওয়াই রাজার উচিত, কারণ রাজাই যে প্রজাদের একমাত্র ভরসা। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ ক'রতে ভুলো না"

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী। বড় ভাল দিন। আজ হবে ভীষ্মরূপী অষ্টম বসুর শাপ বিমোচন। দিকে দিকে একটা মঙ্গলের চিহ্ন

দেখা দিল। গাছে গাছে নানা ফুল, তাতে মৌমাছির গুন্ গুন্ শব্দ। পাখীর ডাকে সমস্তই যেন মুখরিত। একটা মিষ্ট গন্ধে সব দিক আমোদিত। ইন্দ্রপুরীতে 'জয়, জয়' রব। স্বর্গের দামামা বেজে উঠ্ল। ভীষ্মদেবকে এগিয়ে নেবার জন্য দেবতাদের সঙ্গে সাত বসু আকাশে হাজির। ইন্দ্রের রথ নিয়ে মাতলি নেমে এলেন মর্ত্ত্যে।

ভীষ্ম পাণ্ডবদের ভার তুলে দিলেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে, এত আদরের পাণ্ডবদের তিনি আশ্রয় হারা দেখে যান কেমন ক'রে।

অল্প পরেই ভীষ্মের সারা গায়ে দেখা গেল পুলকের রোমাঞ্চ, তাঁর মুখে শোনা গেল অবিরাম কৃষ্ণনাম, তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে প'ল প্রেমের অশ্রু। ভীষ্মের সাম্‌নেই নবঘন শ্যাম সুন্দরের বিশ্ব বিমোহন রূপ। ভাবে গদ গদ ভীষ্ম আর কোন কথা কইতে পারলেন না, তাঁর চোখের পাতা দুটো এল বুঁজে, তিনি ফেললেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস। আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হ'তে লাগল, সবার কাণে ভেসে এল একটা মধুর গানের তান। শৌর্য্য বীর্য্যের, সত্য ধর্ম্মের অবতার ভীষ্ম মর্ত্ত্যের মাটি ছেড়ে গেলেন, ভারত হারাল চিরকালের মত তার অনুপম আদর্শ।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কেঁদে লুটিয়ে প'ড়লেন, আর বসুরা ভীষ্মরূপী অষ্টম ভাইকে ফিরিয়ে পেয়ে আহ্লাদে স্বর্গে চ'লে গেলেন।

বেদব্যাসের সান্ত্বনায় নিজেকে খানিকটা সাম্‌লে নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের দেহের সংকার ক'রে তর্পণ সেরে নিলেন, তারপর রাশি রাশি ধন দান ক'রলেন ব্রাহ্মণ আর দীন দুঃখীকে।

# অশ্বমেধ পর্ব্ব।

—:০:—

যুধিষ্ঠির খুব যত্নে প্রজা পালন ক'রছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন ব'সছে না। জ্ঞাতিদের, বিশেষ ক'রে ভীষ্মের মৃত্যুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তিনি।

বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু যজ্ঞ ক'রবার টাকা কৈ যুধিষ্ঠিরের। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর ভাণ্ডার ত একেবারে খালি হ'য়ে গিয়েছে। এত টাকা এখন পাওয়া যায় কোথায় !

বেদব্যাস ব'ললেন, "রাজা মরুত্তের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা যে ধন রত্ন পেয়েছিলেন, তা তাঁরা ব'য়ে নিয়ে যেতে পারেন নি, তাই তাঁরা অনেক ধন রেখে গিয়েছেন হিমালয়ে। সেই ধন এনে যজ্ঞ কর।"

ব্রাহ্মণের ধন কেমন ক'রে নেবেন যুধিষ্ঠির ! তখন বেদব্যাস শাস্ত্রের কথা তুলে বুঝিয়ে দিলেন, ধন, জমি, অগ্নি, আর জল কেউ ছেড়ে গেলে, তা নিলে কোন দোষ হয় না। ধনের ব্যাপার ত মিটল, এখন ঘোড়া পাওয়া যায় কোথায় !

বেদব্যাস ব'ললেন, "রাজা যুবনাশ্বের বাড়িতে আছে খুব ভাল একটা ঘোড়া ; রাজা ঘোড়াটা খুব যত্নে রেখেছেন। সেই ঘোড়া এনে যজ্ঞ হ'তে পারবে।"

এ আর এক হাঙ্গামা। একে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক'রেই যুধিষ্ঠিরের মন খারাপ, তা'তে ঘোড়া আন্‌তে গিয়ে আবার ক'রতে হবে আর একটা যুদ্ধ। কাজ নেই অশ্বমেধে।

বেদব্যাস অনেক বোঝালেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "ঘোড়া আনতে যাবে কে ?"

ভীম এগিয়ে এসে ব'ললেন, "ভয় কি দাদা ? আমি আনব সেই

ঘোড়া।" ভীমের সাথী হ'তে চাইলেন কর্ণের ছেলে বৃষকেতু আর ঘটোৎকচের ছেলে মেঘবর্ণ।

ধন আনার ভার প'ল অর্জ্জুনের ওপর। তিনি রথে করে হিমালয় থেকে নিয়ে এলেন প্রচুর ধন রত্ন।

বেদব্যাস যজ্ঞের নিয়ম ব'লে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে, "যজ্ঞ স্থরু ক'রবে মধুচৈত্রে। অশ্বমেধের কাল রঙের আর হল্‌দে লেজ ওয়ালা ঘোড়াটাকে বেশ ক'রে সাজিয়ে তার কপালে লিখে দেবে, "এই ঘোড়া যে ধ'রবে, তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ঘোড়া কেড়ে নেওয়া হবে,।" তার তলায় লিখে দেবে তোমার নাম। ঘোড়া দেশ জয় ক'রে না আসা পর্য্যন্ত তুমি দ্রৌপদীকে নিয়ে ব'সে থাকবে একাসনে. আর তোমাদের মাঝে থাকবে একখানা ধারাল তলোয়ার। যখনি মনের অবস্থা খারাপ দিকে যাচ্ছে মনে হবে, তখনি ঐ অস্ত্রে নিজেকে কেটে ফেলবে। এর নাম অসিপত্রব্রত। অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রলেই তোমার সব পাপ কেটে গিয়ে মন সাফ হ'য়ে যাবে।" এই কথা ব'লে বেদব্যাস আশ্রমে চ'লে গেলেন।

যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে আনালেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণকে না দেখে এক দণ্ড থাকতে পারেন না যুধিষ্ঠির। শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁর ভরসা।

শ্রীকৃষ্ণের মত নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম ক'রে ভীম, বৃষকেতু আর মেঘবর্ণ ঘোড়া আনতে বেরিয়ে প'লেন।

যুবনাশ্বের রাজধানীর নাম ভদ্রাবতী। চমৎকার জায়গা, কতই না শোভা তার? বাইরে কি স্থন্দর সরোবর। তিনজনে ভদ্রাবতী গিয়ে গোবর্ধন পাহাড়ে উঠে ব'সে রইলেন, স্থযোগ পেলেই ঘোড়া ধরে ফেলবেন। পাহাড়ে ব'সে রাজধানীর শোভা দেখতে লাগলেন তিনজনে।

ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে তাঁরা দেখলেন, রাজবাড়ির চারধারেই চওড়া খাদ, সিংহদরজাটাই বা কি শক্ত ক'রে গড়া! বাড়ির চারদিকেই অস্ত্রধারী

প্রহরীর দল। এই বাড়ির মধ্যে আছে সেই ঘোড়া। কি উপায়ে ধরা যায় ঘোড়াটাকে! রাজবাড়িতে ঢোকা বড় মুস্কিল।

ভীম মতলব ক'রলেন, ঘোড়াটা যখন বাইরে আনা হবে, তখন মেঘবর্ণা ঘোড়াটাকে নিয়ে উঠবে পাহাড়ের ওপর। তারপর তিনি আর বৃষকেতু লড়াই স্বরু ক'রে দেবেন সৈন্যদের সঙ্গে।

ঠিক সময়ে ঘোড়ার দল এল সরোবরে জল খেতে। কই, সে ঘোড়াটা ত তার মধ্যে দেখা যায় না। ভীম ভাবলেন, নিশ্চয় সে ঘোড়াটাকে রাজবাড়ি থেকে বার করা হয় না। ঘোড়া আন্‌বার প্রতিজ্ঞা ক'রে কি ভুলই ক'রেছেন তিনি।

বৃষকেতু ব'ললেন, "শ্রীকৃষ্ণ যখন ব'লেছেন, ঘোড়া পাওয়া যাবে, তখন আপনি কিছু ভাববেন না।"

খানিক পরে শোনা গেল বাজনার শব্দ আর সৈন্যের গোলমাল। সৈন্যরা এগিয়ে এল সরোবরের কাছে। তাদের মাঝেই র'য়েছে যে সেই ঘোড়া! ভীমের কি আনন্দ।

মেঘবর্ণ বিদ্যুতের মত ছুটল ঘোড়া আনতে। সে মায়ায় সৃষ্টি ক'রে দিল এমন ঝড় বৃষ্টি যে, সৈন্যেরা ভয়ে দিশেহারা হ'য়ে ঘোড়া ফেলে পালাল। মেঘবর্ণ সুযোগ বুঝে ঘোড়াটা কোলে নিয়ে উঠল গিয়ে পাহাড়ে।

ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। যুবনাশ্বের সেনারা ফিরে এসে দেখল ঘোড়াটা রয়েছে পাহাড়ের ওপর। তাদের ধারণা ঘোড়া চুরি ক'রেছেন ইন্দ্র। তারা মার মার শব্দে এগিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

মেঘবর্ণের ইচ্ছা, ঘোড়া নিয়ে হস্তিনায় পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু ভীম তাতে রাজি নন। যুদ্ধ না ক'রে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেলে লোকে রটাবে তাঁর নিন্দা, আর শ্রীকৃষ্ণই বা ব'লবেন কি!

মেঘবর্ণ মড় মড় ক'রে একটা পাথর ভেঙ্গে ছুড়ে দিল যুবনাশ্বের সৈন্যের দিকে। সেই পাথরের ঘায়ে ম'ল অনেক সৈন্য, সেনাপতি আর হাতী ঘোড়া।

ঘোড়া চুরির কথা যুবনাশ্বের কানে গেল। তিনি তার ছেলে স্ববেগ আর অনেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে এলেন পাহাড়ের কাছে। বৃষকেতু ভীমকে জানালেন, তিনি একাই হারাবেন যুবনাশ্বকে। তিনি ভীমের পায়ের ধুলো নিয়ে ধনুর্বাণ হাতে চ'লে এলেন, যুবনাশ্বের সামনে। ভীম স্থির থাকতে না পেরে মেঘবর্ণের ওপর ঘোড়ার ভার দিয়ে গদা নিয়ে এগিয়ে এলেন বৃষকেতুর সাহায্যে।

যুবনাশ্ব টের পেলেন, যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রবেন; তাই এই ঘোড়াটা চাই তাঁর। ঘোড়া নিতে এসেছেন বৃষকেতু, সঙ্গে আছেন ভীম আর মেঘবর্ণ। যুবনাশ্ব বীর, তিনি বিনা যুদ্ধে ঘোড়া ছাড়েন কি ক'রে? তিনি বৃষকেতুর সঙ্গে লড়াই স্থুরু ক'রে দিলেন।

ভীমের গদায় সবাই অস্থির। স্ববেগ বারে বারে অজ্ঞান হ'য়ে প'লেন ভীমের গদায়। যুবনাশ্ব বৃষকেতুর বাণ সইতে না পেরে প্রাণ হারালেন।

বৃষকেতুর বড় দুঃখ হ'ল। তিনি প্রাণপণে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললেন, "হে কৃষ্ণ, সত্যই যদি তুমি পাণ্ডবদের সখা, তবে দয়া ক'রে যুবনাশ্বকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু!"

কি আশ্চর্য্য! যুবনাশ্ব প্রাণ ফিরে পেলেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়। বৃষকেতুর ব্যবহারে তাঁর ভারি আনন্দ হ'ল, তিনি যুদ্ধ দিলেন থামিয়ে। তাঁর ইচ্ছা হ'ল, তিনি নিজে গিয়ে ঘোড়া দেবেন যুধিষ্ঠিরকে। তাঁর সব চেয়ে বড় সাধ, শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন।

যুবনাশ্ব পরিজনদের সকলকে আর ঘোড়া নিয়ে হাজির হ'লেন হস্তিনায়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শনে কি আনন্দ হ'ল যুবনাশ্বের তা আর কি ব'লব।

ঘোড়া পাওয়া গেল। অশ্বমেধের আয়োজন চ'লতে লাগল। মুনি ঋষিরা সব হস্তিনায় এলেন। বেদী তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিয়ে স্নান সেরে এসে যজ্ঞের জায়গায় ব'সলেন।

যজ্ঞের কাজের জন্য বরণ করা হ'ল পুরোহিতদের। তারপর নিয়ে আসা হ'ল যজ্ঞের ঘোড়া। যুধিষ্ঠির নিজের হাতে ঘোড়ার পা ধুইয়ে দিয়ে, নানান ফুলে পূজা ক'রে তার কপালে লিখে দিলেন, "এটা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া। এই ঘোড়া যিনি ধ'রবেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ঘোড়া উদ্ধার ক'রে শেষ করা হবে অশ্বমেধ যজ্ঞ।" মেয়েরা হুলুধ্বনি দিলেন, চারিদিকে বেজে উঠল নানারকম বাজনা।

অর্জ্জুন ঘোড়া নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে প'ড়লেন, তাঁর সঙ্গে রইলেন ভীম, প্রদ্যুম্ন, অনুশাল্ল, বৃষকেতু, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকি, শাম্ব, গদ, যুবনাশ্ব, সুবেগকুমার এবং আরও অন্যান্য রাজার দল।

পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে নানা ছাঁদে পা ফেলে ফেলে, দেশের পর দেশ পার হয়ে ঘোড়া গিয়ে পৌছল নীলধ্বজ রাজার রাজধানী মাহেশ্বরী পুরীতে।

নীলধ্বজের ছেলে প্রবীর পত্নী মদনমঞ্জরীর সঙ্গে যখন আমোদে মাতোয়ারা, তখন ঐ ঘোড়া প'ল মদনমঞ্জরীর চোখে। বাঃ, বেশ চমৎকার ঘোড়া ত! তিনি আব্দার ক'রে প্রবীরকে ব'ললেন ঐ ঘোড়া ধ'রে দিতে। ঘোড়া ধ'রতে গিয়ে ঘোড়ার কপালের লেখাটা প'ড়ে প্রবীরের ঘোড়া ধরার রোখ বেড়ে গেল। তিনি ঘোড়াটা ধ'রে পাঠিয়ে দিলেন রাজবাড়িতে।

ঘোড়ার খোঁজ ক'রতে ক'রতে অর্জ্জুন জানতে পারলেন, ঘোড়া ধ'রেছেন নীলধ্বজ রাজার ছেলে প্রবীর। ঘোড়া চাওয়া হ'ল কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে প্রবীর নারাজ। অগত্যা যুদ্ধ বাধল। অগ্নি

ছিলেন প্রবীরের ভগ্নীপতি, তিনি যোগ দিলেন প্রবীরের সঙ্গে। অগ্নি পোড়াতে লাগ্‌লেন অর্জ্জুনের সেনা। খাণ্ডববন পুড়িয়ে যে অগ্নির সাহায্য ক'রলেন অর্জ্জুন, সেই অগ্নি কিনা আজ অর্জ্জুনের বিপক্ষ! অগ্নি আপনার ভুল বুঝে যুদ্ধ ছেড়ে দিলেন; কিন্তু প্রবীর যুদ্ধ ক'রে অর্জ্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে প্রাণ দিলেন।

ছেলের শোকে নীলধ্বজ কাতর। তিনি অগ্নির কথায় ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি ক'রতে চাইলেন অর্জ্জুনের সঙ্গে। নীলধ্বজ ঘোড়া আনতে অন্তঃপুরে গেলেন। প্রবীরের মা জনা ছেলের মরণের খবর পেয়ে একেবারে পাগল। সন্ধির কথায় তিনি গেলেন চ'টে। যে শত্রু, ছেলের মৃত্যু ঘটাল তার সঙ্গে সন্ধি! জনা রাগ ক'রে ভায়ের বাড়ি চ'লে গেলেন, আর নীলধ্বজ ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে অর্জ্জুনের সঙ্গ নিলেন।

জনা ভায়ের কাছে কোন সাহায্য পেলেন না। শেষে তিনি গঙ্গা দেবীকে তাঁর দুঃখের কথা জানিয়ে গঙ্গা জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ভীষ্মের মরণে গঙ্গা আগে থেকেই অর্জ্জুনের ওপর রেগে ছিলেন, আবার তাঁর আদরের জনার মৃত্যু ঘটানর দরুণ অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিলেন, অর্জ্জুনের মরণ হবে আপন ছেলের হাতে।

ঘোড়া এগিয়ে চ'লল দক্ষিণ দিকে। ঘোড়াটা একটা বনের মধ্যে ঢুকে মিশে গেল একটা পাথরে। কি বিপদ। অর্জ্জুন মহা ফাঁপরে প'ড়লেন। সাম্‌নে দেখা গেল এক মুনির আশ্রম। মুনি অর্জ্জুনের কাছে সব শুনে ব'ললেন, "উদ্দালক মুনির স্ত্রী ছিলেন চণ্ডী। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর কথার অবাধ্য। একদিন কৌণ্ডিন্য মুনির সাম্‌নে তিনি স্বামীর কথা না শোনায় কৌণ্ডিন্য অভিশাপ দিলেন, "তুমি পাথর হও।"

চণ্ডী কাঁদতে লাগলেন। কৌণ্ডিন্যের হ'ল দয়া, তিনি ব'ললেন,

অর্জ্জুন তোমায় ছুলে তোমার শাপ মুক্তি হবে। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।"

মুনির কথায় অর্জ্জুন ছুঁলেন পাথরটাকে, অমনি পাথরটা মানুষ হ'য়ে গেল, আর ঘোড়াটা বেরিয়ে এল পাথর থেকে।

ঐ বনের কাছেই এক কৃষ্ণ ভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হংসধ্বজ। হংসধ্বজের রাজধানীতে ঘোড়া এসে হাজির হ'ল। ঘোড়া ধরা প'লেই শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে আশা ক'রে হংসধ্বজ ঘোড়া ধ'রবার হুকুম দিলেন সৈন্যদের। ঘোড়া ধরা হ'ল। যুদ্ধ হবেই হবে, তাই তিনি রাজধানীতে জানিয়ে দিলেন, সবাইকে আসতে হবে যুদ্ধে। যে না আসবে বা আসতে দেরী ক'রবে, তাকে পুড়িয়ে মারা হবে গরম তেলে ফেলে। এই সাজা দেবার ভার প'ল পুরোহিতের ওপর।

সুধন্বা আর সুরথ নামে রাজার দুই ছেলে ছিলেন। কি জানি কি কারণে সুধন্বার যুদ্ধে আসতে হ'ল একটু দেরি। সবাই যুদ্ধে প্রস্তুত, কেবল আসেন নি সুধন্বা। তিনি যখন এলেন, তখন তার জবাব যা পাওয়া গেল, তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজা নিজের ছেলে সুধন্বাকে রেহাই দিতে চান জেনে, পুরোহিত রাগ ক'রে চ'লে গেলেন। পুরোহিতের রাগে অমঙ্গল হ'তে পারে ভেবে সুধন্বাকে গরম তেলে ফেলে মেরে ফেলবার ভার একজনের ওপর দিয়ে রাজা চ'লে গেলেন পুরোহিতকে আনতে।

সুধন্বা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। তাঁর সাধ ছিল, যুদ্ধে—গিয়ে দেখবেন শ্রীকৃষ্ণের রাঙা পা দুখানি, তা বুঝি তাঁর হ'ল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ ক'রতে লাগলেন। কড়াইয়ে টগ্‌বগ্ ক'রে তেল ফুটছে, তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হ'ল সেই তেলের ভেতর, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সুধন্বা যেন ফুলের আসনে ব'সে কৃষ্ণনাম ক'রছেন। পুরোহিত এসে

পরখ ক'রে দেখলেন, সত্যই এমন গরম তেল, যাতে প'লে কেউ বাঁচতে পারে না। সকলেই অবাক্। সুধন্বাকে তুলে নেওয়া হ'ল তেলের কড়াই থেকে। সুধন্বা পিতার আর পুরোহিতের চরণে প্রণাম ক'রে যুদ্ধ ক'রতে চ'লে গেলেন।

সুধন্বার যুদ্ধে অর্জ্জুন ভারি দুর্ব্বল হ'য়ে প'লেন। কত যুদ্ধ ক'রেছেন জীবন ভোর, এমন মুস্কিল ত কোন দিন হয়নি তাঁর। সুধন্বার বাণে অর্জ্জুনের সারথির মাথা কেটে প'ল। সারথি নেই, যুদ্ধ চলে কি ক'রে, অর্জ্জুন স্মরণ ক'রলেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ এসে অর্জ্জুনের রথে সারথি হ'য়ে দাঁড়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখে সুধন্বার আনন্দের অন্ত নেই, এতদিনে সফল হ'ল তাঁর জীবনের সাধ। সুধন্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ ক'রে যুদ্ধ সুরু ক'রে দিলেন। তাঁর বাণে অর্জ্জুন অতিষ্ঠ। শেষে অর্জ্জুন সুধন্বাকে মেরে ফেলার প্রতিজ্ঞা ক'রে ছুড়ে দিলেন এক ভীষণ বাণ। বাণের জোরে পৃথিবী কেঁপে উঠ্ল, কিন্তু এবারটাও সুধন্বার বাণে কেটে প'ল মাটির ওপর। অর্জ্জুন লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু ক'রে রইলেন। বন্ধুর অপমান সইতে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছায় আবার ঐ কটা বাণ গর্জ্জে উঠল মাটী থেকে। সেই বাণটা বিদ্যুতের মত ছুটে গিয়ে কেটে ফেলল সুধন্বার মাথা। সুধন্বার তেজ গিয়ে মিশে গেল শ্রীকৃষ্ণের চরণে।

শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে ডেকে সুধন্বার মাথাটা ফেলে দিতে ব'ললেন প্রয়াগে। এদিকে শিবের ইচ্ছা হ'ল, তিনি ভক্ত সুধন্বার মাথা প'রবেন তাঁর গলায়, তাই তিনি ঐ মাথা আনতে পাঠিয়ে দিলেন নন্দীকে। গরুড় উঁচু থেকে যেমন মাথাটা ফেললেন প্রয়াগে, অমনি নন্দী মাঝ পথ থেকে মাথাটা ধ'রে নিয়ে চ'লে গেলেন কৈলাসে। শিব সুধন্বার মাথা পেয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন।

সুরথেরও প্রাণ গেল অর্জ্জুনের বাণে। হংসধ্বজ যুদ্ধ ক'রতে এসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ দেখে বড় সুখ পেলেন। তিনি আর যুদ্ধ না ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে সন্ধি ক'রলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন তাঁদের দলবল নিয়ে একদিন হংসধ্বজের বাড়িতে থেকে এগিয়ে চ'ললেন।

তাঁদের পথে ঘটল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁদের যাবার পথে ছিল একটা বন, আর তার মধ্যে এক সুন্দর সরোবর। ঘোড়াটা জল খাবার আশায় যেমন ছুঁয়েছে ঐ সরোবরের জল, অমনি ঘোড়াটা হ'য়ে গেল একটা ভীষণ বাঘ। এই ব্যাপারে অর্জ্জুন হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। কাছেই ছিল কৌণ্ডিন্য মুনির বাস। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিয়ে গেলেন মুনির কাছে। তাঁরা শুনলেন মিত্রসেন নামে এক মুনি যখন ঐ সরোবরে স্নান ক'রছিলেন, তখন তাঁকে এসে ধ'রল এক দানব। মুনি অভিশাপ দিয়ে দানবকে ক'রে দিলেন বাঘ। আর সরোবরের ওপরও হ'ল মুনির রাগ। তিনি ব'ললেন, যে ছোঁবে এই সরোবরের জল, সেও হ'য়ে যাবে বাঘ। শ্রীকৃষ্ণ যদি বাঘটাকে ছোঁন, তবে বাঘটা আবার হবে ঘোড়া। শ্রীকৃষ্ণের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সত্যই বাঘটা ঘোড়া হ'য়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন হস্তিনায়।

অর্জ্জুনের ঘোড়া ঘুরতে ঘুরতে এল প্রমীলার রাজ্যে। মজার কথা, প্রমীলার রাজ্যে ছিল না একজনও পুরুষ। গৌরীর অভিশাপে রাজ্যের এমন দশা হয়। প্রমীলার সখী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন যুদ্ধ বিদ্যায় পটু। প্রমীলার কথায় তাঁর সখী ঘোড়াটা ধ'রে রাখলেন বেঁধে। অর্জ্জুন আর ঘোড়া খুঁজে পান না। জিজ্ঞাসাই বা করেন কাকে! যে দিকে তাকান, সে দিকেই দেখেন অস্ত্র হাতে মেয়ের দল। তাঁরা চান্ অর্জ্জুনের সঙ্গে ল'ড়তে। কি জানি কি হয়, ভেবে অর্জ্জুন দেখা ক'রতে

চাইলেন প্রমীলার সাথে। অর্জ্জুনকে দেখে প্রমীলার কি আহ্লাদ! তাঁর ইচ্ছা, তিনি অর্জ্জুনকে বিয়ে করবেন। অর্জ্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের পর তাঁকে বিয়ে ক'রবেন ব'লে প্রমীলা আর তাঁর সখীদের হস্তিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

অনেক দেশ ঘুরে অর্জ্জুনের ঘোড়া এসে পৌছুল মণিপুর রাজ্যে। এই রাজ্যের রাজা বভ্রুবাহন। অর্জ্জুনের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার গর্ভে হয় এঁর জন্ম। বভ্রুবাহন মহাবীর। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান।

ঘোড়াটা ধরা প'ল বভ্রুবাহনের সৈন্যদের হাতে। ঘোড়ার কপালের লেখা প'ড়ে বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদাকে ব'ললেন "মা, শুনেছি অর্জ্জুন আমার পিতা। তাঁর দেখা পাব ব'লে ধ'রেছি এই ঘোড়া। এখন কি করি?"

চিত্রাঙ্গদা ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে অর্জ্জুনকে নিজের পরিচয় দিতে ব'ললেন বভ্রুবাহনকে।

কথাটা বভ্রুবাহনের মনে ধ'রল না। ক্ষত্রিয় সন্তান তিনি। ছোট হ'য়ে পরিচয় দিতে গিয়ে যদি পিতার কাছে আদর না পান, তবে ভারি অপমান হবে তাঁর। কিন্তু মায়ের কথা ঠেলতে পারলেন না। ঘোড়া নিয়ে চ'লে গেলেন অর্জ্জুনের কাছে। অর্জ্জুন তাঁকে ছেলে ব'লে মেনে নিতে পারলেন না বরং শুনিয়ে দিলেন গোটা কতক অপমানের কথা।

উঃ, কি লাঞ্ছনা! কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বভ্রুবাহন জোর গলায় অর্জ্জুনকে ব'ললেন, "মার কথায় এসেছিলাম আপনাকে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু তা দেব না। আপনার সাধ্য থাকে আমায় যুদ্ধে হারিয়ে ঘোড়া কেড়ে নিন আমার কাছ থেকে।"

বভ্রুবাহন রাগে কাঁপতে লাগলেন। মণিপুরে রণ ডঙ্কা বেজে উঠল। শেল, শূল, তীর, ধনুক নিয়ে তৈরি হ'ল বভ্রুবাহনের সৈন্যদল। চিত্রাঙ্গদা ছুটে এলেন ছেলের কাছে! তাঁর মুখে সব শুনে তিনি ভাবনায় অস্থির।

চিত্রাঙ্গদা ত জানেন, কত শক্তি ধরেন অর্জ্জুন। ছেলে কোন কথা শুন্‌বে না, আর কি করা যায়। চিত্রাঙ্গদা জলভরা চোখে ব'সে রইলেন নিজের ঘরে।

বভ্রুবাহনের হাতী, ঘোড়া আর সব সৈন্য ছুটল যুদ্ধের দিকে। প্রথমেই বৃষকেতু এলেন যুদ্ধ ক'রতে। বভ্রুবাহনকে হারানো ত দূরের কথা, নিজেই তাঁর হাতে হেরে রণে ভঙ্গ দিলেন।

ভীম, গদ, শাম্ব প্রভৃতি সকলেরই একই দশা হ'ল। পাণ্ডব সৈন্য ম'রে পাহাড় হ'য়ে গেল, রণক্ষেত্রে বইল রক্তের নদী।

সবাই হারছে বভ্রুবাহনের হাতে, এই কথা শুনে অর্জ্জুন গাণ্ডীব হাতে ছুটে এলেন। অর্জ্জুন কত বাণ ছোড়েন, কিন্তু বভ্রুবাহনকে হারাতে পারেন না কিছুতেই। অর্জ্জুনের অক্ষয় তূণ প্রায় খালি হ'য়ে এল। অর্জ্জুন বড় বিপদে প'লেন। এই না দেখে বভ্রুবাহনের কি স্ফূর্ত্তি। অর্জ্জুনের আর যত বাণ বাকি ছিল তাও হ'ল বৃথা।

বভ্রুবাহন অর্জ্জুনকে ব'ললেন, "আজ আমার হাতে আপনার নিস্তার নেই, মরণকালে স্মরণ করুণ আপনার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে। তিনি তবু আপনার একটা গতি ক'রে দেবেন।"

অর্জ্জুনের আর বভ্রুবাহনের কথা সহ্য হয় না। বৃষকেতু অর্জ্জুনের সাহায্যে এসে বভ্রুবাহনের অর্ধচন্দ্র বাণে প্রাণ হারালেন। বৃষকেতুর মৃত্যু অর্জ্জেুনর বুকে যেন শেলের ঘা দিল।

শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া গতি কি? অর্জ্জুন আকুল প্রাণে ডাকৃতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণের আশায় অর্জ্জুন বারে বারে চাইতে লাগলেন নিজের রথের দিকে। অর্জ্জুনের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ 'ব রথের সারথি হ'য়ে সে দিনের মত রক্ষা করেন তাঁকে।

কৈ, শ্রীকৃষ্ণ ত এলেন না! শ্রীকৃষ্ণ এলে যে গঙ্গা দেবীর শাপ নিষ্ফল হয়।

বভ্রুবাহনের বাণে অর্জ্জুন বড় কাতর, বাণ ছোড়ার শক্তিও তাঁর ক'মে গেল। এইবার বভ্রুবাহন যে বাণ ছুড়লেন, তাতে এসে ব'সলেন স্বয়ং গঙ্গা। সেই বাণটা বিকট শব্দে অর্জ্জুনের মাথা কেটে ফেলল।

বভ্রুবাহনের দল জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল। অর্জ্জুনের মৃত্যুর খবর পেয়ে চিত্রাঙ্গদা কেঁদে অজ্ঞান হ'য়ে প'লেন।

অর্জ্জুনের আর এক স্ত্রী উলূপী থাকতেন চিত্রাঙ্গদার কাছে। তিনি চিত্রাঙ্গদার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে ব'ললেন, "শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু অর্জ্জুন কি সহজে মরেন ?"

হঠাৎ উলূপীর মনে প'ল অমৃত মণির কথা। অর্জ্জুনের সঙ্গে উলূপীর যখন বিয়ে হয়, তখন অনন্তদেব উলূপীকে ঐ মণিটা যৌতুক দিয়েছিলেন। মণি আনবার জন্য উলূপী পুণ্ডরীককে পাঠালেন পাতালে।

পুণ্ডরীকের কথা শুনে অনন্ত মণি দেবার জন্য হুকুম দিলেন তাঁর মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্রকে। এই ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন আবার হস্তিনার ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু। দুর্যোধনদের মৃত্যুর খবরে তাঁর খুব রাগ ছিল পাণ্ডবদের ওপর। অর্জ্জুনকে বাঁচাবার ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও রাজার কাছে তা প্রকাশ ক'রতে পারলেন না। তিনি সাপদের ফুসলে দিলেন। সাপেরা গরুড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই রেখেছে অমৃত মণি, তাই তারা মণি দিতে চাইলে না। পুণ্ডরীক খালি হাতে ফিরে এলেন মণিপুরে।

মায়ের কথায় যুদ্ধের সাজে বভ্রুবাহনকে পাতালে যেতে হ'ল। পাতালে যুদ্ধ বাধল। বভ্রুবাহনের অনেক সেনা ম'ল সাপের বিষে। তখন বভ্রুবাহন গরুড় বাণ ছুড়ে দিলেন নাগ সেনাদের দিকে। তারা ভয় পেয়ে মণি দিয়ে দিল।

বভ্রুবাহন মণি নিয়ে মণিপুরে এসে দেখেন অর্জ্জুন আর বৃষকেতুর মাথা খোয়া গিয়েছে। বভ্রবাহন আসার আগেই ধৃতরাষ্ট্র নাগের দুই ছেলে এসে মাথা দুটো চুরি ক'রে পাতালে নিয়ে যায়, তাই মাথা পাওয়া গেল না।

বভ্রুবাহন অর্জ্জুন আর বৃষকেতুকে বাঁচান কি ক'রে। বভ্রুবাহন শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। এমন বাপের মৃত্যু হ'ল কিনা তাঁর মত পাষণ্ড ছেলের হাতে! বভ্রুবাহনের কান্না আর থামে না।

এদিকে হস্তিনাপুরে স্বপ্নে অর্জ্জুনের মরণ দেখে কুন্তী দেবী কেঁদে আকুল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনেক ক'রে পাঠিয়ে দিলেন মণিপুরে।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বভ্রুবাহন আরো অধীর হ'য়ে আত্মহত্যা ক'রবার জন্য অস্ত্র তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র নিলেন কেড়ে। তিনি ব'ললেন,— "যারা মাথা চুরি ক'রেছে, তাদের মাথা যাবে খ'সে, অর্জ্জুন আর বৃষকেতুর মাথা আসবে এখানে। সবাই যেন দেখল ধৃতরাষ্ট্র নাগের ছেলেদের মাথা খ'সে প'ল। পরেই অনন্ত নিজে মাথা দুটো নিয়ে মণিপুরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ অমৃত ছড়িয়ে অর্জ্জুনকে আর বৃষকেতুকে দিলেন বাঁচিয়ে।

অর্জ্জুন প্রাণ পেয়ে উঠে বীরপুত্র বভ্রুবাহনকে কোলে নিয়ে কতই না আদর ক'রলেন।

চিত্রাঙ্গদা আর উলূপীর সেবায় তুষ্ট হ'য়ে সেই রাতটা মণিপুরে কাটিয়ে সকালে সকলে সেখান থেকে রওনা হ'লেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় বভ্রুবাহন দলের সঙ্গে চ'লল।

অর্জ্জুন ঘোড়া নিয়ে এলেন রত্নাবতীপুরে। সেখানকার রাজা ছিলেন ময়ূরধ্বজ। তাঁর ছেলের নাম ছিল তাম্রধ্বজ। তাম্রধ্বজ ঘোড়া ধ'রে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে হারিয়ে দিলেন তাঁকে। ময়ূরধ্বজ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে এলেন

তাঁর কাছ থেকে। অর্জ্জুন ময়ূরধ্বজকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখার জন্য।

এবার ঘোড়া এল সরস্বতীপুরে। বীরব্রহ্মা ছিলেন ঐ রাজ্যের রাজা। রাজার পাঁচ ছেলে। যম ছিলেন ঐ রাজার জামাই। যম যখন রাজার মেয়ে মালিনীকে বিয়ে করেন, তখন সর্ত্ত করেন নরনারায়ণকে না দেখা পর্য্যন্ত তিনি থাকবেন ময়ূরধ্বজের বাড়িতে। ময়ূরধ্বজ অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন ব'লে একটা ঘোড়া পুষে রেখেছিলেন, তাঁর ছেলেরা রক্ষা ক'রতেন ঐ ঘোড়া।

অর্জ্জুনের ঘোড়া দেখেই রাজার ছেলেরা ঘোড়া ধ'রে ফেললেন, কিন্তু অর্জ্জুনের বাণের চোটে সবাই পালালেন। কিন্তু যমের সঙ্গে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা যান যান অবস্থা। অর্জ্জুনের ধ্বজায় থাকতেন হনূমান। তিনি লম্বা লেজ দিয়ে জড়িয়ে উপড়ে ফেলতে গেলেন সরস্বতীপুরী! হনূমান অমর, কাজেই তাঁর ওপর যমের জোর খাটল না। তখন রাজা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন। নিজের ঘোড়াটা নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গী হ'লেন তিনি।

তারপর কৌণ্ডিন্য নগর জয় ক'রে ঘোড়া পৌছুল মণিভদ্র রাজার দেশে। মণিভদ্র ছিলেন জয়দ্রথের ছেলে। দুঃশলা ছিলেন মণিভদ্রের মা। অর্জ্জুনকে আসতে দেখেই দুঃশলা আর মণিভদ্র গেলেন পালিয়ে। সাত্যকি অনেক কষ্টে তাঁদের খোঁজ পেলেন। অর্জ্জুন দু'জনকে খুব আদর ক'রে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন।

দিগ্‌বিজয় শেষ! সবাই ঘোড়া নিয়ে ফিরে এসেছেন হস্তিনায়। নগরে আনন্দের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। এইবার অশ্বমেধের শেষ আহুতি দিতে হবে ঐ ঘোড়ার মাংসে! ভীম ছাড়া আর কেউ ঘোড়া মারতে পারবেন না, তাই বেদব্যাসের আদেশে অস্ত্র নিয়ে তৈরী হ'লেন ভীম।

ঘোড়াটাকে ভাল জলে স্নান করিয়ে গলায় পরিয়ে দেওয়া হ'ল ফুলের মালা। ধৌম্য আহুতি দেবার জন্য ব'সলেন আসনে। ভীম তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেললেন ঘোড়ার মাথা। মাথাটা শাঁ ক'রে উঠে প'ল আকাশে, আর ঘোড়ার ঘাড় থেকে রক্তের বদলে ঝ'রে প'ড়তে লাগল দুধ। জয় জয় রবে আর শাঁখের শব্দে ভ'রে গেল আকাশ বাতাস।

ধৌম্য মন্ত্র প'ড়ে শেষ আহুতি দিলেন আগুনে। নির্ব্বিঘ্নে হ'ল অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ।

ময়ূরধ্বজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সাঙ্গ ক'রলেন তাঁর নিজের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

যজ্ঞ হ'য়ে গেলে সকলেই সুখী হ'য়ে চ'লে গেছেন আপন আপন দেশে।

# আশ্রমিক পর্ব্ব ঃ

—ঃ০ঃ—

যুধিষ্ঠির ভাল ক'রে রাজ্য শাসন ক'রছেন, আর প্রজাদের ভালবাসছেন ঠিক ছেলের মত। দান, ধ্যান নিয়ে তাঁর দিন কাটছে বেশ। ভায়েরা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা ক'রছেন মনে প্রাণে। ভীম কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ওপর তাঁর রাগ জানায়। এক শ' ভাইকে মেরেও তাঁর রাগ পড়েনি।"

ভীমের ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের ব্যথা লাগে খুব। গান্ধারী তাঁকে বোঝান, ভীমকে তিনি যেমন দেখেন, ভীমও তাঁকে দেখে তেমনি। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির ত ভাল ছেলে, তার কথা মনে ক'রে শান্তি পাওয়া উচিত।

ধৃতরাষ্ট্রের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। এতবড় শোকের পর ভীমের এমন অনাদরের সেবা আর তাঁর ভাল লাগে না। তিনি বনে গিয়ে আরাধনায় মন দিতে চাইলেন। ভোগের মধ্যে মন ঠিক রাখা যায় না। তাই চাই তাঁর নির্জ্জন বন।

বিদুর বোঝালেন, "আপনি অন্ধ। বনে কত ভীষণ জন্তু আছে। আপনি কেমন ক'রে বনে থাক্‌বেন? কাজ নেই আপনার বনে গিয়ে।"

ধৃতরাষ্ট্র কারো কথা শুনতে রাজি নন। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে একথা জানাতে বাধ্য হ'লেন।

বিদুরের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার কথা শুনে যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "আমি কি দোষ করেছি তাঁর চরণে যে, তিনি আমায় ছেড়ে যেতে চান এমনি ক'রে? ছেলে বেলায় বাবাকে হারিয়েছি, এখন জেঠামশাইয়ের সেবা ক'রে পিতৃ সেবার সুখ পেতে চাই। তিনি কেন আমার সে সাধে বাদ সাধবেন?"

ধৃতরাষ্ট্রের মনের অবস্থা আর যুধিষ্ঠিরের দুঃখ দেখে বিদুর ব'ললেন, "শেষ বয়সে বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করাই শাস্ত্রের বিধান। তুমি কিছু ভেব না, খোলা মনে তাঁকে বনে যাবার অনুমতি দাও। তুমি রাজা, তোমার অনুমতি ছাড়া তিনি কি বনে যেতে পারবেন ?"

যুধিষ্ঠির বিদুরের সঙ্গে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। যুধিষ্ঠির তাঁর পা দুখানি ধ'রে ভক্তি ভরে ব'ল্লেন, "আমি কি দোষ ক'রেছি আপনার কাছে ? আমি রাজা হ'য়েছি ব'লে যদি আপনার কিছু কষ্ট হ'য়ে থাকে ত বলুন, আমি এখনই রাজা ক'রে দি যুযুৎসুকে। সিংহাসন ত ছার, আপনি ব'ললে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

যুধিষ্ঠিরের ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র ব'ললেন, "তুমি বড় ভাল ছেলে। তোমার মত ছেলে পেয়ে কৌরব বংশ ধন্য। তোমার খাতিরেই ছিলাম এতদিন সংসারে। আর আমার সংসারে কোন টান নেই। ইহকাল ত এই রকমে কাটল, পরকালের পুঁজি কিছু ক'রতেই হবে। জীবন ত শেষ হ'য়ে এল, আর কবে সেবা ক'রব সেই অনাদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দের।"

যুধিষ্ঠির বুঝলেন, এর পর আর বাধা দেওয়া চ'লবে না, আর উচিতও নয়। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যেতে চাইলেন গান্ধারী, কুন্তী, সঞ্জয় আর বিদুর।

তাঁদের বনে যাওয়ার খবর যখন মুখে মুখে নগরে র'টে গেল, তখন প্রজারা সবাই দুঃখ ক'রতে লাগল।

দ্রৌপদী তাঁদের পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রে বনে যেতে মানা ক'রলেন, কিন্তু তাঁর কোন কথা টিকল না। তখন রাজবাড়িতে প'ড়ে গেল কান্নার রোল।

বনে যাওয়ার দিন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তী যুধিষ্ঠিরদের আশীর্ব্বাদ

ক'রলেন। পাণ্ডবেরা সকলে তাঁদের প্রণাম ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সন্ন্যাসীর বেশ দেখে প্রজারা অঝোরে কাঁদতে লাগল।

তাঁরা গঙ্গার ধারে দ্বৈপায়ন বনে বাঁধলেন তাঁদের আশ্রম, চারধারে রইল নানা মুনির কুটির।

কিছুদিন কেটে গেল। একদিন যুধিষ্ঠির ভাইদের আর দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজবাড়ির লোকদের নিয়ে সকলকে দেখতে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কাছে জানলেন, বিদুর কদিন থেকে কিছু না খেয়ে গঙ্গার ধারে ব'সে তপস্যা ক'রছেন। তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও তিনি ঠিক ব'লতে পারেন না।

যুধিষ্ঠিরের মন খারাপ হ'য়ে গেল। দুঃখের দিনে বিদুরই ছিলেন তাঁদের সহায়। তাঁকে দেখার আশায় যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে চ'লে গেলেন গঙ্গার তীরে। তিনি গিয়ে দেখলেন, বিদুর পাথরের মত ব'সে আছেন। তাঁর প্রাণ আছে কি না তারো ঠিক নেই। যুধিষ্ঠির কাতর ভাবে ডাকতে লাগলেন বিদুরকে। বিদুর একবার মাত্র চোখ খুলে তাকালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে, তার পরই সব শেষ হ'য়ে গেল। পুষ্প বৃষ্টি হ'ল বিদুরের দেহের ওপর।

বিদুরের দেহ কোলে ক'রে যুধিষ্ঠির কাঁদছেন, এমন সময় সেখানে এলেন বেদব্যাস। তিনি উপদেশ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অনেক বোঝালেন। বিদুরের দেহের সৎকার ক'রে যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের সঙ্গে এলেন কুন্তীর কুটিরে। কুন্তী ছেলেদের কোলে নিয়ে ব'সলেন। অনেক দিন পরে দেখা, সকলেই হ'লো খুসি।

বেদব্যাস ব'ললেন, "কিছুদিনের জন্য আমি যাব দ্বারকায়। যদি তোমাদের কোন ইচ্ছা থাকে ত আমায় বল, আমি তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রব!"

তখন সকলে কুরুক্ষেত্রে মৃত আত্মীয়দের দেখতে চাইলেন।

বেদব্যাসের ইচ্ছায় সবাই নেমে এলেন স্বর্গ থেকে। এখন আর তাঁদের মনে শত্রু ভাব নেই। পরপারের আলোর ছোঁয়াচ লেগে এপারের আঁধার কেটে গিয়েছে সকলের। যাঁরা কুরুক্ষেত্রে ক'রেছিলেন পরস্পর হানাহানি, আজ তাঁদের চ'লেছে কোলাকুলি, প্রণাম আর আশীর্ব্বাদ। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। সে রাতটা এক সাথে বেশ সুখে কাটল। সকাল বেলা বেদব্যাস ব'ললেন, "পতিহারার দল ইচ্ছা ক'রলে আপন আপন স্বামীর সঙ্গে যেতে পারেন স্বর্গে।" বিধবারা সকলে আপন আপন পতির সঙ্গে স্বর্গে চ'লে গেলেন। উত্তরাকে অভিমন্যুর সঙ্গে যেতে দেখে খুব দুঃখ হ'ল যুধিষ্ঠিরের। তারপর যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে ফিরে গেলেন রাজধানী হস্তিনা নগরে।

একদিন নারদ এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির নারদকে সোনার আসনে বসিয়ে পরম আগ্রহে ক'রলেন তাঁর পূজা। তারপর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'ললেন, "একদিন যজ্ঞ করার পর সে আগুন নিবুন হয় নি। কেমন ক'রে সেই আগুন লেগে গেল ধৃতরাষ্ট্রদের কুটীরে। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় ছিলেন ধ্যানে, সেই আগুনে পুড়ে হ'ল তাঁদের প্রাণান্ত।

মরণের সময় দেখাও হ'ল না! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কাঁদতে লাগলেন। নারদের সান্ত্বনায় স্থির হ'য়ে তাঁরা সকলের শ্রাদ্ধ ক'রে এই উপলক্ষে দান ক'রলেন কত ধন, রত্ন, হাতী, ঘোড়া। ভূরি ভোজনে তৃপ্ত ক'রলেন নগরের সব প্রজাদের।

# মূষল পর্ব্ব ঃ

—:০:—

অনেকদিন হ'য়ে গেল শ্রীকৃষ্ণ গোলক ছাড়া। দেবতারা সব ডাকছেন আকুল প্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে গোলকে ফিরে যেতে। ধরার ভার হরণ ক'রতে ত আসা তাঁর! সে কাজ ত মিটেছে. তাই শ্রীকৃষ্ণেরো ইচ্ছা হ'ল গোলকে ফিরে যেতে। তিনি দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বংশ খুব বেড়ে গিয়েছে। বংশ পুরাণো হ'লে, তাতে আসে পাপ। নিজের বংশ নষ্ট ক'রতে ইচ্ছা হ'ল শ্রীকৃষ্ণের। গান্ধারীর অভিশাপ ত আছেই যদুবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তার ওপর এই বংশ নাশের আর একটা কারণ ঘটল।

বসুদেবের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ হ'ল অনেক মুনির। তাঁরা এসে যজ্ঞ দেখলেন, যজ্ঞ হ'য়ে গেলে তাঁরা গেলেন সেই দিকে. যে দিকে শ্রীকৃষ্ণের ছেলেরা ছিলেন খেলায় মত্ত। শ্রীকৃষ্ণের ছেলেদের মধ্যে শাম্বের চেহারা খুব ভাল। সকলে মিলে শাম্বকে স্ত্রীলোকের সাজে সাজিয়ে, আর তাঁর একটা মিছামিছি গর্ভ তৈরি ক'রে তাঁকে নিয়ে সবাই এলেন মুনিদের কাছে। তাঁরা মুনিদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আচ্ছা বলুন ত, এর গর্ভে ছেলে আছে না মেয়ে আছে ?"

মুনিরা ধ্যানবলে সব জানতে পেরে রাগ ক'রে ব'ললেন, "এর গর্ভে আছে এক মূষল, আর সেই মূষলেই হবে যদু বংশের বিনাশ।"

শাম্বের পেট থেকে সত্যই বেরুল এক মূষল। ছেলেরা সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁরা সমুদ্রের ধারে প্রভাসে গিয়ে মূষলটা ঘ'সে ঘ'সে খুব ছোট ক'রে ফেলে দিলেন, সাগরের জলে। একটা মাছ গিলে ফেলল ঐ লোহার টুকরোটা। এক জেলে মাছের পেটে ঐ লোহাটা পাওয়ার পর দিল তার বন্ধু জরা ব্যাধকে। জরা ঐ লোহাটার

একটা তীরের ফলা তৈরি ক'রে রেখে দিল। যেখানে মুষল ঘসা হ'ল সেখানে জন্মাল এক ভীষণ নল খাগড়ার বন।

এই রকমে কিছুদিন যায়, একদিন শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের সব পুরুষদের নিয়ে গেলেন প্রভাসের ধারে, মেয়েরা সব রইলেন দ্বারকায়! সেখানে গিয়ে তাঁরা সবাই বারুণী খেয়ে হ'লেন মাতাল। কে কত বড় বীর, এই নিয়ে বাধল তাঁদের মধ্যে তর্ক। কথা কাটাকাটি থে'কে সুরু হ'ল হানাহানি। যাদবেরা দুদলে ভাগ হয়ে গেল। দুধারের লোকই ম'রে প'ড়তে লাগল প্রভাসের তীরে। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, সেই দিনই সব শেষ! তিনি দারুককে অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্রকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন মথুরায়। তিনিই রইলেন শুধু শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। শ্রীকৃষ্ণ দারুককে ব'লে দিলেন, তিনি যেন অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আসার কথা ব'লে আসেন।

যখন সবাই ম'রে গেলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে চ'লে গেলেন দ্বারকার রাজবাড়ী। তিনি সেখানকার মেয়েদের সকলেরই আসল প্রাণ হরণ ক'রে নিলেন, তাঁরা কেবল ধুক্‌ধুক্ ক'রতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গেলেই বলরাম যোগে মন দিলেন। তাঁর মুখ থেকে বেরুলেন অনন্তদেব। বলরামের দেহ প'ড়ে রইল প্রভাসের প্রান্তরে।

শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে দেখলেন, সারা প্রভাসের তীর ধ'রে প'ড়ে রয়েছে যাদবদের মৃত দেহ। বলরামের অবস্থা দেখে তিনি কাছেই একটা গাছে ঠেস দিয়ে ব'সলেন পায়ের ওপর পা রেখে।

সেই জরা ব্যাধ এল শিকার ক'রতে। দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণের রাঙা টুকটুকে পাখানি দেখে ব্যাধ ভাবল, হরিণের কান, অমনি ছুড়ে দিল সেই মূষলের শেষ লোহাটুকু থেকে তৈরি বাণটা। ব্যাধ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে যা দেখল, তাতেই তার চক্ষু স্থির। সে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চরণ বিঁধেছে বাণে।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের মুখ চোখের ভাব দেখে ব'ললেন, "তুমিত কোন অন্যায় করনি। তোমার ভয় কি? তুমি ছিলে বালীর ছেলে অঙ্গদ। আমি আমার রাম অবতারে সীতার উদ্ধারের সময় বালীকে মেরে মিতালি ক'রেছিলাম তোমার কাকা সুগ্রীবের সঙ্গে। সীতা উদ্ধার হ'য়ে গেলে আমি যেমন সকলকে বর দিতে চাই, তেমনি তোমাকেও চেয়েছিলাম বর দিতে। তুমি তোমার পিতার শত্রুকে মারার বর চাইলে, আমি তোমাকে তাই দি। তাই আজ তোমার হাতে হ'ল আমার এই দশা। ঐ দেখ তোমায় নিতে আসছে স্বর্গের রথ। তোমার হবে অক্ষয় স্বর্গ বাস।" এই ব'লেই শ্রীকৃষ্ণের দেহ লুটিয়ে প'ল। রথ খানা নেমে এসে জরা ব্যাধকে নিয়ে স্বর্গে চ'লে গেল।

বজ্রকে মথুরায় রেখে দারুক এলেন হস্তিনায়। যুধিষ্ঠির দ্বারকার, বিশেষ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের কুশল জানতে চাইলেন দারুকের কাছে। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু দারুকের জানা নেই, তবে তিনি অন্য সব ব্যাপার জানালেন যুধিষ্ঠিরকে। অর্জ্জুনের যেতে হবে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ। অর্জ্জুন দারুকের রথে দ্বারকায় গেলেন। প্রভাসের তীরে যে অবস্থা দেখলেন অর্জ্জুন, তাতে তাঁর প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। বলরামের দেহ দেখার পর যখন গাছের তলায় দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের দেহ তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহ কোলে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন যে তাঁর অন্তরের সখা, শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন যে তাঁর জীবনের জীবন, তাঁর যথা সর্ব্বস্ব।

অর্জ্জুন সকলের দেহের সৎকার ক'রলেন চন্দন কাষ্ঠের চিতায়। অনেকে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিলেন, আর বাকি রমণীদের নিয়ে হস্তিনায় চ'ললেন অর্জ্জুন। পথে ডাকাতের দল আক্রমণ ক'রল নারীদের। অর্জ্জুন গাণ্ডীব তুলে বাণ ছুড়ে তাদের বাধা দিতে যাবেন, গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না। একদিন এই গাণ্ডীবই ছিল তাঁর গর্ব্ব। ডাকাতেরা রমণীদের ধ'রতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সব পাথর হ'য়ে গেলেন।

অর্জ্জুন মনের দুঃখে চ'লে গেলেন বেদব্যাসের কাছে। সব শুনে বেদব্যাস ব'ললেন "শ্রীকৃষ্ণ নর লীলা সুরু করার আগে বিদ্যাধরীরা যাদবকুলের ঘরণী হবেন, এই রকম কথা হয়। তাঁরা তখন দেখা পান অষ্টাবক্র ঋষির। তাঁদের ভক্তি দেখে ঋষি বর দেন, "তোমরা পতি পাবে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে।" ঋষি তখন ছিলেন নদীর জলে। ঋষি জল থেকে উঠলে তাঁর বাঁকা অঙ্গ দেখে বিদ্যাধরীরা হেসে ওঠেন। তাতে ঋষি অভিশাপ দেন, "ডাকাতের হাতে হবে তোমাদের লাঞ্ছনা।" তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। তখন ঋষির দয়া হয়। তিনি ব'ললেন, "ডাকাতের হাতে প'ড়বার ঠিক আগেই তোমরা পাথর হ'য়ে যাবে।"

হস্তিনায় এসে অর্জ্জুন কেঁদে কেঁদে সব কথা ব'ললেন যুধিষ্ঠিরকে। শ্রীকৃষ্ণই যখন ধরা ছেড়ে চ'লে গেলেন, তখন তাঁরাই বা আর থাকবেন কোন সুখে। যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে হস্তিনার আর বজ্রকে খাণ্ডবপ্রস্থের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মহাপ্রস্থান ক'রলেন! জীবন ভোর কত পরীক্ষাই ত দিলেন যুধিষ্ঠির, এবার তাঁর শেষ পরীক্ষা দিতে হবে ধর্ম্মের কাছে, তাই ধর্ম্ম কুকুরের রূপ ধ'রে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ নিলেন স্বর্গের পথে। অগ্নিদেব দেখা দিলেন পাণ্ডবদের। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ব'ললেন, "আর কেন ভাই, অস্ত্রের মায়া? তোমার গাণ্ডীব আর অক্ষয় তূণ দিয়ে দাও অগ্নিদেবকে।"

যে গাণ্ডীবের জোরে অর্জ্জুনের এত যশ, অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীব আর তূণ দিলেন অগ্নিদেবের হাতে।

# স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ঃ

—:○:—

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদী কত বন, কত উপবন, কত নদী, কত ঝরণা পার হ'য়ে এলেন মেঘনাদ পর্ব্বতে। ঐ পাহাড়ে যেমন মুনি ঋষির বাস, আবার তেমনি ছিল মেঘনাদ নামে এক ভয়ঙ্কর দানব। সে এসে সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবদের পথ আগলে দাঁড়ায়। ভীমের মার খেয়ে দানব ক্ষমা চাইতে বাধ্য হ'ল।

তারপর তাঁরা এলেন কেদার পর্ব্বতে। সেখানে সুন্দরী নারীদের রূপের বাঁধন এড়িয়ে তাঁরা অর্ধনারীশ্বর শিব দেখে এলেন মেঘবর্ণ গিরিতে। ঐ পাহাড়ে থাকত ভীষণা নামে এক রাক্ষসী। ঐ রাক্ষসী আগে ছিল এক অপ্সরা। দুর্ব্বাসার শাপে সে রাক্ষসী হ'য়ে থাকে এখানে হাঁ ক'রে, যা পায় তাই ফেলে গিলে। ঐ রাক্ষসীটা ছিল আবার বকাসুরের বোন।

রাক্ষসীটাকে সরাতে না পারলে ত পথ পাওয়া যায় না। ভীম তখন তার সঙ্গে লড়াই ক'রতে তৈরি হ'লেন। তিনি ভেঙ্গে নিলেন এক পাহাড়ের মাথা, তারপর সেটাকে ছুড়ে দিলেন রাক্ষসীর দিকে। রাক্ষসী ঐ পাথরটা টুপ ক'রে গিলে ফেলল। ভীম প্রকাণ্ড শাল গাছ উপড়ে নিয়ে মার্‌তে গেলেন রাক্ষসীকে। সে সেই গাছটা ভীমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আখের মত কড় মড় ক'রে চিবুতে লাগল। ভীম কিছুতে সরাতে পারেন না রাক্ষসীকে তখন তিনি একটা শাল গাছ তার নাক দিয়ে চালিয়ে দিয়ে তাঁর মর্ম্ম ভেদ ক'রে তাকে মেরে ফেললেন।

এইবার তাঁরা এলেন হরি পর্ব্বতে। পাহাড়টা বেশ, কিন্তু এত ঠাণ্ডা রে, আর যেন চলা যায় না! দ্রৌপদীর দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌তে লাগল। তিনি আর দাঁড়াতে না পেরে প'ড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ্‌তে জপ্‌তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

এমন গুণবতী দ্রৌপদী সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না কেন, ভীম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলেন যুধিষ্ঠিরকে।

যুধিষ্ঠির বললেন, "দ্রৌপদী অর্জ্জুনকেই ভালবাসতেন সবার চেয়ে বেশী, তাই হ'ল তাঁর এই দশা।"

পাঁচজনে এগিয়ে চ'ললেন গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর দিকে। গঙ্গার কুলু কুলু শব্দ যেন তাঁদের কাছে পবিত্র শঙ্খের আওয়াজের মত লাগ্‌ছে। ক্রমে তাঁরা এসে পৌছুলেন বদরিকাশ্রমে। সেখানে তাঁদের অশ্বত্থামার সঙ্গে দেখা হ'ল। তারপর রাশ রাশ বরফ ভেঙ্গে এগিয়ে চ'ললেন। ঠাণ্ডা সইতে না পেরে সহদেব মৃত্যু বরণ ক'রলেন। যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "সহদেব, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের খবর জানলেও পাশা খেলায় কি ফল হবে তা বলেন নি, তিনি নিজেকে সব চেয়ে জ্ঞানী ব'লে ভাবতেন, তাই তাঁর শরীর নিয়ে স্বর্গে যাওয়া ঘটল না।"

এখন চ'লেছেন চার জনে। অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডায় নকুলের পা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তিনি প্রাণ হারালেন বরফের ওপর। তিনি নিজেকে খুব সুন্দর মনে ক'রতেন তাই তাঁর স্বর্গের পথেই হ'ল মৃত্যু।

যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জ্জুন এলেন নন্দিঘোষ পর্ব্বতে। এখানে এমন ঠাণ্ডা যে গাছ, পালা, জীব, জন্তু কিছুই বাঁচে না এখানে। শীতে সমস্ত শরীর জ'মে আস্‌ছে, পা আর চলে না। অর্জ্জুনের মত বীরও পারলেন না সেই ঠাণ্ডা সইতে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণ ক'রে তিনি মরণ পথের যাত্রী হ'লেন। যুধিষ্ঠিরের মুখে ভীম শুন্‌লেন, "দ্রৌপদীর দিকে অর্জ্জুনের মন ছিল সব থেকে বেশি,—তাই পায়ে হেঁটে স্বর্গে যাওয়া তাঁর হ'ল না।"

এখন মাত্র রইলেন যুধিষ্ঠির আর ভীম। মনে তাঁদের খুব কষ্ট হ'লেও তাঁরা উৎসাহে এগুতে লাগ্‌লেন স্বর্গের দিকে। কখনো একটু জিরিয়ে

নেন নদীর ধারে ব'সে, আবার কখনো বা নিজের পথে চলেন। যেখানে তাঁরা এলেন সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে স্বর্গের বাজনার শব্দ। কী সুন্দর জায়গা। পাহাড়ের চুড়ো গুলো সব যেন সোনা দিয়ে মোড়া। স্বর্গ থেকে তরতর ক'রে ব'য়ে আসছে রেবা নদী। এই রকমে কত দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা গেলেন সোমেশ্বর পর্ব্বতে। ভীম আর হিম ঠেলতে পারেন না। অত বড় বীর হিমে জমে ম'রে প'ড়ে গেলেন পাহাড়ের ওপর। তার দেহের চাপে পাহাড় কাঁপতে লাগল, পৃথিবীর পশু পাখী সব ভয়ে চঞ্চল, শব্দে ঋষিদের ধ্যান ভেঙ্গে গেল। যুধিষ্ঠির ভীমকে কোলে নিয়ে কেঁদে ফেললেন। এ রোদন তার অরণ্যে রোদন। তাঁর কান্না শুনবার কেউ নেই সেখানে। নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিলেন, মনে মায়া দেখা দেওয়ায় একটু লজ্জাও পেলেন তিনি। তার মনে হ'ল "ভীম ছিলেন বড় পেটুক, তাই তার মরণ হ'ল এমনি ক'রে।"

যুধিষ্ঠির এখন একা। কত ভাবনাই হচ্ছে তার মনে। তার ইচ্ছা ছিল সবাই মিলে স্বশরীরে ক'রবেন স্বর্গবাস, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তা হ'ল না তাঁর ভাগ্যে। সকলের বিচ্ছেদ ব্যথা মাঝে মাঝে তাঁর মনকে তোলপাড় ক'রে দিচ্ছে। ভাব্তে ভাব্তে যুধিষ্ঠির হাজির বৈতরণীর তীরে। ঋষিরা তাঁকে পার ক'রে দিলেন।

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের খবর পেয়ে ব্রাহ্মণের-রূপ ধ'রে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। ইন্দ্র সব শুনলেন, পরে ব'ল্লেন, "এখুনি তোমার ভাইদের, দ্রৌপদীকে আর সব আত্মীয়কে দেখতে পাবে তুমি, তারা তোমার আগেই এসেছে এখানে। তোমাকে আমিই নিয়ে যাব স্বর্গে। একি! তোমার সঙ্গে কুকুর র'য়েছে যে। দাও, দাও এটাকে তাড়িয়ে দাও। এটার এমন কিছু পুণ্য নেই যে, এটাও তোমার সঙ্গে যাবে স্বর্গে।

সেই হস্তিনা থেকে কুকুর আস্‌ছে সঙ্গে। তাকে কি ছাড়া যায়।

যুধিষ্ঠির ব'ললেন, "যদি আমি কিছু পুণ্য ক'রে থাকি, তার অর্দ্ধেক দিলাম এই কুকুরকে।"

ইন্দ্র আর ধর্ম নিজের নিজের রূপ ধ'রে আদর ক'রে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে গেলেন ইন্দ্রপুরীতে। ইন্দ্রপুরীর শোভা দেখে বড় সুখ পেলেন যুধিষ্ঠির।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য যুধিষ্ঠির আকুল, তাই ইন্দ্র পুষ্পরথ ক'রে যুধিষ্ঠিরকে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণের ধামে।

যুধিষ্ঠির গোলকে ঢুকতেই চারিদিকে জয় জয় রব। যুধিষ্ঠির দেখলেন, নবনীরদরূপ ধ'রে শ্রীকৃষ্ণ ব'সে আছেন বিচিত্র সিংহাসনে, তাঁর মাথায় ঝলমল ক'রছে রত্নের মুকুট, বুকে তার অপরূপ কৌস্তভ, পরণের কাপড়ে শত সূর্য্যের সোনালি কিরণ! শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের হাত ধ'রে বসালেন নিজেরই সিংহাসনে। কত কথা হ'ল দু'জনের। যুধিষ্ঠির কেবলই চাইছেন এদিক, ওদিক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনের কথা জানতে পেরে ব'ললেন, "আপনার আত্মীয়েরা সবাই এসেছেন, এখুনি তাঁদের দেখা পাবেন।"

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চ'ললেন দক্ষিণ দিকে। সে দিকটা হ'ল যমের রাজ্য। কী ভীষণ অন্ধকার সেখানে। কোলের মানুষ চোখে দেখা যায় না! বিকট গন্ধে চারিদিক এমন ভরপূর যে তিষ্ঠোনো দায় হ'ল।

যুধিষ্ঠির সেখানে যাওয়া মাত্রই তাঁর আত্মীয়েরা তাদের উদ্ধার করার জন্য চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন যুধিষ্ঠিরকে। অথচ যুধিষ্ঠির দেখা পেলেন না তাঁদের কারো। সেটা যে নরক তা বুঝতে দেরি হ'ল না তাঁর। স্বশরীরে স্বর্গে এসেও যুধিষ্ঠিরকে দেখতে হ'ল নরক। তিনি যে কুরুক্ষেত্রে "অশ্বত্থামা হত" ব'লে মৃত্যু ঘ'টিয়ে ছিলেন দ্রোণের, তাইত তার কপালে হ'ল নরক দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাঠিয়ে দিলেন শ্বেত দ্বীপে। আহা

কি সুন্দর জায়গা এই শ্বেত দ্বীপ। সকলেরই দেবতার রূপ। অপূর্ব্ব সরোবরে ফুটে র'য়েছে আশ্চর্য্য সোনার পদ্ম, আর সেই পদ্মের ওপর মধুর গুন্ গুন্ ধ্বনি ক'রছে ভ্রমরের দল। পাখীর কলতানে প্রাণে আন্‌ছে অপার শান্তি!

যুধিষ্ঠির সরোবরে স্নান ক'রে পরম তৃপ্তি পেলেন, তাঁর সারা গায়ে দেখা দিল দেবতার জ্যোতি। গরুড় পিঠে ক'রে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দেখালেন দ্বিতীয় কুরুপুরী। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সেখানে র'য়েছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের আত্মীয়ের দল আর কুরুক্ষেত্রের মৃত যত সব বীর। বড় সুন্দর তাঁদের বেশ, বড় সুন্দর তাঁদের আসন। যুধিষ্ঠিরকে দেখেই তাদের মাঝে উঠ্‌ল আনন্দের কলরোল। যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য জনকে প্রণাম, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'লতে লাগলেন কত দিনের কত পুরাণো কথা আর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে দাঁড়িয়ে তাঁর মধুর হাসিতে মাতিয়ে দিলেন সবাকার মন।

শ্রীহরিঃ

**সমাপ্ত**

# পরিশিষ্ট

—:০:—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাঠে ও শ্রবণে লোক হয় জ্ঞানবান ॥
ভারতের শিক্ষা যাহা মহা মহীয়ান।
ধর্মপথে মানবের সর্বত্র কল্যাণ।"

জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা ও কল্পনা, ভাষায় ও ভাবের বাহনে চড়ে যখন মানুষের সামনে এসে তার রূপ ও ঐশ্বর্য্য নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার প্রকাশ কেই আমরা বলি সাহিত্য। এই সাহিত্যের রূপ ও লালিত্য আছে বহু প্রকারের, শেষ নাই বল্লেই হয়। কিন্তু এই সাহিত্যের মধ্যে আছে অনেক জিনিষ সজীব, অনেক নির্জীব এবং কতকগুলি আছে অজড়, অমর, অক্ষয়। আবার অক্ষয়গুলির মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যাহা নিজে অক্ষয় মাত্র তা নয়, এমন কি, তার ডাল, পালাও অক্ষয়, তার যতই বিস্তার, ততই মহান। অক্ষয় বটের ন্যায়, তার বিস্তারের স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ায় পরিসর বেড়ে গিয়ে শান্তি ও বিশ্রাম যোগায় অধিক সংখ্যক পথশ্রান্ত, ক্লিষ্ট, আশ্রয়হীন পথিক ও প্রাণীর। সাহিত্যের নানারূপের ও গরিমার মধ্যে, কাব্য বা কবিতা মানুষ মনকে বেশী আকৃষ্ট করে। তার পরই স্থান দিতে হ'লে দিতে হয় উপন্যাস বা নাটককে, তার পরই আসে গল্প, উপাখ্যান, কাহিনী, ইতিহাস। ভাব সম্পদ ও ভাষা সম্পদ প্রধানতঃ এই দুইটাই সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য। বিন্যাস বা রচনাশৈলী হচ্ছে সাহিত্যের যাদু মন্ত্র বা সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি, যাহার স্পর্শে রাঙ্ সোনা হয় এবং সোনাও পাথর বা লোহা বা রাঙ্ হয়ে যায়।

এই সাহিত্য শ্রেণীর মধ্যে, যেগুলি কল্পান্তস্থায়ী, দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে সমাদৃত, ভাব ও রসনৈপুণ্য যাহাতে সর্গ বন্ধাদি গুণ বিশিষ্ট,

এমন কাব্যকেই মহাকাব্য বলে মানা হয়। অন্যান্য সাহিত্য শ্রেণীর এই প্রকারের গুণ ও ধর্ম্ম থাকিলে মহানাটক প্রভৃতি বলা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যে প্রাচীন মহাকাব্য আছে অল্প কয়খানি। তন্মধ্যে সুপ্রাচীন ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাল্মিকী রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত গ্রীক ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ হোমারের "ইলিয়ড্" ও "ওডেসী" কাহারও কাহারও মতে ভারতের মহাকাব্যের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। ইংরাজী ভাষায়, মিলটনের 'প্যারাড়াইস্ লষ্ট্' ও "রিগেণ্ড্", বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মহাকাব্যের কবিতা অনুবাদ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী "মহাভারত" এবং আধুনিকতম যোগেন্দ্র বসুর "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

মহাভারতের খ্যাতি দিকে দিকে, এবং ভাষান্তরিত হইয়া সকল মহাদেশে ইহা প্রচারিত, সকল জাতির নিকট ও সর্বকালে ইহা সমাদৃত হইয়াছে ও হইবে।

মহাভারতের উপাখ্যান অংশ ও শিক্ষনীয় বিষয় বস্তু হইতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি কঠিন সমস্যার উপযুক্ত সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুতর উচ্চ আদর্শের সহিত নিম্নস্তরের মনোবৃত্তির সংঘাত ও পরাজয়, মানবের সংশিক্ষা ও সুষ্ঠ সংস্কার সংগঠনে সর্বদাই সাহায্য করিয়া আসিতেছে। মানব জীবনকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুলিতে ইহার দান অমূল্য। ঐতিহাসিক সত্যের পটভূমিকায় ইহার কাঠামো, শ্রেষ্ঠ, মানবতা, সামাজিকতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যানের উপর ইহার সর্বাঙ্গ পরিপুষ্ট একটি জীবন্ত মূর্ত্তি। ভারতের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ আলেখ্য বা দর্পণ।

শ্রাব্য বা শ্রবণে পুণ্যজনক শাস্ত্রাংশ, পবিত্র আখ্যান পবিত্রাত্মা ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের নাম ও ঋষিগণের নাম পাঠ হিন্দুর শ্রাদ্ধ সংস্কারের আনুষ্ঠানিক বিধির মধ্যে সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে বৃহৎ ভারত আখ্যানের

পবিত্র সংক্ষিপ্ত সারাংশ পাঠের ব্যবস্থা একটি বিচিত্র সমাবেশ ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্লোকদ্বয় যথা :—

"ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনিষী।"

"ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রী সুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।"

প্রথমেই দুর্যোধন অর্থাৎ মন লইয়া কুরুক্ষেত্র বা মনুষ্যজীবন। এই মনের বিকার যে কত, উচ্ছৃঙ্খলতা যে কত তীব্র ও দুর্জ্জয়, শঠতা, কপটতা, বিবেকহীনতা, অমানবতা সবই দুর্যোধন ও তার সমর্থক ও অনুচরবৃন্দের জীবনী ও কার্য্য কলাপে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাপী ও সমাজদ্রোহী, অমানুষ ও অসত্যে লিপ্ত যত বলবান, কৌশলী ও কুটচক্রী হউক না কেন, তার পরাজয় নিশ্চিত। ভারত সংস্কৃতিতে এই বিশ্বাস অচল ও অটল রাখিবার জন্যই গতাসুর শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধকারী ও পরিদর্শকমণ্ডলীর সকলের মনে ও কানে এই অমোঘ মন্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা। শোককাতর মনুষ্য, যখন জীবনের পরিণতি যে কত অনিত্য সেই চিন্তায় চিত্তকে বা মনকে সংযত ও শান্ত করিবার সুযোগ পায়, তখন এই মহান ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার স্থির মনের কোমল স্তরে গভীর রেখাপাত করিতে পারে ও দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে, তাহাই উদ্দেশ্য। অধমের ক্ষয়ের কথা আগে বুঝিতে দিয়া, পরের শ্লোকে ধর্মের জয় নিশ্চিত ইহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

দুর্য্যোধন মন, যুধিষ্ঠির প্রজ্ঞা বা ধর্ম্ম। যাহা বিবেক অনুমোদিত, যাহা স্থির, অচঞ্চল, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, নিঃস্বার্থ, আত্মসুখে উদাসীন, সর্বজীবে সমান, আত্মপর, নির্ব্বিশেষে উদার, সত্যপরায়ণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, ভগবৎ কৃপা প্রার্থী, তাহাই যুধিষ্ঠির বা ধর্ম মানবতার ধর্ম, সুখী, শান্ত অভ্রান্ত, অপ্রমাদী, ও হিতকারী, সকলের

প্রিয়। যুধিষ্ঠির ও তাহার ভ্রাতা ও অনুগামী সকল স্ত্রী পুরুষ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূজারী, রক্ষাকারী, তাহার শত্রুর ক্ষয়কারী। তিনি নিজে অপরাজেয়, নির্ভীক, মরণ, ক্ষয় ক্ষতির ধার ধারেন না। তাই তাঁর স্বশরীরে স্বর্গে বাস। নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জীবন যাহার উৎসর্গীকৃত, তার কাছে মৃত্যু পরাজিত, তিনি মৃত্যুঞ্জয়। অন্যায় কখনও স্বপ্নেও তার মনকে স্পর্শ করে না। এই অমূল্য শিক্ষা ও ভারতীয় স স্কৃতি জগতকে দান করিয়া মহাভারত-মহাভারতী, জ্ঞানের খনি, ভারতের সর্ব্বস্ব। পরজন্ম ভারত সংস্কৃতির আর একটী মূল্যবান দান। উচ্চস্তরের রত্ন। এই বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখিবার জন্য ঐ শ্লোকদ্বয়ের সঙ্গে জাতিস্মর অর্থাৎ পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত যাঁহারা ভোলেন নাই এইরূপ উপাখ্যান অংশের সংযোজনা অতীব মূল্যবান সন্দেহ নাই। মানবের দেহ মরে, আত্মা ও সূক্ষ্মাংশ নষ্ট হয় না। তাই মৃত্যুতে শোক পরিত্যজ্য ইহাই তাৎপর্য্য। শ্লোকটী যথা :—

"ওঁ সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসিদত।" গীতা পাঠ, ও গীতা পুস্তক দানে অপরের জ্ঞান লাভে সাহায্য, মহাভারত পাঠ বা মহাভারত পুস্তক দানে অপরকে মহাভারতের জ্ঞান লাভে সাহায্য অতীব মহান ও ভারত সংস্কৃতিকে রক্ষা করার সর্ব্বোত্তম পন্থা।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতি মতির্ম্ম।"

( গীতা )

কলিকাতা।
২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী।
পি, এচ্, ডি।

"জয় হিন্দ"

—o—